রূপক সাহা

সাদা পাতায় কালো দাগ

সাদা পাতায় কালো দাগ

রূপক সাহা

সকালবেলায় টুবলুর ডাকে ঘুমটা চটকে গেল। খুব সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখছিলাম। গ্র্যান্ড হোটেলে ব্যাঙ্কোয়েট রুমে, একটা মঞ্চে আমি বসে আছি। 'দ্য টাইমস' কাগজের তরফে আমাকে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। গ্রামীণ সংবাদ করার জন্য। কিছুদিন আগে পুরুলিয়ার নাচনি সম্প্রদায়কে নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম আমাদের কাগজে। সেই লেখাটাই বছরের সেরা নির্বাচিত হয়েছে। দশ হাজার টাকার একটা চেক রাজ্যপাল যখন আমার হাতে তুলে দিচ্ছেন, ঠিক সেই সময় টুবলুর গলা শুনতে পেলাম, "ছোটকা, তোমার ফোন।"

চোখ মেলে দেখি, হাতে কর্ডলেস, টুবলু বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে। স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। চান করে স্কুলের ড্রেস পরে নিয়েছে। তার মানে, ন'টা এখনও বাজেনি। ঠিক সোয়া ন'টার সময় ওর স্কুলের বাস বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াবে। গাঁক গাঁক করে হর্ন দেবে। ওই বিচ্ছিরি শব্দে মাঝেমধ্যেই আমার ঘুম ভেঙে যায়।

এত সকালে ফোন ধরার ইচ্ছে নেই আমার। একবার চোখ খুলেই টুবলুকে বুড়ো আঙুল দেখালাম। বাড়ি ফিরতে রোজ রাত হয়ে যায়। শুতে শুতে একটা-দেড়টা বাজে। ঘুম থেকে উঠিও একটু দেরিতে। বাড়ির সবাইকে বলা আছে, কেউ যেন ন'টা সাড়ে ন'টার আগে আমাকে না জাগায়। টুবলুকেও শিখিয়ে দেওয়া আছে। ওই সময় ফোন এলে কী কী করতে হবে। যদি বুড়ো আঙুল দেখাই, তা হলে ফোনটা কার জেনে নিয়ে, নম্বরটা লিখে রাখতে হবে। তর্জনী দেখালে, কার ফোন আগে তা জানতে চাইছি। দু'টো আঙুল, তার মানে লোকটাকে ঘণ্টাখানেক পর ফোন করতে বল। আর তিনটে আঙুল, মানে আমি এখন বাড়ি নেই।

বুড়ো আঙুল দেখানো সত্ত্বেও, ফোনে হাত চেপে টুবলু ফিসফিস করে বলল, "ছোটকা, জ্যোতিকাকার ফোন। এ বার নিয়ে, বারতিনেক করেছে। বলছে, জরুরি। ছোটকাকে ঘুম থেকে তুলে দে।"

জ্যোতির ফোন! শুনেই বিছানায় উঠে বসলাম। দৈনিক প্রভাত কাগজে জ্যোতি আর আমি— দু'জনেই রিপোর্টারের চাকরি করি। কাগজে ও আমার থেকে এক বছরের সিনিয়র। দু'জনে এক সময় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়তাম। দশ-বারো বছরের বন্ধুত্ব। সাংবাদিক হিসাবে জ্যোতির খুব নাম আছে। ও রাইটার্স বিল্ডিংস দাপিয়ে বেড়ায়। আমলা থেকে মন্ত্রী— সবাই ওকে চেনেন। জ্যোতির ফোন, মানে, অফিস নিয়ে কোনও কথা। টুবলুর হাত থেকে তাড়াতাড়ি ফোনটা নিয়ে বললাম, "হ্যাঁ, বল।"

ও প্রান্তে জ্যোতির গলায় উদ্বেগ, "অয়ন, কাল লালবাজার বিট কার ছিল রে, তোর

না দীপেনের ?"

বললাম, "আমার। কেন রে ?"

—সর্বনাশ, কাল কতক্ষণ ছিলি, লালবাজারে ?

বলার ভঙ্গিতেই বুকটা গুড়গুড় করে উঠল। আসলে গতকাল লালবাজারে আমার ডিউটি ছিল। কিন্তু গেটের সামনে গিয়েও আমি ভেতরে ঢুকিনি। গেটের সামনেই দেখা হয়েছিল 'আজকের কাগজ'-এর সুমন্তর সঙ্গে। ও বলল, "আজ কিচ্ছু নেই। ঘণ্টা তিনেক দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে যাচ্ছি। তুই যাবি তো, চল, হাঁটতে হাঁটতে একসঙ্গে অফিসে যাই।" ওর কথা বিশ্বাস করে, আমিও আর লালবাজারে না ঢুকে, বেরিয়ে আসি। জ্যোতিকে তো আর এ সব কথা বলা যায় না। তাই বললাম, "কতক্ষণ ছিলাম, ঠিক মনে নেই।"

—অফিসে ফিরে ও সি কন্ট্রোলকে আর ফোন করিসনি ?

—না। লালবাজারে কোনও খবর ছিল না। আমার হাতে ছোট একটা অন্য রিপোর্ট ছিল। সেটা লিখে, রাত প্রায় ন'টার সময় অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছি।

—অয়ন, আজ অফিসে তোর কপালে দুঃখ আছে।

—কেন, কোনও খবর মিস করেছি নাকি ?

—মিস মানে ? কাগজগুলো এখনও তুই দেখিসনি ?

—না। এই তো ঘুম থেকে উঠলাম।

—তুই ঘুমিয়েই থাক। ক্যালাস কোথাকার।

বলেই ফোনটা ছেড়ে দিল জ্যোতি। ওর গলায় প্রচণ্ড রাগ আর বিরক্তি। সকালবেলাতেই মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কী এমন খবর বেরোল অন্য কাগজে যে ও হঠাৎ এত উতলা হয়ে উঠল ?

বাড়ির সবাই এখন ব্যস্ত। বড়বৌদি নিশ্চয়ই এখন টুবলুর পিছনে সময় দিচ্ছে। মেজবৌদি ইউনিভার্সিটি যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। বুবুন, আমার ছোটবোন, একটু পরেই কলেজে যাবে। বিছানায় বসেই আমি আন্দাজ করতে পারছি, ও এখন মেকাপ নিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে। বড়দা অফিস চলে যায় সকাল আটটায়। মেজদার বেরোতে বেরোতে ন'টা। বাপী রিটায়ার্ড মানুষ। এই সময়টায় খুঁটিয়ে খবরের কাগজ পড়েন। দিন তিনেক হল বাপী অবশ্য বাড়িতে নেই। বড়দির শ্বশুরবাড়ি বর্ধমানে। সেখানে গেছেন।

বাড়িতে আর লোক বলতে শোভামাসি এবং চাঁদু। শোভামাসি প্রায় কুড়ি বছর আমাদের রান্নাঘরের দায়িত্বে। আমরা ঠাট্টা করে বলি, কিচেন মিনিস্টার। খুব সুন্দর রান্না করে। আমার মায়ের আমলের লোক। ঘাটালের বি ডি ও ছিলেন মা এক সময়। তখন কী এক কারণে শোভামাসি শরণাপন্ন হয় মায়ের। তারপর থেকেই, আমাদের বাড়িতে। বাকি রইল চাঁদু। বছর পনেরো-ষোলো বয়েসের। বাড়ির সবার ফাইফরমাশ খাটে। ছেলেটাকে নিয়ে এসেছে শোভামাসি। এই সময়টায় ও বাজারে যায়।

খবরের কাগজগুলো এখন নিশ্চয়ই পড়ে আছে ডাইনিং টেবলে। ব্রেকফাস্ট করার সময়ই তাতে চোখ বুলিয়ে নেয় বড়দা। মেজদা কাগজ-ফাগজ উল্টেও দেখে না। সকাল-সন্ধে খবর শোনে টিভি-তে। মেজদা প্রোমোটার। শিবালিক বাড়িটা ভেঙে

BOIRBOI.NET

পড়ার পর, খবরের কাগজে নাকি অনেক উল্টোপাল্টা কথা লেখা হয়েছিল প্রোমোটারদের সম্পর্কে। সে সব পড়ার পর থেকেই কাগজওয়ালাদের উপর ভীষণ রাগ মেজদার। প্রায়ই বলে, প্রিন্ট মিডিয়ার কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। ইদানীং কসবা অঞ্চলে খুব বড় একটা প্রোজেক্ট নিয়েছে মেজদা। সারা দিন সেই কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

খবরের কাগজগুলোতে একবার চোখ বোলানো দরকার। নীচে একতলায় নেমে, নিজেকেই তা নিয়ে আসতে হবে। ইচ্ছে করছে না। এই কারণেই, দোতলার ঘরে আমি থাকতে চাইনি। কিন্তু বড়বৌদির হুকুম। অমান্য করার সাহস, এ বাড়িতে কারও নেই। দোতলার এই ঘরটাই, বাড়ির সেরা। দক্ষিণ দিকে পুকুর। পুবে ঝুল বারান্দা। পশ্চিমে বড় রাস্তা। ঘরে সারা দিন হাওয়া-বাতাস আর রোদ্দুর। আমি একতলায় ড্রয়িংরুমের পাশের ঘরটায় থাকতে চেয়েছিলাম। বৌদি রাজি হয়নি।

আমার উপর আজ খুব চটেছে জ্যোতি। ওকে যতদূর জানি, আর একবার ও ফোন করবেই। ও হার্ডকোর রিপোর্টার। ঘুম থেকে উঠেই ও কাগজ আর খবরের কথা ভাবে। ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত, অন্য কোনও চিন্তাও করে না। আমি একদম উল্টো। অফিস থেকে বেরিয়ে আসার পর, পরদিন ফের অফিস যাওয়া পর্যন্ত— খবর নিয়ে মাথাই ঘামাই না। এই জন্যই জ্যোতি সাংবাদিকতার পেশায় এত সফল। আর আমি ? তেমন দাঁড়াতেই পারলাম না।

জ্যোতির কথা মনে হতেই বিছানা ছেড়ে নেমে পড়লাম। ঘরের লাগোয়া বাথরুম। মা খুব শখ করে এই বাথরুমটা তৈরি করিয়েছিল। বেসিনের উপর বড় আয়না। পুরনো আমলের, বেলজিয়াম কাচের। বাবা এই আয়নাটা কিনে এনেছিল পার্ক স্ট্রিট থেকে। আয়নার দিকে চোখ যেতেই মনটা খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল। বছর দু'য়েক আগেও, আমার চোখ-মুখে একটা ঝকঝকে ভাব ছিল। এখন আর সেটা নেই। রিপোর্টারের চাকরি করে, আমার অনেক কিছুই নষ্ট হয়ে গেছে। এক-আধ দিন খবর মিস করলেই ... গালাগালি। ভাল খবর করলে কিন্তু ছিটেফোটা প্রশংসাও আমাদের ভাগ্যে বরাদ্দ নেই। আমাদের পেশায় সব সময় টেনশন। মুখ হল মনের আয়না। মুখে চাকচিক্য থাকবে কী করে ? ইদানীং এমন হয়ে গেছে ; কাউকেই আমি সহজভাবে নিতে পারি না। বলতে গেলে, সবাইকেই সন্দেহ করি। আগে এমন ছিলাম না।

BOIRBOI.NET

তাড়াতাড়ি ব্রাশ করে, মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এলাম বাথরুম থেকে। ঘরে ঢুকে দেখি, বুবুন। তুঁতে রঙের একটা সালোয়ার-কামিজ পরেছে। ওকে খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। আমাকে দেখে বলল, "আজ অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি বেরোতে পারবি, ছোড়দা ?"

—কেন রে ?

—একটু দরকার ছিল। রীতুর আজ জন্মদিন। যেতেই হবে। তুই ফেরার সময় নিয়ে আসবি আমাকে ?

বুবুনের খুব বন্ধু এই রীতা। থাকে বর্ধমান রোডে পোর্ট অফিসারদের কোয়ার্টারে। অফিস থেকে ফেরার পথে ওকে স্বচ্ছন্দে তুলে আনা যায়। একটাই অসুবিধে। অফিস থেকে কখন ছাড়া পাব, তা আমি নিজেও জানি না। কাগজের লোকদের

দশটা-পাঁচটা বলে কিছু নেই। এমনও হয়, কাজ শেষ করে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় ফোন। হয়তো মেটিয়াবুরুজ বা বেহালায় কোনও ঘটনা ঘটেছে। সেখানে ছুটে যেতে হবে। চাকরিটাই খুব খারাপ। এই চাকরিটার জন্যই, একজনের সঙ্গে আমার বহুদিনের সম্পর্ক চুকে-বুকে গেছে। নাহ, তার জন্য আমার কোনও আপসোস নেই।

আমার থেকেও বছর পাঁচেকের ছোট এই বুবুন। বাড়ির সবারই খুব আদরের। ও কোনও কিছু চাইলে বা আবদার করলে, আমরা কেউ না করতে পারি না। অফিসে যা-হয় হোক, বলে ফেললাম, "ঠিক আছে, যাব। ক'টায় গেলে তোর সুবিধে হবে?"

—সাড়ে ন'টা, দশটায়। ঠিক যাবি তো?

—যাব। কিন্তু ভেতরে ঢুকব না। তখন যেন আবার বলিস না, অভদ্রতা করা হল। বন্ধুদের সামনে তোর প্রেস্টিজ নষ্ট করে এলাম।

কথাটা শুনে বুবুন হাসল। তারপর বলল, "ঠিক আছে বাবা, তোকে বাড়ির ভেতর ঢুকতেই হবে না। ও কে।"

আহ্লাদে এক পাক ঘুরে বুবুন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অদ্ভুত একটা হাসি লক্ষ করলাম ওর মুখে। বর্ধমান রোড থেকে আমাদের নিউ আলিপুর এমন কিছু দূরে নয়। বুবুন একটা ট্যাক্সি করেও চলে আসতে পারে। কাউকে যদি লিফট দিতে বলে, না করবে না। রীতার বাবা পোর্ট ট্রাস্টের খুব বড় অফিসার। ওদের নিজেদেরই দু'টো গাড়ি। তা সত্ত্বেও, বুবুন কেন আমাকে যেতে বলল, মাথায় ঢুকল না। হয়তো বন্ধুদের মধ্যে কেউ আমাকে দেখতে চেয়েছে। আমাকে নিয়ে ওর খুব গর্ব। ও তো আর জানে না, খবরের কাগজে ওর দাদাটা আসলে কিছুই না।

কাগজগুলোতে চোখ বোলানোর জন্যই, দোতলা থেকে নেমে এলাম। টুবলু এখনও স্কুলে যায়নি। ওর বাস এখনও আসেনি। একেক দিন লেট করে। তখন ও ড্রয়িংরুমে বসে অপেক্ষা করে। আমাকে নামতে দেখেই বলে উঠল, "ছোটকা, কুইজ খেলবে?"

কুইজ নিয়ে টুবলুর প্রচণ্ড উৎসাহ। কোত্থেকে সব উৎকট কুইজ জেনে আসে। জিজ্ঞেস করে বাড়ির লোকদের অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। টুবলুকে দেখলে, জ্যোতি আজকাল বাড়িতে বেশিক্ষণ বসতে চায় না। বলে, "ওরে বাবা, তোর ভাইপোটা ডেঞ্জারাস।" এক ঘর লোকের সামনে একদিন টুবলু ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "জ্যোতিকা, বলো তো চিংড়ির রক্তের রঙ কী?" জ্যোতি তখন পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচে। তখন আমিই ওকে উদ্ধার করি। ইঙ্গিতে ওর জামার রঙটা দেখিয়ে দিই—নীল।

ক্লাস ফোর-এ পড়ে টুবলু। সাউথ পয়েন্ট স্কুলে। পড়াশুনার বাইরেও অনেক কিছুর খবর রাখে। টিভি-তে যে ক'টা কুইজ প্রোগ্রাম হয়, সব দেখে। সোফায় বসে ও আমার দিকে তাকিয়ে। আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে তবেই প্রশ্নটা করবে। এ সব বড়বৌদির শিক্ষা। বয়স মাত্র ন'বছর। কিন্তু টুবলুটা এত ভদ্র, ভাবা যায় না। ওর নিষ্পাপ মুখটার দিকে তাকিয়ে আমার খুব মায়া হল। বাড়িতে ওর সমবয়সী কেউ নেই। কথা বলার লোক পায় না। এই সকালে কুইজ নিয়ে মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করছে না। তবু বললাম, "জিজ্ঞেস কর, তবে যেন কঠিন না হয়।"

টুবলু বলল, "না না ছোটকা। খুব সোজা। পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে পনেরোটা

বলতে পারো, যার মধ্যে এ ভাওয়েলটা নেই ?"

শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। উত্তরটা জানা। এই প্রশ্নটা দিন কয়েক আগে টিভি-তে অনুপম খের জিজ্ঞাসা করেছিল একজনকে। সেই সময় আমি লেক ক্লাবে টিভি-র সামনে বসে। ভাগ্যিস শুনেছিলাম! স্মার্টলি বললাম, "তুই ঘড়ির দিকে তাকা। বলে যাচ্ছি। ওয়ান, টু, থ্রি ...।"

ফর্টিন পর্যন্ত বলে গেলাম। টুবলুর চোখে বিস্ময়। বলেই ফেলল, "ছোটকা, তুমি এত সব জানো কী করে গো ?"

ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগলাম। ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকে বড়বৌদি বলল, "অয়ন, তোমার ফোন। জ্যোতির।"

এই রে, কাগজে এখনও চোখ বোলানো হয়নি। এর মধ্যেই ফের জ্যোতির ফোন ? কর্ডলেসটা কানের সামনে ধরতেই জ্যোতি বলল, 'এত বড় একটা খবর, তুই কী করে মিস করলি অয়ন ?

—কোন খবরটা রে ?

—কেন, কাগজ দেখিসনি আজকের ?

—না। টুবলুর সঙ্গে কুইজ খেলছিলাম। এ বার দেখব।

কয়েক সেকেন্ড কোনও শব্দ নেই ফোনে। জ্যোতি বোধহয় রাগ সামলাচ্ছে। রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক। আধ ঘণ্টা আগে ফোন করে ও কাগজগুলো দেখতে বলেছিল। আমি সময় পেলাম না দেখার। সাংবাদিকতার পেশায় এটা একটা অপরাধ। সকালে চোখ খুলেই কাগজ দেখার অভ্যাস সাংবাদিকদের। অবশ্য, দক্ষ সাংবাদিকদের। প্রথম প্রথম আমিও দেখতাম। এখন আর তাগিদ বোধ করি না।

ও প্রান্ত থেকে জ্যোতির গলা শুনতে পাচ্ছি, "দ্যাখ অয়ন, তোকে আমরা কেউ কেউ খুব পছন্দ করি। তার মানে এই নয় যে, তোর ক্যালাসনেস প্রশ্রয় দেব। অন্য কাগজে কোনও এক্সক্লুসিভ খবর বেরোলে, আমার শরীর জ্বলতে থাকে। দিনের পর দিন তোর জন্য চিফ রিপোর্টারের কাছে আমাকে কথা শুনতে হচ্ছে। আর শুনতে চাই না।"

জ্যোতি যা বলছে, সবই ঠিক। বোকার মতো বলে ফেললাম, "তুই খুব চটে গেছিস, না ?"

জ্যোতি বিদ্রুপের সুরে বলল, "না, চটব কেন ? আমার খুব গর্ব হচ্ছে তোর জন্য। পাঁচ-ছ বছর হল কাগজে ঢুকেছিস, এমন ক্যালাস তুই, এখনও একটা প্রোমোশন আদায় করতে পারলি না। তোর পরের ব্যাচের ছেলেরা, অনেকেই প্রিন্সিপাল করেসপন্ডেন্ট হয়ে গেল। পরমা ঠিক ডিসিশন নিয়েছে। তোর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না রেখে।"

রাগ দেখিয়ে জ্যোতি ফোনটা রেখে দিল। ওর শেষ কথাটা শেল হয়ে বিঁধল আমার বুকে। পরমার কথা কেউ আমার সামনে তুলুক, চাই না। ওটা একটা পুরনো ক্ষত। অনেক স্মৃতি এসে ভিড় করে চোখের সামনে। তখনই সেই ক্ষত থেকে রক্ত ঝরা শুরু হয়।

ফোনটা সোফায় রেখে, আমি চুপ করে বসে রইলাম। টুবলু স্কুল চলে গেছে। বাড়ির ভেতরে এখন কোনও সাড়াশব্দ নেই। রাস্তার উল্টোদিকে, বাড়িটা

BOIRBOI.NET

কৌশিকদের। বোধহয় কেউ এফ এম চ্যানেল চালিয়েছে। মান্না দে-র গান শুনতে পাচ্ছি। আমার খুব প্রিয় গান, 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই।' বহুদিন আগে, এই গানটা যখন প্রথম শুনি, তখন আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছিল। মান্না দে নিজে কখনও কি কফি হাউসে আড্ডা মেরেছেন ? নিশ্চয়ই যেতেন। না হলে এমন দরদ গানের মাধ্যমে ফোটাতে পারতেন না। তখন আমার সঙ্গে মান্না দে-র আলাপ ছিল না। পরে ঘটনাচক্রে খুবই হৃদ্যতা হয়ে যায়। এখন বোম্বে থেকে কলকাতায় এলেই, মান্নাদা মাঝে মধ্যে যোগাযোগ রাখেন।

গানের কলিগুলো মারাত্মক। "কাকে যেন ভালবেসে, আঘাত পেয়ে যে শেষে, পাগলা গারদে আছে রমা রায় ...।" চোখ বুজে শুনছি। আর অদ্ভুত এক সমবেদনায় ভরে উঠছে মন, ওই রমা রায়ের জন্য। কাউকে ভালবেসে, আঘাত পেয়ে, এখনকার যুগে, কেউ কি পাগল হয়ে যায় ? আমি তো হইনি। দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার বয়সী আর পাঁচ জন যুবক যেমনভাবে দিন কাটায়, কাটাচ্ছি। এখনকার যুগে কেউ কাউকে ভালবাসে বলে আমার মনেই হয় না। তাই আঘাত পাওয়ার প্রশ্নও ওঠে না। মান্না দে-র আমলে ওই রমা রায় নামের লোকগুলো আসলে খুব বোকা ছিল। তাই কষ্ট পেত। গান শুনতে শুনতে ওদের জন্য, হঠাৎ বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

ডাইনিং টেবল থেকে খবরের কাগজগুলো তুলে আনলাম। বাপী চারটে কাগজ রাখেন। তিনটে বাংলা, একটা ইংরেজি। আলসে হাতে প্রথমেই মেলে ধরলাম 'ভোর' কাগজ। প্রথম পাতায় ছয় কলাম জুড়ে ব্যানার হেডিং, "বাবা-মাকে হত্যা করে কিশোর উধাও।" সঙ্গে সঙ্গে অন্য কাগজগুলো টেনে নিলাম। প্রতিটা কাগজেই বড় বড় করে এই খবরটা ছাপা হয়েছে। শুধু আমাদের কাগজে নেই। দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

এমন একটা খবর মিস করা, সত্যিই অমার্জনীয় অপরাধ। সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের চাকরি চলে যাওয়া উচিত। কথা ভাবতেই বুকটা শিরশির করে উঠল। জ্যোতি অকারণে উদ্বিগ্ন হয়নি। বেলা বারোটায় রোজ এডিটোরিয়াল মিটিং হয়। সেখানে এই কথাটা উঠবেই। আমি লালবাজার বিটে ছিলাম। দোষটা আমার ঘাড়ে চাপানো হবে। এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম, আজ অফিসে আমার কপালে দুঃখ আছে। চিফ রিপোর্টার কুণালদা ঝাল ঝেড়ে নেবে আমার উপর। তিনটে কাগজ ঘুরে, এর মধ্যে দু'টো কাগজ তুলে দিয়ে, দৈনিক প্রভাতে এসেছে। একেবারে ঝানু লোক। আমি পলিটিক্যাল সায়েন্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট শুনে, কুণালদা প্রথম দিনই মুখটা ব্যাজার করেছিল। ওর ধারণা, স্কলার ছেলেদের জন্য এই প্রফেশন, নয়। লেখাপড়ায় ভাল ছেলেরা কখনও বড় রিপোর্টার হতে পারে না।

খুঁটিয়ে পড়তে লাগলাম খবরটা। নিহত ব্রজরঞ্জন দেবনাথ নাগেরবাজারে মৃণালিনী সিনেমার কাছে একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকতেন, তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মণিকা ও প্রথম পক্ষের ছেলে সজলকে নিয়ে। সজলের বয়স পনেরো-ষোলো বছর। সৎমায়ের সঙ্গে তার মোটেই ভাল সম্পর্ক ছিল না। প্রায়ই ঝগড়াঝাটি হত। ফ্ল্যাট বাড়ির অন্যরা সবাই জানত। চিড়িয়া মোড়ে রোল্ড গোল্ডের গয়নার দোকান চালাতেন ব্রজরঞ্জন। রোজ দুপুরের দিকে দোকান বন্ধ করে ঘণ্টা তিনেকের জন্য তিনি বাড়ি ফিরতেন।

খাওয়া-দাওয়া এবং বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। গতকাল বিকেলের দিকে সজল স্কুল থেকে ফিরে আসে। সন্ধেবেলায় একজনের সঙ্গে তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা যায়। তার কিছুক্ষণ পরই উল্টোদিকের ফ্ল্যাটের লোকেরা আবিষ্কার করেন, ব্রজরঞ্জন ও তাঁর স্ত্রী খুন হয়েছেন। দু'জনকেই আঘাত করা হয় হাতুড়ি জাতীয় কোনও জিনিস দিয়ে। পুলিশের সন্দেহ, সজলই অন্য এক বা দু'জনের সাহায্য নিয়ে খুন করে পালিয়েছে। ইদানীং সে পাইকপাড়ার কিছু বাজে ছেলের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেছিল।

পুরো খবরটা কাগজে পড়ে ভীষণ আপসোস হল। খুন যদি বিকেলে হয়ে থাকে, তা হলে লোকাল থানা হয়ে সেই খবর লালবাজার পৌঁছতে পৌঁছতে নিশ্চয়ই সন্ধে সাড়ে ছ'টা-সাতটা হয়েছে। তখন আমি লালবাজারের গেটের সামনে। ভেতরে ঢুকে ডি ডি-তে একবার মুখ দেখালেই খবরটা পেয়ে যেতাম। সুমন্তর কথা শুনে গতকাল আমি আর কিছু চেকই করলাম না। হঠাৎই মনে হল, সুমন্ত আমাকে ইচ্ছে করেই হয়তো গেট থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। যাতে আমি খবরটা না পাই। আমি একটা অপদার্থ, গাধা। সুমন্তকে বিশ্বাস করলাম! খবরটা ও নিশ্চয়ই জানত। ডালহৌসি স্কোয়ারে পৌঁছে হঠাৎ ও এয়ারপোর্টের মিনিবাসে উঠে পড়েছিল। তখন একটু অবাকই হয়েছিলাম। ওর অফিস শোভাবাজারে। কেন এয়ারপোর্টের বাসে উঠল? তার মানে, ও তখন নাগেরবাজারে যাচ্ছিল।

শুধু সুমন্তর ঘাড়ে দোষই বা চাপাব কেন? রাতে আমারও তো উচিত ছিল, ও সি কন্ট্রোলে একবার ফোন করা। খুনের খবরটা তা হলে পেয়ে যেতাম। তা না করে আমি কাল অফিস থেকে বেরিয়ে গেলাম, সোজা ট্রাঙ্গুলার পার্কে। অরূপ ব্যানার্জিদের বাড়ি। ফালতু আড্ডা মারার জন্য। সামান্য একটু গাফিলতির কুফল। খুবই খারাপ লাগছে। আমার ব্যর্থতায় বদনাম হয়ে গেল আজ কাগজের। অনেক পাঠক পেলই না খবরটা।

চাকরিতে যেদিন প্রথম ঢুকি, সেদিন একটা পরামর্শ দিয়েছিলেন তাপসদা। সেই সময় তিনি সিনিয়র রিপোর্টার। "ব্রাদার, রাস্তা-ঘাটে, ট্রামে-বাসে যেখানেই থাকো না কেন, চোখ-কান একটু খোলা রেখো। সামান্য একটা কথা, একটা ঘটনা থেকে তুমি বিরাট খবর পেতে পারো। সেই যে বলে না, যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই, কথাটা মিথ্যে না।"

একটা সময় তাপসদার কথা খুব মানতাম। এখন আর ইচ্ছে করে না। ঘা খেতে খেতে আমি এখন ভোঁতা হয়ে গেছি। এখন আর সেই মনের জোর নেই।

চোখের সামনে ভোর কাগজের প্রথম পাতাটা। বিরাট ছবি পুলিশি তদন্তের। ইনসেটে ছোট করে আরেকটা ছবি— সজলের। লিড স্টোরিটা দেবাংশুর। প্রথমে খুনের খবর। প্রতিবেশীদের রি-অ্যাকশন স্টোরি। তৃতীয় খবরটা সজলকে নিয়ে। সব মিলিয়ে খুব ভাল কভারেজ হয়েছে। দেবাংশু আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। ক্রাইম রিপোর্টিংয়ে ইদানীং ও যথেষ্ট নাম করেছে। লালবাজারের পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে ওর খুব দোস্তি। লালবাজারের খবরগুলি দেবাংশুই কন্ট্রোল করে। অন্য কাগজের রিপোর্টাররা খবরের জন্য ওর মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকে। ও যেমনভাবে খবর দেয়, অনেকেই তেমনভাবে ছাপায়। একটা সিন্ডিকেট করে ফেলেছে দেবাংশু।

BOIRBOI.NET

বাইরের লোক শুনলে হয়তো অবাক হবে। তবুও এটাই সত্যি। লালবাজারের খবর, ইচ্ছে করলে দেবাংশু— যে কোনও অফিসারের পক্ষে অথবা বিপক্ষে, অন্তত পাঁচ-ছ'টা কাগজে ছাপিয়ে দিতে পারে। সে জন্য অনেক অফিসার ওকে চটায় না।

ব্যতিক্রম শুধু দৈনিক প্রভাতের আমি আর আনন্দবাজারের প্রসূন। আমরা দু'জন ওর এই নোংরামির মধ্যে নেই। আমাদের কাগজের দীপেনকেও ওর সিন্ডিকেটে ঢুকিয়েছে দেবাংশু। দীপেনকে ও মাঝেমধ্যে খবর দেয়। আমি কী করছি, সে সব খবর রোজই দীপেনের মাধ্যমে ও পেয়ে যায়। আমি সব বুঝি। কিন্তু দীপেনকে শায়েস্তা করার কোনও উপায় নেই। ও চিফ রিপোর্টারের খুব স্নেহধন্য।

কাগজে ছাপার অক্ষরগুলো ঝাপসা হয়ে আসছে। দেবাংশু খুনের স্পটে গিয়েছিল। পুলিশি তদন্তের যে ছবিটা ছাপা হয়েছে, তাতে জয়ন্ত ভৌমিকের ছবি দেখতে পাচ্ছি। ভৌমিকের সঙ্গে পুলিশ ক্লাবে বসে রোজই মাল খায় দেবাংশু। তাই নাগেরবাজারের খুনের খবরটা পেতে অসুবিধা হয়নি ওর। আমি জানি, আজ থেকে যত ফলো আপ স্টোরি হবে, ভৌমিক গোপনে সব ওকেই প্রথমে জানাবে। ছবি বের করার পুরস্কার দেবাংশুকেই দেবে ভৌমিক। আগে এই সব খেলা বুঝতাম না। ওদের সিন্ডিকেটের রিপোর্টাররা এখন অনেক কথা বলে ফেলে।

দেবাংশুদের কাগজে টিম ওয়ার্ক অনেক বেশি। ভৌমিকের ছবিটা ছাপানোর জন্য দেবাংশুই হয়তো ওদের নিউজ এডিটরকে বলেছিল। আমাদের কাগজে নিউজ এডিটরকে যদি এই ছবি ছাপানোর কথা বলতাম, তা হলে শুনতে হত, "মাথা খারাপ, পুলিশের ছবি ছাপব ?" আমি জানি, সজল বলে ছেলেটাকে পুলিশ যে দিন ধরবে, সেদিনও সেই ছবিটা প্রথম দেবাংশুর কাগজই পাবে।

—অয়ন, কী হয়েছে, জ্যোতি তোমাকে বকাবকি করল কেন ?

প্রশ্নটা শুনে তাকিয়ে দেখি, বড়বৌদি। হাতে খাবারের প্লেট। আমার জন্য। টেবলের ওপর প্লেটটা রেখে বড়বৌদি ফ্রিজ থেকে জলের বোতল বের করে আনল। তারপর এসে বসল আমার পাশে। যতক্ষণ না আমার খাওয়া শেষ হবে, বসে থাকবে। খুব সকালেই বড়বৌদির স্নান ও পুজো সারা হয়ে যায়। আজ পরনে টিয়া রঙের তাঁতের শাড়ি। খোলা চুল, কপালে বড় একটা সিঁদুর-টিপ। বড়বৌদিকে মায়ের মতো দেখাচ্ছে। সকালে এই সময়টাতেই যা টুকটাক কথা হয় বড়বৌদির সঙ্গে। খবরের কাগজের জগৎ সম্পর্কে খুব কৌতূহল বড়বৌদির। অনেক কিছু জানতে চায়। কোনও খবর আমি করলে, কীভাবে সেই খবরটা পেলাম, জিজ্ঞেস করে। বড়বৌদির কাছে আমি কোনও কিছু লুকোই না। তাই জ্যোতির কথা তোলায় বললাম, "কাল একটা খবর মিস হয়ে গেছে। জ্যোতি তাই খুব রেগে গেছে আমার উপর।"

—খুনের খবরটা ?

—হ্যাঁ।

—তোমাদের কাগজেও তো খবরটা আছে। তবে মাত্র চার-পাঁচ লাইন।

—কী বলছ তুমি ?

—দেখো, পাঁচের পাতায়।

—দেখি। বলেই দৈনিক প্রভাত কাগজটা টেনে নিলাম। সত্যিই, পাঁচের পাতায়

বেরিয়েছে খবরটা। 'নাগেরবাজারে দম্পতি খুন' এই হেডিংয়ে। চট করে পড়ে ফেললাম। পড়েই মনে হল, নাইট ডিউটিতে যে রিপোর্টার ছিল, খবরটা তার করা। পুরোটা বেরোয়নি। খবরটা হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। জ্যোতি কি পাঁচের পাতা লক্ষ করেনি ? তা হলে সাত-সকালে ফোন করল কেন ?

রাতের দিকে বড় কোনও খবর হলে, তা ছাপা হবে কি না, অথবা কতটা ছাপা হবে— সেই সিদ্ধান্তটা নেয় নাইট শিফটের চিফ সাব এডিটর। খবর লিখে রিপোর্টার তার হাতেই দেয়। খবরটা যদি খুব চাঞ্চল্যকর কিছু হয়, তা হলে চিফ সাব অনেক সময় নিউজ এডিটরকে ফোন করে জানিয়ে রাখে। এটাই নিয়ম। আমাদের কাগজের চিফ সাব-রা সবাই খুব অভিজ্ঞ। এই খবর এত ছোট করে ছাপবে না। রাতের ডিউটিতে হয়তো কোনও জুনিয়র রিপোর্টার ছিল। খুনের গুরুত্ব তেমন করে বোঝাতে পারেনি চিফ সাব-কে। অথবা, হয়তো অন্য কোনও বড় খবর নিয়ে সে ব্যস্ত ছিল। আমাদের কাগজে প্রথম পাতায় দেখলাম, অন্য একটা খবর বেশ বড় করে বেরিয়েছে। তারাতলায় একটা পেট্রোল ট্যাঙ্কার উল্টে রাস্তায় আগুন ছড়িয়ে যায়। দু'জন পথচারী জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে। খবরটার সঙ্গে একটা ছবিও আছে।

অফিসে না গেলে ঠিক বোঝা যাবে না, কেন নাগেরবাজারের খবরটা বড় করে ছাপানো হল না। তবে একটা জিনিস বুঝতে পারলাম, দিনটা আজ ভাল যাবে না। কাম হোয়াট মে। মন দিয়ে ব্রেকফাস্ট শুরু করলাম। রোজ রোজ টেনশন। আর ভাল লাগছে না। আমার কলেজ ইউনিভার্সিটির বন্ধুরা অনেকেই ভাল চাকরি করে। মাঝেমধ্যে দেখা হলে, টের পাই কী সুন্দর জীবন ওদের। মা-বাবা, বউ-বাচ্চা, নতুন ফ্ল্যাট, মারুতি, থিয়েটার, সিনেমা, অফিসে উন্নতি, ক্লাবে পার্টি— সব কিছুর মধ্যেই ওরা খুব সুখে আছে। এই সব সুখ আমার কপালে লেখা নেই। দৈনিক প্রভাত আর লালবাজার, এ নিয়েই আমার জগৎ। আমি খুব অসুখী।

এসব ভাবার মাঝেই হঠাৎ ফোন। কর্ডলেসটা কানে লাগাতেই শুনলাম ডি ডি-র সুনীল পুরকায়স্থর গলা, "অয়ন ব্যানার্জি আছেন ?"

বললাম, "গুড মর্নিং মিঃ পুরকায়স্থ, বলুন।"

—রাতের দিকে কোথায় থাকেন মশাই ? আপিসে পাওয়া যায় না।

—কেন, যোগাযোগ করেছিলেন নাকি ?

—বার পাঁচেক। দু'তিনবার ফোনটা ধরলেন আপনাদের সুধীনবাবু। কেন, আপনাকে মেসেজ দেয়নি ?

—না তো।

—ভেরি ব্যাড। দেবাংশু তো আজ আপনাকে শুইয়ে দিয়েছে অয়নবাবু। আচ্ছা, কলিগদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি খুব খারাপ ?

কথাটা শুনে খুব খারাপ লাগল। তবুও বললাম, "না, না। তা হবে কেন ? সুধীন হয়তো অন্য কোনও কাজে ব্যস্ত ছিল ভুলে গেছে।"

—না মশাই, শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করবেন না। আমরা লোক চরিয়ে খাই। সুধীনবাবু খুব জেলাস আপনার সম্পর্কে।

প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়ার জন্য বললাম, "খবর-টবর দিন। এই সজল ছেলেটার কোনও ট্রেস পেলেন ?"

—সেই খবরটাই তো দেওয়ার জন্য কাল রাতে অতবার ফোন করলাম আপনাকে। এক্সক্লুসিভ হয়ে যেত আপনার।

—খবরটা কী মিঃ পুরকায়স্থ ?

—ছেলেটা আজকের মধ্যেই ধরা পড়বে। একটু যোগাযোগ রাখবেন আজ। শালা, ভৌমিকের ছবিটা দেখেছেন আজ কাগজে ? ইনভেস্টিগেশন করলাম আমি, আর ছবি বেরল ওর ! দেবাংশুটা একটা আস্ত হারামি।

—আর কোনও ডেভেলপমেন্ট আছে খবরটার ?

—দেখুন অয়নবাবু ছেলেটা নির্দোষ। খুন ও করেনি। ভিকটিম অব সারকমস্টান্সেস। আমার মনে হয়, ছেলেটা কিডন্যাপড হয়েছে।

—কী বলছেন আপনি ? দেবাংশু তো ওকে কালপ্রিট বানিয়ে দিয়েছে।

—দিক। দেবাংশু শালা, ভৌমিক যা বলেছে, লিখেছে। আপনি আপনার মতো করে আজ লিখুন। সব মেটেরিয়াল আমি দেব। আমার সোর্স বলছে, এই খুনের পিছনে গোল্ড স্মাগলারদের একটা র‍্যাকেট আছে। ছেলেটা বোধহয় কিছু জেনে ফেলেছিল। যাক যে, বিকেলের দিকে, পাঁচটা-সোয়া পাঁচটায় আপনি আসতে পারবেন পাশপোর্ট অফিসের সামনে ? লালবাজারে বসে বলা যাবে না। এক্সক্লুসিভ খবর আছে। তবে মশাই, আমার ছবিও কিন্তু আপনার কাগজে ছাপতে হবে।

ছবি ছাপা আমার সাধ্যের বাইরে। তবুও বললাম, "ঠিক আছে।"

লাইনটা ছেড়ে দেওয়ার পর খুব রাগ হল সুধীনের উপর। পুরকায়স্থ নিজে খবরটা দিতে চেয়েছিল। তবুও মেসেজটা সুধীন আমাকে দেয়নি। সত্যিই খুব বাজে ছেলেটা। আমি জানি, কেন ও জেলাস ? দৈনিক প্রভাতের পুজো সংখ্যায় প্রতি বছর ওর গল্প ছাপা হত এতদিন। এ বার ওর বদলে আমাকে লিখতে বলা হয়েছে। খবরটা জানার পর থেকে সুধীনের মুখ গম্ভীর।

ধীরে সুস্থে ব্রেকফাস্ট শেষ করে ফেললাম। বড়বৌদি মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। এমন সময় ফের ফোন : পাশ থেকে কর্ডলেসটা তুলে বললাম, "হ্যালো। অয়ন বলছি।"

ও প্রান্ত থেকে, বহুবার শোনা সেই মিষ্টি গলা, "সুপ্রিয়াদি আছে ?"

শোনা মাত্রই বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। সুপ্রিয়া আমার বড়বৌদির নাম। আমার জানাশোনা লোকেদের মধ্যে একজনই বড়বৌদিকে সুপ্রিয়াদি বলে ডাকে। আমার মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বেরোল না।

—কার ফোন অয়ন ? জিজ্ঞাসা করল বড়বৌদি।

হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিলাম কর্ডলেসটা। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, "ঠিক বুঝতে পারলাম না। তোমাকে চাইছে।"

ডাইনিং টেবল ছেড়ে উঠে পড়লাম। টের পেলাম, আমার বুকের ভেতরে সেই পুরনো ক্ষত থেকে ফের রক্ত ঝরা শুরু হয়েছে।

BOIRBOI.NET

॥ দুই ॥

পাতাল রেল হয়ে খুব সুবিধা হয়েছে আমাদের। বাড়ি আর অফিস— দুইই পাতাল রেলের কাছে। রবীন্দ্র সরোবর স্টেশন থেকে উঠি। আর নামি এসপ্লানেডে। মেজবৌদি মাস আটেক আগে আমাকে একটা বাইক উপহার দিয়েছে। কিন্তু বড়বৌদির আদেশ, সেই বাইকে অফিসে যাওয়া চলবে না। সাংবাদিকরা সব সময় টেনশনে থাকে। অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। তাই বুধবার ছাড়া সপ্তাহের বাকি দিনে আমার বাইকে চড়া হয় না। বুধবার আমার অফ ডে।

মেট্রো রেলে বসার জায়গা পাইনি। তাই হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে আছি। ট্রেন যতীন দাস পার্ক ছেড়ে যাওয়ার পরই পিছন থেকে ডাক পেলাম, "অয়নদা, এদিকে আসুন। সিট খালি আছে।"

তাকিয়ে দেখি, শর্মিলা। আনন্দবাজার পত্রিকার রিপোর্টার। ও ওঠে কালীঘাট স্টেশন থেকে। প্রায়ই দেখা হয়। আমরা, কাগজের লোকেরা, যখন অফিস যাই, তখন ট্রেনের কামরায় ভিড় থাকে না। বেলা বারোটা-সোয়া বারোটা। তখন বসার জায়গা পাওয়া যায়। আজ অবশ্য কামরায় দু'-চারজন দাঁড়িয়ে। শর্মিলার দিকে পা বাড়াবার পরই, একজন ওর পাশের ফাঁকা সিটটায় বসে পড়ল। মনে মনে হাসলাম। আমার ক্ষেত্রেই এটা হয়। পিছন থেকে এসে অনেকেই আমাকে মেরে বেরিয়ে যায়। ভদ্রতার খাতিরে শর্মিলার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

শর্মিলাকে দেখলেই বোঝা যায়, ধনী পরিবারের মেয়ে। ওর পরনে জিনসের হলুদ শার্ট, আকাশ-নীল প্যান্ট। ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে শ্যাম্পু করা চুল। এক ঝলকে মনে হবে, বিজ্ঞাপনের মডেল। ফর্সা, ভরাট মুখটার সঙ্গে সরু সোনালি ফ্রেমের গোল চশমা চমৎকার মানিয়েছে। শর্মিলার চেহারার মধ্যে একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে।

দু'-চার দিন আগে, আমাদের অফিসেই কে যেন বলেছিল, মুখ্যমন্ত্রী জার্মানি যাচ্ছেন। অনাবাসী বাঙালিদের আমন্ত্রণে। পশ্চিমবাংলায় শিল্প স্থাপনের জন্য অনাবাসীরা আগ্রহী। মুখ্যমন্ত্রীর ওই সফর কভার করতে আনন্দবাজার শর্মিলাকে পাঠাচ্ছে। একটু অবাকই হয়েছিলাম। অত বড় একটা কাগজ থেকে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সী একটা মেয়েকে পাঠানো হচ্ছে শুনে। হঠাৎ কথাটা মনে পড়ল। আনন্দবাজারে অবশ্য এখন কমবয়সীদেরই ভিড়। ওদের চিফ রিপোর্টার সঞ্জয় সিকদার তো আমার থেকে মাত্র সাত-আট বছরের বড়।

BOIPOI.NET

শর্মিলাকে বললাম, "আরে, তোমাকে কনগ্রাচুলেশন জানানো হয়নি। তুমি নাকি জার্মানি যাচ্ছ?"

শর্মিলা হেসে বলল, "বাব্বাঃ, খবরটা আপনাদের কানেও গেছে?

বললাম, "আজকাল উল্টো হাওয়া। ভাল খবর সবার আগে ছোটে।"

—ভুল বললেন অয়নদা। খবরটা সবার কাছে ভাল নয়। অনেকের মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে। আরে, আমার মামা থাকেন স্টুটগার্টে। অনেকদিন ধরেই যাওয়ার কথা বলছেন। ভাবলাম, এই সুযোগ। অফিসকে বলতেই রাজি হয়ে গেল। নিজের খরচে যাচ্ছি।"

—ভাল। তবু বড় ব্রেক। ভাল এক্সপোজার পাবে।

—দেখি। আমার তো একটু ভয় ভয়ও করছে।

—ভয়ের কী আছে। তুমি তো রাইটার্স বিটও করো। চিফ মিনিস্টার তোমায় চেনেন। দেখবে, ঠিক পারবে।

—একটা কথা বলব অয়নদা ? আপনার মতো একটা রিপোর্টার, দৈনিক প্রভাতে কেন পড়ে আছে ? আমাদের কাগজে আসবেন ?

—ওরে বাবা। তোমাদের বিরাট কাগজ। আমাকে কেন নেবে ?

—প্রসূনদা কিন্তু আপনার খুব প্রশংসা করে। সুধাংশুদাও। আমাদের নিউজ এডিটর। আপনি চেনেন ?

—চিনি। আমার বড়দার ক্লাসমেট। আগে আসতেন খুব আমাদের বাড়িতে। আমাকে ছোটবেলা থেকে দেখছেন।

—তাহলে সুধাংশুদাকেই অ্যাপ্রোচ করুন না।

কথাটা শুনে হাসলাম।

আমাকে হাসতে দেখে একটু বিব্রত মুখে শর্মিলা বলল, "সরি অয়নদা। কথাটা এভাবে বলা আমার ঠিক হল না। আপনার সম্পর্কে যা শুনেছি, কোনওদিনই আপনি মুখ ফুটে বলবেন না।

—ছাড়ো ও কথা। সুধাংশুদা কী বলছিলেন আমার সম্পর্কে ?

—দিন কয়েক আগে পুরুলিয়ার সেই আর্মস মিসট্রি নিয়ে বোধহয় আপনি একটা খবর করেছিলেন। সেদিনই সুধাংশুদা এডিটোরিয়াল মিটিংয়ে আপনার সম্পর্কে প্রশংসা করেছিল।

—উনি জানলেন কী করে খবরটা আমার ?

—বোধহয় প্রসূনদার মুখে শুনে থাকবে। সঞ্জয়দা তো প্রায়ই বলে, অয়নদাকে দৈনিক প্রভাত কাজে লাগাতে পারছে না। নষ্ট করে দিচ্ছে। ওই রকম একটা স্কলার ছেলে, হয়তো একদিন ফ্রাসট্রেটেড হয়ে প্রফেশনই ছেড়ে দেবে।

কথাটা শুনে ফের মনে মনে হাসলাম। শর্মিলা জানে না, সেই দিনটা প্রায় এসে গেছে। প্রসঙ্গটা ঘোরাবার জন্যই বললাম, "তোমার একটা খবর পড়লাম দু'দিন আগে। সরকারি হাসপাতালে রোগীদের আর সরকারি খরচে খাবার দেওয়া হবে না। খবরটা দারুণ। অন্য কোনও কাগজ পায়নি। এক্সক্লুসিভ, তাই না ?"

—হ্যাঁ। লাকিলি সেদিন পেয়ে গেলাম।

—রাইটার্সে প্রচুর খবর। খাটলে পাওয়া যায়। আগে আমি নিজেও প্রচুর করেছি। এখন আমার এমন একটা বিট, খুব কঠিন হয়ে গেছে খবর পাওয়া।

—অয়নদা, আমার জ্যাঠামণি এখন ডি আই জি প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ। আমার সঙ্গে গেলে ভাল করে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি।

দরকার নেই। তবু ও যাতে কিছু মনে না করে তার জন্য বললাম, "তা হলে তো খুবই ভাল হয়।"

—সব থেকে ভাল হয়, যদি একদিন আমাদের বাড়ি আসেন। জ্যাঠামণিকেও সেদিন তাহলে আসতে বলব।

—বাব্বা, তুমি আমার জন্য এত করবে কেন ?

—অয়নদা, যেদিন প্রথম রিপোর্টিং করতে বেরোই, মনে আছে, সেদিন আপনি

আমাকে কতটা সাহায্য করেছিলেন ? সেই উপকার আমি জীবনেও ভুলব না। আপনার কথা আমি বাড়িতে খুব বলি।

শুনে চুপ করে রইলাম। ট্রেন থামল ময়দান স্টেশনে। কামরা আরও ফাঁকা হয়ে গেল। উল্টোদিকে একটা সিট খালি। গিয়ে বসলাম। উল্টোদিক থেকে শর্মিলাকে খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। কামরার অনেকেই ওর দিকে তাকাচ্ছে। একেক জন এ রকম কপাল নিয়ে জন্মায়। স্কুল-কলেজ, অফিস-কাছারি সর্বত্র তারা এক্সক্লেটরে করে উপরে ওঠে। কোনও জায়গায় হোঁচট খায় না। তাদের জীবনটা একেবারে স্বপ্নের মতো।

এই শর্মিলা মেয়েটাকে প্রথম দেখি প্রেস ক্লাবে। বছর তিনেক আগে। সেদিন প্রেস কনফারেন্স ছিল সীমা আর্ট গ্যালারির। রদ্যাঁর ভাস্কর্য নিয়ে ওরা একটা প্রদর্শনী করেছিল সেই সময় কলকাতায়। আর্ট আমার সাবজেক্ট না। তবু সেদিন আমাকে পাঠানো হয়েছিল, আর কেউ না থাকায়। কলেজ লাইফে আমি প্রফেসর বাগচির কাছে পড়তাম। তিনি আর্ট নিয়ে বিস্তর পড়াশুনা করতেন। বাড়িতেও প্রচুর বই। মাঝেমধ্যে আমাকে পড়তে দিতেন। প্রফেসর বাগচির জন্যই রদ্যাঁ সম্পর্কে আমার সামান্য আইডিয়া ছিল।

প্রেস কনফারেন্স শুরু হওয়ার পর শর্মিলা আমার পাশের চেয়ারে এসে বসে। আগে কখনও ওকে দেখিনি। মুখ-চোখ দেখে মনে হয়েছিল, প্রফেশনে নতুন। ও চুপচাপ বসে ছিল। সেদিন আর্ট গ্যালারির কর্তাদের পাঁচ সাতটা প্রশ্ন করি রদ্যাঁ সম্পর্কে। সে সব শুনে শর্মিলার বোধহয় ধারণা হয়েছিল, আর্ট নিয়ে আমি অনেক কিছু জানি। প্রেস কনফারেন্স শেষ হতেই ও নিজের পরিচয় দিয়ে, তারপর বলেছিল, "অয়নবাবু, আমাকে একটু সাহায্য করবেন ? আমি কিছুই বুঝতে পারিনি।"

অন্য কেউ হলে ঠাট্টা-মস্করা করত। আমি সেদিন খুব ভাল ব্যবহার করেছিলাম। জলের মতো স্বচ্ছ করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, কীভাবে লিখতে হবে। এমন সৌজন্যবোধ মেয়েটার, পরদিন দুপুরে ফোন করে ধন্যবাদ জানিয়েছিল। তারপর থেকে, মাঝেমধ্যেই আমাদের দেখা হয় পাতাল রেলের কামরায়। শর্মিলা নিজেই এগিয়ে এসে কথা বলে। বছর তিনেকের মধ্যে মেয়েটা দ্রুত উন্নতি করেছে। তবে অনেক সময় আমার সন্দেহ হয়, প্রফেশনে কতদিন টিকে থাকবে।

ভাবতে ভাবতেই এসপ্লানেড এসে গেল। শর্মিলার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই উঠে দাঁড়ালাম। আমার অফিস মেট্রো গলির কাছে। অফিসের কথা মনে হতেই, খারাপ লাগল। জানি না, কপালে কী লেখা আছে।

—অয়নদা, কবে আমাদের বাড়ি আসবেন, তা হলে জানিয়ে দেবেন।

কথাটা শুনে পাশ ফিরে দেখি, শর্মিলা। উঠে এসে গেটের সামনে দাঁড়িয়েছে। ওর নামার কথা চাঁদনি চকে। এক স্টেশন আগেই উঠে পড়েছে। লম্বা বলে আমার সামান্য গর্ব আছে। আমার হাইট ছয় ফুট দু'ইঞ্চি। শর্মিলা প্রায় আমার কাঁধের কাছে। উত্তর শোনার অপেক্ষায়, মুখটা সামান্য তুলে রয়েছে ও। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে, মুক্তোর মতো ওর দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে। ওর আগ্রহ ভরা মুখটা দেখতে দেখতে বুকটা শিরশির করে উঠল। চোখের সামনে দিয়ে যেন এক ঝাঁক রঙিন প্রজাপতি হঠাৎই উড়ে গেল।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, "শর্মিলা, তুমি ভালয় ভালয় আগে ঘুরে এসো

জার্মানি থেকে। তারপর না হয় যাওয়া যাবে।

—ঠিক আছে।

—তুমি উঠে পড়লে যে ?

—পি আই বি-তে যাব। একটা কাজ আছে।

—ওহ্।

পাতাল রেলের প্ল্যাটফর্ম দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে উপরে উঠে এলাম। অনেকে আমাদের দেখছে। কী ভাবছে, কে জানে ? আমি রাস্তা পেরোবার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম, "চলি শর্মিলা।"

ও হাসল। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। কেন জানি না, মনে হল, শর্মিলা আরও কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে থাকতে চাইছিল। কিছু বলতে চাইছিল। না, হয়তো আমার ভুলও হতে পারে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে মেট্রোর ফুটপাতে উঠে পড়লাম।

অফিসে আজকাল কড়াকড়ি খুব। কার্ড দেখিয়ে ঢুকতে হয়। আমাদের অফিসটা নতুন। কিছুদিন আগে উঠে এসেছে বউবাজার থেকে। ইন্টেরিয়র ডেকোরেশনের জন্য প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে। হপ্তা ছয়েক আগে, কী একটা খবরের জন্য, প্রতিবাদ জানাতে এসে অফিসের রিশেপসন ভাঙচুর করে গিয়েছে একটা রাজনৈতিক দলের কিছু লোক। তারপর থেকে প্রচণ্ড সিকিউরিটি। হুটহাট কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।

রিশেপসনে ইদানীং একটা মেয়েকে বসানো হয়েছে— অঞ্জলি। ভিজিটর সামলাবার জন্য। কাচের দরজা ঠেলে আমি ভেতরে ঢুকতেই সে বলল, "অয়নদা, আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে। এখানে কথা বলবেন। না রিপোর্টিংয়ে পাঠিয়ে দেব ?"

রিশেপসনে সোফায় অনেকেই বসে। পাশে ক্যাজুয়াল বিজ্ঞাপন নেওয়ার দফতর। বিকেল তিনটে পর্যন্ত সেখানে ভিড় লেগে থাকে। সেদিকে একবার চোখ বোলালাম। কোনও চোনা মুখ চোখে পড়ল না। সত্যি বলতে কী, ভিজিটরের সঙ্গে কথা বলার কোনও ইচ্ছে এখন নেই আমার। এডিটোরিয়াল মিটিংয়ে কী হবে, সেই ভাবনা সারা মন জুড়ে রয়েছে। অঞ্জলিকে তাই বললাম, "এখানেই কথা বলে যাই।"

অঞ্জলি পাশ ফিরে বলল, "অয়ন ব্যানার্জির সঙ্গে কে দেখা করতে এসেছেন ? উঠে আসুন।"

BOIRBOI.NET

সোফা ছেড়ে উঠে এল বছর কুড়ি-বাইশের একটা মেয়ে। কাঁধে চামড়ার সাইড ব্যাগ। সালোয়ার-কামিজ। দেখেই মনে হল, খেটে খাওয়া মেয়ে। হাত তুলে নমস্কার করে বলল, "আমি শ্রীময়ী মিত্র। একটা দরকারে আপনার কাছে এসেছি।"

মনে অশান্তি। তাই পাল্টা সৌজন্য দেখাতেও ভুলে গেলাম। শুকনো গলায় বললাম, "কী ব্যাপার বলুন।"

মেয়েটা বলল, "আমাকে আপনি বলার দরকার নেই। সবণীদি, মানে আপনার মেজবৌদি আমাকে চেনেন। আমরা একই পাড়ায় থাকতাম।"

এ বার একটু হেসে বললাম, "বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি।"

—অয়নবাবু, আমি কলকাতার প্রসটিটিউটদের নিয়ে রিসার্চ করছি। প্রফেসর সামন্তর কাছে। আপনার একটু সাহায্য চাই।

মুসকিল। অন্তত আধঘণ্টা সময় নষ্ট হবে। হাতের ঘড়িতে চট করে চোখ বুলিয়ে দেখলাম, পৌনে একটা বাজে। মিনিট পনেরোর মধ্যে আমাকে উপরে উঠে যেতে হবে। একটায় চিফ রিপোর্টার সবাইকে নিয়ে মিটিংয়ে বসে। ডিউটি ভাগ করে দেয়। তারপরই কেউ রাইটার্সে চলে যায়। কেউ কর্পোরেশন। কেউ লালবাজার অথবা কোনও প্রেস কনফারেন্স। চিফ রিপোর্টার কুণালদা আজ নিশ্চয়ই আমার উপর চটে আছে। মিটিংয়ে দেখলেই মুখটা তেতো করে তাকাবে।

শ্রীময়ী খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। আমি যে কোনও কারণে অধৈর্য হচ্ছি, বোধহয় বুঝতে পারল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "গত রবিবার কলকাতার প্রসটিটিউটদের নিয়ে আপনি একটা আর্টিকেল লিখেছেন। আমার রিসার্চে সেটা খুব কাজে লাগবে। সে ব্যাপারেই কিছু জানতে চাই।"

বললাম, "আমি খুব বেশি কিছু জানি না।"

—অয়নদা, আপনি কয়েকটা এন জি ও-র কথা লিখেছেন, যারা ওই সব অঞ্চলে খুব কাজ করছে। তাদের সঙ্গে কি যোগাযোগ করা যেতে পারে? আমার খুব উপকারে লাগবে।

ওহ্, এই ব্যাপার। বললাম, "আপনাকে কয়েকটা ফোন নম্বর দিচ্ছি। আগে যোগাযোগ করে, তারপর যাবেন।"

পকেট থেকে টেলিফোন গাইড বের করে কয়েকটা নম্বর দিলাম শ্রীময়ীকে। তারপর বললাম, "কিছু মনে করবেন না। আজ একটু ব্যস্ত আছি। আর কিছু দরকার?

— না ... মানে, নর্থ ক্যালকাটার রেড লাইট এরিয়ায় কিছু কাজ করতে চাই। কোনও রেফারেন্স দিতে পারেন?

—আপনি হাটখোলার মেডিকেল ব্যাঙ্কে গিয়ে কথা বলুন। ওরা খুব হেল্প করবে।

—আরও কয়েকটা ইনফর্মেশন দরকার ছিল। আচ্ছা, সবাণীদির বাড়ি ... মানে আপনাদের বাড়িতে গেলে কি একটু বসে কথা বলা যাবে আপনার সঙ্গে?

—তা হলে একবার ফোন করে আসবেন।

শুনে মেয়েটার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর দেরি করা উচিত নয়। আমি লিফটের দিকে পা বাড়ালাম। যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়। দেখি, চিফ রিপোর্টার কুণালদা লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে। কুণালদা প্রচণ্ড রাগী টাইপের। কেউ খবর মিস করলে, মুখে যা আসে, বলে দেয়। কেউ কোনওদিন ভাল খবর করলে, সবার সামনে প্রশংসা করে না বটে, তবে নানাভাবে পুরস্কার দেয়। কুণালদার একটাই দোষ। খুব দলবাজি করে। রিপোর্টিংয়ে নিজের একটা গোষ্ঠী তৈরি করে রেখেছে। দীপেন-সুধীনরা ওর খুব কাছের লোক।

লিফটের সামনে আমাকে দেখে কুণালদা মুখ শক্ত করে বলল, "অবনীটা কী রকম হিডিয়ট দেখেছ অয়ন? নাগেরবাজারের খুনের আজ খবরটা কী রকম আন্ডারপ্লে করেছে?"

উফ্, বুকের ভেতর থেকে পাষাণটা নেমে গেল। যাক বাবা, দোষটা তা হলে আমার উপর পড়েনি। নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, "আপনাকে একবার ফোন করলেও তো পারত।"

লিফটের লাইনে সার্কুলেশন, অ্যাড আর ডেস্কের কয়েকজন দাঁড়িয়ে। সে সব

ভ্রূক্ষেপ না করেই কুণালদা বলল, "না, না, এ রকম চলতে পারে না। আমার রিপোর্টাররা রক্ত জল করে খবর আনবে। আর রাতের লোকগুলো ইমপরট্যান্স বুঝতে না পেরে, সেই খবর ভেতরের পাতায় ছাপবে, বেশিদিন এটা চলতে পারে না।"

উপর থেকে লিফট এসে থামল গ্রাউন্ড ফ্লোরে। আট জনের বেশি ওঠা যাবে না। কুণালদার গা ঘেঁষেই উঠে পড়লাম লিফটে। খবরের কাগজে রিপোর্টিং বিভাগের সঙ্গে নিউজ ডেস্কের খুব একটা সদ্‌ভাব থাকে না। প্রত্যেক রিপোর্টারই চায়, সে যে খবরটা এনেছে, সেটা খুব গুরুত্ব দিয়ে বেরোক এবং পুরোটাই বেরোক। অন্যথা হলে সে চটে যায়। খবরটা পুরো বেরোবে কি না, কোন পৃষ্ঠায় বেরোবে, তা কিন্তু নির্ভর করে, নিউজ ডেস্কে রাতের ডিউটিতে যে সব সাব এডিটর পাতা মেক-আপ করে, তাদের উপর। নিউজ এডিটরের নির্দেশে ওরাই এই সিদ্ধান্তগুলি নেয়। রিপোর্টারদের কপি কাটা গেলেই পরদিন অশান্তি। এটা প্রায় দিনই হয়। রিপোর্টারদের পক্ষ নিয়ে কুণালদা প্রায় দিনই অসন্তোষ জানিয়ে আসে নিউজ ডেস্কে। চিফ সাব এডিটর অবনীদার সঙ্গে ঠাণ্ডা লড়াই আছে কুণালদার। দু'জনেরই ধারণা, একে অন্য জনের তুলনায় খবরটা বেশি বোঝে।

লিফটে দাঁড়িয়েও গজগজ করছে কুণালদা, "ফালতু একটা লোককে চিফ সাব করলে যা হয়, তাই হচ্ছে। বিন্দুমাত্র নিউজ সেন্স নেই অবনীটার। সকালে কাগজগুলো দেখে প্রথমে তোমার উপর প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল, বুঝলে অয়ন। পরে জ্যোতি ফোন করে বলল, তোমার মায়ের নাকি হার্ট প্রবলেম হয়েছিল কাল সন্ধেবেলায়। তাই তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গেছিলে। আর আমিও কাল একটু আগে চলে গেলাম। গোয়েঙ্কাদের বাড়িতে একটা পার্টি ছিল। না হলে খবরটা ... এই ট্রিটমেন্ট করতে দিতাম না। আজ একটা হেস্তনেস্ত করবই। অবনী আসুক রাতে।"

আমার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোচ্ছে না। মায়ের হার্ট প্রবলেম? মা তো মারা গেছেন প্রায় বারো বছর আগে! আমাকে বাঁচানোর জন্য জ্যোতি শেষ পর্যন্ত এত বড় একটা মিথ্যে কথা বলল! লিফটের দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়ালাম। মায়ের মুখটা মনে পড়তেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওই সময় কুণালদা জিজ্ঞাসা করল, "আরে হ্যাঁ, তোমার মা আছেন কেমন? প্রবলেমটা কী?"

কী উত্তর দেব বুঝতে পারলাম না। আমাকে বাঁচিয়ে দিল লিফট। আমি মুখ খোলার আগেই লিফটের দরজা খুলে গেল। তিন তলায় পা দেওয়ার সময় ব্যস্তভাবে কুণালদা একবার বলল, "ডাক্তারের দরকার হলে আমাকে বোলো। ডাঃ দীপক স্যান্নালকে বলে দেব। এখন এক নম্বর কার্ডিওলজিস্ট।"

মা বলত, "বুবলু, জীবনে কখনও মিথ্যে কথা বলবি না। যত বড় প্রবলেমেই পড়িস না কেন।" কথাটা মনে পড়তে, চোখ বুজে মনে মনে ক্ষমা চাইলাম। জ্যোতি কাজটা ভাল করেনি।

লিফট থেকে নেমে কয়েক পা এগোলেই বাঁ দিকে বার্তা বিভাগ। লম্বা হল ঘর। একদিকে রিপোর্টিংয়ের দফতর। অন্য দিকে সাব এডিটরদের বসার জায়গা। হলঘরে ঢুকতেই চোখে পড়ল, জ্যোতি টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। আমাকে দেখেও দেখল না। সকালে কাগজগুলো দেখার পর থেকে, একটা অপরাধবোধে ভুগছিলাম। কেন জানি না, জ্যোতিকে দেখে হঠাৎ কৃতজ্ঞতা জানাতে ইচ্ছে হল।

BOIRBOI.NET

দীপেন ওর চেয়ারে বসে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছে নিচু গলায়। ভদ্রলোক বোধহয় কোনও খবর দিতে এসেছেন। কিন্তু দীপেন মন দিয়ে শুনছে না। ওর চোখ-মুখ দেখে মনে হল, লোকটাকে ভাগিয়ে দিতে পারলে বাঁচে। দীপেন আর আমি একই বছরে পরীক্ষা দিয়ে চাকরিতে ঢুকেছি। সেই ব্যাচে আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম। এত বেশি নম্বর পেয়েছিলাম যে, এডিটর কুমারেশ মজুমদার ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করেছিলেন, "মিঃ ব্যানার্জি, আপনার এত ভাল অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার, অথচ আমাদের এই ছোট কাগজে চাকরি করতে আসছেন ? রিয়েলি সারপ্রাইজিং !"

ভ্যাকেন্সি ছিল মাত্র একটা। দীপেন চাকরি পাওয়ার জন্য কয়েকজনকে ধরেছিল। সেবার ওর ইন্টারভিউ নিয়ে এডিটর খুশি হননি। কিন্তু নিউজ এডিটর আর চিফ রিপোর্টার ওর হয়ে যুক্তি দেয়, দু'জনকেই অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে রাখুন। যে ভাল করবে, তাকে পাকাপাকিভাবে নেবেন। দীপেন করিতকর্মা ছেলে। ও আমার এক বছর আগেই কনফার্ম হয়ে গেছিল।

দীপেন আর আমি— দু'জনে ভাগাভাগি করে এখন লালবাজার বিট করি। ও নানাভাবে সমস্যায় ফেলে আমাকে। ধান্ধাবাজ ছেলে। গড়িয়াহাটের কাছে দীপেন একটা ফ্ল্যাট কিনে ফেলেছে। সাত-আট লাখ টাকা দিয়ে। রিপোর্টারের চাকরি করে ও এত টাকা পেল কোথায়, অনেকেই এ প্রশ্ন করে। শোনা যায়, আন্ডারওয়ার্ল্ডের লোকজনের সঙ্গেও দীপেনের খুব ভাব। পুলিশ আর আন্ডারওয়ার্ল্ডের লোকজনের মাঝে থেকে, ও নাকি ভাল কামায়। আমাকে দেখলেই ও একটু অস্বস্তিতে ভোগে। ওকে পছন্দ করে না, এমন পুলিশ অফিসাররা ওর সম্পর্কে অনেক খবরই দেয় আমাকে।

ভদ্রলোককে ভাগিয়ে দিয়ে দীপেন হঠাৎ আমাকে বলল, "খবরটা তুই কাল করতে পারলি না অয়ন। আমি বিটে থাকলে কিছুতেই মিস করতাম না।

দীপেনের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। বললাম, "তুই কোথায় ছিলি ?"

—তারাতলায়। পেট্রোল ট্যাঙ্কারের খবরটা তো আমারই। দেখিসনি ? অন্য কোনও কাগজ কিন্তু পায়নি।

—হ্যাঁ, খবরটা দেখলাম। ভাল করেছিস।

—অয়ন, শালা ডি ডি-র ভৌমিকটাকে একটু টাইট দিতে হবে। ও আজকাল একটু বেশিই পিরিত করছে দেবাংশুর সঙ্গে। ভোর কাগজটা দেখেছিস ?

—দেখেছি।

—এ বার নিয়ে কিন্তু ভৌমিক তিনবার ডিচ করল আমাদের। এর আগে, স্টোনম্যান নিয়ে, মনে আছে, দেবাংশুকে একবার খবর দিয়েছিল ? তারপরও, বাগবাজারে সেই খুনের খবরটা আমাদের দেয়নি।

আমি ঘাড় নাড়লাম। ভৌমিক সম্পর্কে দীপেনের সামনে কোনও মন্তব্য করা মানেই, নিজের সর্বনাশ। যদি বলি, ভৌমিক লোকটা খারাপ, তা হলে আজ বিকেলেই গিয়ে লালবাজারে, ভৌমিকের কাছে সব উগরে দেবে। হয়তো ওখানে দেবাংশুর সঙ্গেও ওর দেখা হবে। ওকেও বলবে, তোর নামে অয়ন বাজে বাজে কথা বলছিল। দীপেনকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। আগে, বেশ কয়েকবার বোকার মতো মন্তব্য করে,

আমি ফেঁসে গেছি।

কুণালদা আর আমি একই সঙ্গে হলঘরে ঢুকেছিলাম। দীপেন সেটা লক্ষ করেছে। জিজ্ঞাসা করল, "বস কিছু বলল না খবর মিস করা নিয়ে ?"

ওকে এড়াবার জন্যই বললাম, "আজ ভাল করে ফলো আপ করতে বলে দিল।"

—তুই লালবাজারে যাবি নাকি ?

—জানি না। যদি বলে, যাব।

—শোন, সকাল থেকে আমিও ফলো আপ করছি। কুণালদা মিটিংয়ে ডাকলে, তখন ব্রিফ করব। তুই কোনও খবর পেলি ?

—হ্যাঁ। দেবাংশু যে লাইনে খবরটা করেছে, ঠিক না। সজল ছেলেটা খুন করেনি। ওকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।

সকালে পুরকায়স্থ যা বলেছিলেন, সব বললাম। শুনে দীপেন বলল, "না রে, তুই যা শুনেছিস, ঠিক না। অন্য রহস্য আছে।"

বলেই দীপেন উঠে গেল। রিপোর্টারদের মিটিং শুরু হতে আর কয়েক মিনিট বাকি। আড় চোখে তাকিয়ে দেখলাম, জ্যোতি গম্ভীর মুখে বসে। যেচে একবার কথা বলতে ইচ্ছে করল। কিন্তু জানি, কথা বলতে গেলেই ও গাঁক গাঁক করে উঠবে। সাব এডিটরদের টেবলে পাঁচ-ছ জন মিলে আড্ডা মারছে। দুপুরের দিকে এই সময়টায় ওদের খুব চাপ থাকে না। ঈশিতা বলে একটা মেয়ে হাত নেড়ে ডাকল। আমাদের পরের ব্যাচে ঢুকেছে। আগে নবযুগ কাগজে চাকরি করত।

উঠে নিউজ ডেস্কের কাছে যেতেই ঈশিতা বলল, "অয়নদা, কোত্থেকে কিনেছেন সোয়েটারটা। দারুণ হ্যান্ডসাম লাগছে কিন্তু আপনাকে।"

বললাম, "থ্যাঙ্কস।"

—কে কিনে দিল বড়বৌদি, না অন্য কেউ ?

—তোমার কী মনে হয় ?

—আমার তো মনে হয় অন্য কেউ।

—এটা জিজ্ঞাসা করার জন্য ডেকেছ ? না অন্য কথা আছে।

ঈশিতার পাশেই বসে স্নিগ্ধা বলে একটা মেয়ে। সে নীচু গলায় কী যেন বলল। মাস তেরো হল, মেয়েটা চাকরিতে ঢুকেছে। থাকে আলিপুরের গোয়েঙ্কা টাওয়ার্সে। ওর বাবা নামকরা সিস্টেম অ্যানালিস্ট। এ সব কথা জানতাম না। একদিন রাতে অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় মোটর ভেহিকেলস ডিপার্টমেন্টের সুপারভাইজার আমাদের দু'জনকে একই গাড়িতে তুলে দিয়েছিল। মেয়েটাকে নামিয়ে, তারপর আমি নিউ আলিপুরে চলে যাই। গোয়েঙ্কা টাওয়ার্স বাড়িটা দেখে সেদিন মনে হয়েছিল, ওই সব বাড়িতে যারা থাকে, তাদের কোনও দরকারই নেই দৈনিক প্রভাত-এর মতো ছোট কাগজে চাকরি করার। যে টাকা স্নিগ্ধা পায়, তা মেক আপের সরঞ্জাম কিনতেই, ওর নিশ্চয়ই খরচ হয়ে যায়।

স্নিগ্ধার সঙ্গে আজ পর্যন্ত আমার বাক্যালাপ হয়নি। আমি ওর চার-পাঁচ বছরের সিনিয়র। সেই জন্যই হয়তো যেচে সরাসরি কথা বলার সাহস পায়নি। রিপোর্টিংয়ে কাজ করার সময় অথবা লিফটে উঠতে বা নামতে গিয়ে লক্ষ করেছি স্নিগ্ধা আমার সঙ্গে আলাপ করতে খুব ইচ্ছুক। কিন্তু আমি প্রশ্রয় দিইনি। মেয়েদের কাছ থেকে

জীবনে এমন একটা ঘা খেয়েছি, যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে।

ঈশিতাকে কী যেন বলল স্নিগ্ধা। দু'জনেই আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। ঈশিতা বলল, "ও কী বলল, জানেন ?"

—কী ?

—না থাক, শুনলে আপনি রেগে যাবেন।

শুনতে খুবই ইচ্ছে করছিল, এমন সময় সুধীন ডাকল, "এই অয়ন, মিটিং শুরু হবে। কুণালদার ঘরে আয়।"

ঈশিতাকে বললাম, "কথাটা পরে শুনব।" বলেই চিফ রিপোর্টারের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। দশ-বারো জন এদিক-ওদিক বসে। দীপেন একেবারে সামনের চেয়ারে। আমার দিকে একবার তাকিয়েই ও চোখটা সরিয়ে নিল। ওর চোখে ধূর্ততার ছাপ দেখে আমি একটু ভয়ই পেলাম। জ্যোতি আমার উল্টোদিকে বসে। ওর মুখটা ভাবলেশহীন। ও পলিটিক্যাল বিট করে। ওকে কিছু করতে বলা হয় না। ওর যা পজিশন, ওই কোন স্টোরি করবে, বলে দেয়। কুণালদা আমাদের ডিউটি দিয়ে দেওয়ার পর আলাদা করে ওর সঙ্গে বসে।

কুণালদার গলায় বেশ আলাদা এক ধরনের কর্তৃত্ব আছে। বলল, "নাগেরবাজারের খুনের খবর আন্ডারপ্লে করা নিয়ে আজ এডিটরের কাছে আমাকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। যে ভাবেই হোক, ফলো আপ স্টোরিতে আজ মারতেই হবে অন্যদের। খবরটা আজ লিড হবে, যদি দিল্লি পলিটিকসে বড় কিছু না থাকে। দীপেন একটু আগে বলল, সকাল থেকে ফলো আপ করছে। দেবাংশু নাকি রঙ লাইনে রিপোর্ট করেছে। সজল বলে ছেলেটা নাকি খুন করেনি। লালবাজার বিট-টা তা হলে দীপেনই করুক আজ।"

কুণালদার কথা শুনে, আমি চমকে দীপেনের দিকে তাকালাম। আমার কাছ থেকে পুরো খবরটা শুনে, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই, কুণালদার কাছে ও নিজের খবর বলে চালিয়ে দিয়েছে! নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হল। কেন ওকে আমি সব কথা উগরে দিতে গেলাম ? সকালে জ্যোতি আমাকে ঠিকই বলেছে। আমি একটা ক্যালাস। অপদার্থ। এই প্রফেশনে মিস ফিট। জ্যোতি সব শুনছিল। একবার কড়া চোখে আমার দিকে তাকিয়েই, ফের চোখ সরিয়ে নিল। নিশ্চয়ই মনে মনে আমাকে গালাগাল দিচ্ছে। আমি জানি, কাল সকালের জন্য ও আর অপেক্ষা করবে না। রাতে বাড়ি ফিরেই ফোনে আজ আমাকে আগা পাস্তালা ঝাড়বে।

BOIRBOI.NET

মাথা নিচু করে বসে রইলাম। কুণালদা মাঝেমধ্যেই রিপোর্টারদের বলে, ডান হাতে কী করছ, তা যেন বাঁ হাত না জানে। রিপোর্টারদের আসল গুণই হচ্ছে গোপনীয়তা রক্ষা। লালবাজার বিট-টা আজ আমি নিশ্চয় পেতাম, যদি লিফট থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে করিডোরে দাঁড়িয়ে কুণালদাকে আমি সব বলে দিতাম। লালবাজারে গেলে পুরস্কায়স্থকে ট্যাপ করলেই দীপেন সব খবর পেয়ে যাবে। কাগজে পুরকায়স্থের নাম বেরোবে। এই সুযোগে দীপেন ওর ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করবে। পুরকায়স্থের মতো পুলিশ অফিসারেরা কাগজে একটু-আধটু শুধু নাম চায়। যে দিতে পারবে, ভবিষ্যতে ওরা তাকেই খবর দেবে। একটা ভাল সোর্স, সামান্য নির্বুদ্ধিতার জন্য চলে যাবে দীপেনের কাছে। এটা ভেবেই চোখে জল এসে গেল।

কুণালদা সবাইকে ডিউটি ভাগ করে দিচ্ছে। আমার কানে কোনও কিছু ঢুকছে না। হঠাৎ নিজের নামটা শুনে কুণালদার দিকে তাকালাম। "অয়ন, ইস্টার্ন কমান্ডের একটা প্রেস কনফারেন্স আছে। বেলা তিনটেয়। ময়দান এরিয়া নিয়ে কিছু বলতে চান কর্নেল বি ডি ভার্গব। তুমি যাবে। সুধীন, তুই রাইটার্সে যাবি। চিফ মিনিস্টারের ব্রিফিং অ্যাটেন্ড করে চলে আসবি। বিমলেন্দু, তিলজলার দিকে একটা গণ্ডগোল হয়েছে ..."

কুণালদা আরও অনেক কিছু বলে যাচ্ছে। আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। হঠাৎই উঠে গিয়ে দীপেনের কলারটা চেপে ধরতে ইচ্ছে করল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ইচ্ছেটা দমিয়ে ফেললাম। জীবনে কখনও কাউকে একটা চড় পর্যন্ত মারিনি। নিজেই তাই অবাক হয়ে গেলাম, হঠাৎ কেন এত রাগ হয়ে গেল ? মাস খানেকের মধ্যে এই ধরনের রাগ এ নিয়ে বার তিনেক হল। টেনশন আর টেনশনে কি তা হলে আমার ব্লাড প্রেসার বেড়ে যাচ্ছে ? মিটিং শেষ করে ওই সময় কুণালদা আমার হাতে প্রেস কনফারেন্সের চিঠিটা ধরিয়ে দিলেন। চিঠিটা হাতে নিয়েই বুঝলাম, এ খবর ছাপা হবে না। হলেও, তিনের পাতায়। সাত-আট লাইনের বেশি যাবে না।

দীপেনকে গাড়ির স্লিপ লিখে দিলেন কুণালদা। চিফ রিপোর্টারের স্লিপ ছাড়া মোটর ভেহিকেলস বিভাগ কোনও রিপোর্টারকে গাড়ি দেয় না। ছোট কাগজ। গাড়িও কম। রিপোর্টারদের জন্য বরাদ্দ মাত্র তিনটে গাড়ি। দীপেন গাড়ি নিয়ে লালবাজার যাবে। লালবাজার এমন কিছু দূরে নয়। তবু যাবে। খবর তাড়া করার জন্য যদি ওকে আরও কোথাও যেতে হয়, এই কারণে। আর একটা গাড়ি নিয়ে বেরোবে জ্যোতি, ও প্রথমে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সি পি এমের অফিসে যাবে। তারপর বিভিন্ন পার্টি অফিস ঘুরে ফিরে আসবে সন্ধে সাতটা-সাড়ে সাতটা নাগাদ। আমাদের বাকি ক'জনকে হেঁটে যেতে হবে। ইস্টার্ন কমান্ডের প্রেস কনফারেন্স অবশ্য বেশি দূরে নয়। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের উল্টোদিকে কুক অ্যান্ড কেলভি বিল্ডিংসে। অফিস থেকে হেঁটে যেতে মিনিট সাত-আটেকের বেশি লাগবে না। হাতে ঘণ্টা দু'য়েক সময় আছে। তাই টেবলে বসে দিল্লির কাগজগুলো উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলাম।

প্রথম প্রথম অফিসে এসে সময় কাটাতে খুব ভাল লাগত। পরিবেশটাই ছিল এমন। আড্ডার মেজাজে কাজ হত। এখন ল্যাং মারামারি এমন বেড়ে গেছে, কারও সঙ্গে মন খুলে কথা বলতেও ইচ্ছে করে না। বছর দু'য়েক আগে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেছে। তারপর থেকে অফিসের পরিবেশটা খুব বিষাক্ত। দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার। দাবি, পাল্টা দাবি। রিপোর্টিংয়ের লোকেরা সাধারণত ইউনিয়নের কাজে খুব একটা নিজেদের জড়ায় না। তুব দেখছি, দীপেন-সুধীনরা আজকাল দু'নম্বর ইউনিয়নের পান্ডাদের সঙ্গে একটু মাখামাখি করছে। আমাকেও টানতে চেয়েছিল। যাইনি। দু'নম্বর ইউনিয়নের লোকেরা আমাকে তাই পছন্দ করে না। ওদের দু'-একজন একদিন কটাক্ষও করেছিল আমাকে দেখে। "গায়ে হাওড়া লাগিয়ে খুব বেশিদিন বেড়ানো যাবে না।" এই ছেলেগুলো কাজ করে ডি টি পি বিভাগে। নামটাই আছে ওই ডিপার্টমেন্টে। সারাদিনই ওদের দেখি, একতলা থেকে তিনতলা ঘুরে বেড়াতে। যারা ইউনিয়ন করে, তাদের নাকি কাজ টাজ করতে হয়

BOIRBOI.NET

না।

দিল্লির কাগজ উল্টে-পাল্টে দেখে, অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম, পৌনে তিনটে নাগাদ। গেট থেকে বেরোবার মুখে দেখা নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে। আমাকে বললেন, "অয়ন, তোমাকেই খুঁজছিলাম। খুব জরুরি দরকার। একবার আজ আসবে আমার ঘরে?"

নিরঞ্জনদা রবিবারের পাতা দেখেন। আগে আমাকে দিয়ে অনেক কিছু লিখিয়েছেন। বললাম, "প্রেস কনফারেন্সে যাচ্ছি। কিছু বলবেন?"

—হ্যাঁ। ফ্রেঞ্চ টিভি-র একটা দল কলকাতায় আসছে সুন্দরবনের জলদস্যুদের নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি করার জন্য। ওদের হেল্প করতে হবে তোমাকে।

—কী ধরনের হেল্প নিরঞ্জনদা?

—আমার পাতায় জলদস্যুদের নিয়ে তুমি যে লেখাটা লিখেছিলে, সেটা ওরা জেনেছে। দিল্লিতে ওদের একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে। সে-ই ট্রানস্লেট করে পাঠায়। ওরা প্যারিস থেকে এসে শুট করতে চায়। তোমাকে ফের ওদের নিয়ে ওই অঞ্চলে যেতে হবে। পার ডে ফাইভ হান্ড্রেড ডলার দেবে। সম্ভবত, দিন সাতেকের কাজ।

সঙ্গে সঙ্গে হিসাব করে নিলাম মনে মনে। নিরঞ্জনদার পাতায় ওই লেখাটা লেখার জন্য পেয়েছি মাত্র ছ'শো টাকা। ফ্রেঞ্চ টি ভি দেবে ... সাত দিনের জন্য সোয়া লাখ টাকা! ভাবা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে বললাম, "কবে যেতে হবে নিরঞ্জনদা?"

—সেটা কাল বলতে পারব। একবার আসবে কাল আমার ঘরে?

—নিশ্চয়ই।

নিরঞ্জনদার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। কুক অ্যান্ড কেলভি-তে পৌঁছলাম প্রায় সোয়া তিনটে নাগাদ। যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। এমন কিছু বড় খবর না। ময়দান এরিয়ার প্রশাসনিক অধিকার নিয়ে ইদানীং বিরোধ বাঁধছে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে আর্মির। ব্রিটিশ আমলে ময়দান অঞ্চলটা ছিল আর্মির হাতে। স্বাধীনতার পরও তারা কর্তৃত্ব ছাড়েনি। এ দিকে, কলকাতা পুলিশেরও একটা ময়দান ডিভিশন আছে। তারা যখন কিছু করতে যায়, তখন আর্মির লোক এসে বাধা দেয়। কর্নেল ভার্গব কাগজপত্তর দেখিয়ে, প্রেস কনফারেন্সে বলে দিলেন, ময়দানের প্রশাসনিক অধিকার, দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁরা কিছুতেই ছাড়বেন না। এটুকুই খবর। সামান্য এই খবরের জন্য কাউকে না পাঠালেও চলত। বেশির ভাগ কাগজই, জুনিয়র ছেলেদের পাঠিয়েছে। দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। একটা সময় আমি রাইটার্স বিট করতাম। আর এখন ... এই সব তুচ্ছ খবর করতে হচ্ছে। আমার ভাগ্যটাই খারাপ। প্রেস কনফারেন্স হয়ে যাওয়ার পর চা খেতে খেতে কর্নেল ভার্গবের সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। কথায় কথায় উনি বললেন, ময়দান এরিয়ায় নানা রকম অসামাজিক কাজ হচ্ছে। আর্মি উদ্বিগ্ন। রাজ্য সরকারের দখলদারি তারা সহ্য করবেন না।

কুক অ্যান্ড কেলভি থেকে বেরিয়ে এলাম পাঁচটা নাগাদ। হাতে অন্য কোনও কাজ নেই। প্রেস ক্লাবে আড্ডা মেরে অফিসে পৌঁছলাম সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ। দু'চার জন রিপোর্টার ফিরে এসেছে। লেখায় ব্যস্ত। এই সময়টা খবরের কাগজে পিক

BOIRBOI.NET

আওয়ার। ন'টা-সাড়ে ন'টা পর্যন্ত রিপোর্টিং বিভাগ গমগম করবে। প্রথম প্রথম এই কর্মব্যস্ততা আমার খুব ভাল লাগত। একেক দিন চার-পাঁচটা বড় বড় কপি লিখতাম। এখন ঠিক উৎসাহ পাই না। কপি দিলেও অনেক সময় তা বেরোয় না।

নিয়ম হচ্ছে, অফিসে ফিরে আগে চিফ রিপোর্টারকে খবরটা সম্পর্কে সব কিছু জানাতে হবে। উনি যতটা লিখতে বলবেন, ততটাই আমাদের লিখতে হবে। কুণালদার ঘরে তাই একবার উঁকি দিলাম। পেলাম না। অফিসেই আছেন। হয় অ্যাডভার্টাইজমেন্টের কোনও ম্যানেজারের ঘরে, নয় তো সার্কুলেশন বিভাগের কারও সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন। আজকাল কাগজের ব্যবসায় এই দুই বিভাগের খুব গুরুত্ব। একদল রেভেনিউ আনে। আরেক দল কাগজটা বেচে। ওদের সবাই হাতে রাখতে চায়।

খবরটা লিখে, সন্ধে সাড়ে সাতটার মধ্যেই ফাঁকা হয়ে গেলাম। আমার আর কোনও কাজ নেই। রীতাদের বাড়ি থেকে বুবুনকে আজ নিয়ে যেতে হবে। নানা কাজের মধ্যেও আজ তা ভুলিনি। মনে মনে ঠিক করে রাখলাম, যেভাবেই হোক, আটটার মধ্যে অফিস থেকে কেটে পড়তেই হবে। লালবাজার থেকে ফিরে এসে, লিখতে বসে গেছে দীপেন। ওকে দেখে চিনচিনে একটা রাগ হতে শুরু করল। মুখটা ঘুরিয়ে নিলাম। আমারও দিন আসবে। তখন দেখে নেব, দীপেন-সুধীনের মতো বদমাইশদের।

রাত ঠিক আটটায় উঠে পড়লাম। অফিস থেকে বেরোবার মুখে দেখি, জ্যোতি। ও জিজ্ঞাসা করল, "এই, তুই কোথায় যাচ্ছিস ? ইস্টার্ন কমান্ডের প্রেস কনফারেন্সে গেছিলি ?"

বললাম, "হ্যাঁ। ফালতু খবর। দশ-বারো লাইন লিখে দিয়েছি।"

উত্তরটা শুনেই জ্যোতির চোখ-মুখ শক্ত হয়ে গেল। ও খুব কড়া গলায় বলল, "অয়ন, তোর দ্বারা জার্নালিজম হবে না। আজকাল কোথায়ও গিয়ে, একটা খবর তুই বের করতে পারিস না। জানিস, কাল আনন্দবাজারে হয়তো এই স্টোরিটাই সুপার লিড হতে পারে ?"

আনন্দবাজারে সুপার লিড ! শুনে আমি হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। জ্যোতি বলছেটা কী ? প্রেস কনফারেন্সে আনন্দবাজার থেকে গেছিল সুদীপ বলে একটা জুনিয়র ছেলে। পরে চা খেতে খেতে অবশ্য ও অনেকক্ষণ কথা বলছিল কর্নেল ভার্গবের সঙ্গে। ও কী অ্যাঙ্গেলে খবর পেল যে, সুপার লিড হতে পারে ?

BOIRBOI.NET

প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছিল। জ্যোতি বেশ রেগেই বলল, "ময়দান এরিয়ার একটা অংশ রাজ্য সরকার গোপনে বিক্রি করে দিচ্ছে একটা কর্পোরেট বডি-র কাছে। সেই বডিটা হোটেল বানাবে। আর্মি তা জানতে পেরেছে। তাই আজ প্রেস কনফারেন্স করে জানিয়ে দিল, ময়দান এরিয়ার প্রশাসনিক অধিকার ওরা ছাড়বে না। মানে, জমি বিক্রি বা কোনও রকম কনস্ট্রাকশন করতে দেবে না। সরাসরি তো আর গভর্মেন্টের বিরুদ্ধে বলতে পারে না। যা করার করবে ডিফেন্স মিনিস্ট্রি দিয়ে। তাই আজ একটু ঘুরিয়ে প্রোটেস্ট করে রাখল। এটাই তো খবর।"

খবরের গুরুত্ব বুঝে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। ছিঃ ছিঃ, আজ আবার একটা বড় খবর মিস করতে যাচ্ছিলাম ? আজকাল আমার এমন অবস্থা হয়েছে,

একটা জুনিয়র ছেলের কাছে মার খেতে যাচ্ছিলাম। আমার অবস্থা দেখে জ্যোতি খিঁচিয়ে উঠল, "চল, ক্যালাসের মতো আর দাঁড়িয়ে থাকিস না। কর্নেল ভার্গবকে ফোনে ধর। নতুনভাবে খবরটা লেখ। তোর জন্য কাল সকালে আবার আমাকে একগাদা মিথ্যে কথা বলতে হত।"

জ্যোতির সঙ্গেই ফের তিন তলায় উঠে এলাম। নানা জায়গায় ফোন করে, খবরটা লিখে ফের যখন ফাঁকা হলাম, রাত তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা। ছয় বছর পর, আজ হঠাৎই মনে হল, জ্যোতি ঠিকই বলেছে। জার্নালিজম আমার দ্বারা হবে না। আমি ক্যালাস। সত্যিই ক্যালাস। অথচ এই বছর দেড়েক আগেও, আমি কিন্তু এমন ছিলাম না।

॥ তিন ॥

চোখটা কটকট করছে। কাল রাতে অনেক দেরিতে ঘুমিয়েছি। আজ ঘুম ভেঙে গেছে একটু সকাল সকাল। সারা দিন হাই উঠবে। ম্যাজম্যাজানি কমাতে বেশ বেলা পর্যন্ত লেপমুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম। কাল অনেক রাত পর্যন্ত ভেবেছি, জার্নালিজম পেশায় আমার আর থাকা উচিত হবে কি না। পাঁচ-ছ'টা বছর নষ্ট করে ফেললাম। কুণালদা ঠিকই বলেছিল, "সাংবাদিকরা জন্মায়, সাংবাদিক তৈরি করা যায় না।"

আমাদের পেশায় প্রচুর গ্ল্যামার। লোকে একটু আলাদা চোখে দেখে। লোকে ভাবে, সাংবাদিকদের অনেক ক্ষমতা। মন্ত্রী, সরকারি আমলা, শিল্পপতি, সমাজের সব নামী-দামি লোকেদের সঙ্গে কাগজের লোকেদের খুব দহরম-মহরম। খবরের কাগজে আমাদের অনেকের নাম প্রায়দিন বেরোয়। লোকে এক ডাকে চিনতে পারে। গ্ল্যামার অবশ্য সব সাংবাদিকের জন্য নয়, যারা সফল তাদের জন্য।

ইউনিভার্সিটি থেকে বেরোবার পর যখন আমি দৈনিক প্রভাত কাগজে চাকরি নিলাম, তখন বাড়ির সবাই আপত্তি করেছিল। বাবা আমাকে আমেরিকায় পাঠাতে চেয়েছিলেন। দাদারাও কেউ চায়নি, আমি অত কম টাকার মাইনের কোনও চাকরিতে ঢুকি। তখন বড়বৌদিই একমাত্র বলেছিল, "অয়নকে তোমরা কেউ কিছু বলবে না। ওর যা ভাল লাগে, তাই করুক।" সব থেকে বেশি আপত্তি ছিল পরমার। ও খুব রাগারাগি করেছিল। কিন্তু আমি কারও কথা শুনিনি। পরমাকে না জানিয়েই চাকরিটা নিয়েছিলাম। ওর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার এই একটাই কারণ। প্রথমে মন কষাকষি, তারপর মাঝেমধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। বছর দেড়েক আগে এমন একটা ঘটনা ঘটল যে, ও একেবারে দূরে সরে গেল আমার জীবন থেকে।

কাগজের অফিসে প্রথম প্রথম সত্যিই খুব ভাল লাগত। একেকটা দিন কেমন করে কেটে যেত, টেরই পেতাম না। ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারলাম, খবরের কাগজ স্বপ্নের জগৎ নয়। বাইরে থেকে যা মনে হয়, তা ঠিক না। রুক্ষ বাস্তবের জগৎ। এত চাপ, অন্য কোনও পেশায় সহ্য করতে হয় না। প্রতিদিনই পরীক্ষা। রোজ রোজ হার-জিতের খেলা। প্রতি মুহূর্তে কোথাও না কোথাও, কোনও না কোনও খবর হচ্ছে। যে দিন খবর পাওয়া যায়, সেদিন আমি রাজা। পরদিন কিছু না পেলে, সেই রাজাই আবার ফকির। একদিন হয়তো একটা এক্সক্লুসিভ খবর করলাম। সকালে

উঠে, কাগজে দেখে, ওই দু'তিন ঘণ্টাতেই যা আনন্দ। বেলা দশটার পরই, সেই খবর বাসি হয়ে গেল। আবার নতুন কোনও খবরের জন্য আমাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। অন্য একজন রিপোর্টার হয়তো পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে, হারিয়ে দেওয়ার জন্য।

রোজ রোজ এই পরীক্ষা দিতে, আমি আর পারছি না। তার চেয়ে সরে যাওয়া ভাল। সাংবাদিকতা ছাড়া, আরও অনেক পেশা আছে। কিছু না পেলে কোনও কলেজে না হয় পড়াব। ভাল সাংবাদিক হওয়ার জন্য অনেক অনেক গুণ থাকা দরকার। কয়েকটা আমার মধ্যে নেই। আমি চালিয়াতি জানি না। দুমদাম মিথ্যে বলতে পারি না। লোকের অনিষ্ট করার কথা ভাবলেই পিছিয়ে যাই। আমার কোনও অ্যাম্বিশন নেই। তাই আমার জীবনে এখন কোনও ব্যস্ততা নেই। আমি পরশুর কথা ভাবি না। দীপেন-সুধীন-তীর্থঙ্কররা খুব দূরদর্শী। ওরা সব সময় তিন পা আগের কথা ভেবে, আজকের কাজ করে। ওদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। খবরের কাগজের অফিসে, স্রেফ তেল দিয়েও উন্নতি করা যায়। প্রীতম বলে একটা ছেলে, আমার চার বছর পর ঢুকেও, নিউজ এডিটরকে তেল দিয়ে প্রিন্সিপ্যাল করসপন্ডেন্ট হয়ে গেছে। আমি পড়ে আছি শুধু রিপোর্টার গ্রেডে।

আমি কোনও দিন ফালতু কারণে অফিস কামাই করি না। আজ হঠাৎই ইচ্ছে করল, অফিস কামাই করার। নিজেকে নিয়ে একটু ভাবা দরকার। কেমন হয়, যদি রিপোর্টারের খোলসটা ছেড়ে, আবার সেই পুরনো অয়ন ব্যানার্জি হই ? বহুদিন কারও সঙ্গে আড্ডা মারিনি। আগে প্রায় দিনই আমরা কয়েকজন বন্ধু আড্ডা মারতাম, ত্রিকোণ পার্কে অনিমেষদের বাড়িতে গিয়ে। জ্যোতি, আমি, প্রতাপ, সলিল, দিব্যজ্যোতি। প্রতাপ এখন মুম্বইয়ে। সলিল অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে বছর দু'য়েক আগে। দিব্য বাবার ব্যবসা দেখে। অনিমেষের বান্ধবী রিয়াও আমাদের সঙ্গে তখন আড্ডা মারত। ওকে আমরা ব্যাকটেরিয়া বলে খেপাতাম। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় ব্যাকটেরিয়া মেয়েদের মধ্যে ফার্স্ট হয়ে আমাদের সবাইকে চমকে দিয়েছিল। অনিমেষ এখন চুটিয়ে ব্যবসা করছে। সি আই আই কনফারেন্সে একবার ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ওর হাবভাব মোটেই ভাল লাগেনি। সেন্ট জেভিয়ার্সে এক সঙ্গে পড়েছি। ও বরাবরই আমার সম্পর্কে জেলাস।

"ছোটকা, তুমি জাগা ?"

টুবলুর গলা। ও আসা মানেই বিপদ। কুইজ। তবুও উঠে বসলাম। টুবলুর হাতে কর্ডলেস ফোন। বলল, "তোমার ফোন।"

হাত বাড়িয়ে কর্ডলেসটা নিয়ে বললাম, "অয়ন বলছি।"

—কুণালদা।

—গুড মর্নিং কুণালদা, বলুন।

—ময়দানের কপিটা এক্সিলেন্ট হয়েছে। নিউজ এডিটর আজ খুব প্রশংসা করল তোমার।

মনে মনে বললাম, প্রশংসাটা আমাকে করে লাভ নেই। আসলে প্রাপ্য জ্যোতির। খবরটা ও-ই আমাকে এনে দিয়েছিল। চুপ করে রইলাম।

—দ্যাখো অয়ন, কাল তোমাকে লালবাজার বিট দিইনি বলে, বোধহয় তুমি আপসেট হয়ে পড়েছিলে। কিন্তু আমি জানতাম, ইস্টার্ন কমান্ডে আরও বড় খবর

হবে। আমি ঠিক জায়গায়, ঠিক লোককেই পাঠাই। নিউজ এডিটরকেও এটা বললাম। জানতাম, তোমার সঙ্গে কমান্ডের লোকজনের চেনাশুনা আছে। আর কোনও কাগজে খবরটা কিন্তু বেরোয়নি।

আমার কী যেন হল, দুম করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "ঠিকই ধরেছেন কুণালদা, কর্নেল ভার্গব আমার জ্যাঠামশাইয়ের ক্লাস মেট। আমাকে খুব ভালবাসেন।"

—আই সি। দেখো তা হলে। আমার ইনট্রুইশন মিলতেই হবে। ফাইন, তুমি ফার্দার এক্সপ্লোর করো খবরটা। কর্পোরেট বডিটায় কারা কারা আছে, বের করতে পারবে ?

—চেষ্টা করব কুণালদা। কিন্তু আমাকে দু'একদিন সময় দিতে হবে।

—নাও। তোমাকে অন্য কোনও ডিউটি করতে হবে না। এটা দেখো। তোমার এই খবরটা নিয়ে আজ অ্যাসেম্বলিতে ঝড় উঠবে। সৌগত ফোন করেছিল সকালে। অ্যাসেম্বলিতে লোক পাঠাতে বলেছে। আমরা ফলো আপ করছি। তোমাকে আর আজ আসতে হবে না। খবরটা চেজ করো।

—আমি এখুনি বেরিয়ে যাচ্ছি।

—বাই দ্য বাই, তোমার মা কেমন আছেন ?

বলতে গিয়ে কষ্ট হল, তবুও বললাম, "এখন একটু ভাল।"

ফোন ছাড়ার আগে কুণালদা বলল, "কোনও দরকার হলে আমাকে বলতে হেজিটেট কোরো না।"

কর্ডলেসের সুইচটা অফ করে চোখ বুজলাম। ছি ছি, কেন জলজ্যান্ত মিথ্যে কথাটা বলতে গেলাম ? আমার কোনও জ্যাঠামশাই নেই। কর্নেল ভার্গব আমাকে চেনেনও না। কাল রাতে ফোনে অবশ্য একবার কথা বলেছি। আজ চিনতে পারবেন কি না সন্দেহ। যে কর্পোরেট বডি ময়দানে হোটেল বানাতে চায়, তাদের নাম বের করা কি সহজ কাজ ? এক বছর ধরে চেষ্টা করলেও, তা বের করতে পারব না। কেন ফালতু চালিয়াতি করতে গেলাম ?

কুণালদার কথাবার্তায় অবশ্য একটা জিনিস বুঝতে পারলাম, এই খবরটা রাতারাতি আমার ওজন অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে অফিসে। না হলে চিফ রিপোর্টারের মতো ঘাঘু মাল আমাকে এত খাতির করে কথা বলত না। জ্যোতি বলেছিল, এই খবরটা আনন্দবাজার সুপার লিড করবে। এ দিকে কুণালদা বলল, খবরটা এক্সক্লুসিভ হয়েছে। তা হলে কি আনন্দবাজার খবরটা করেনি ? খবরের কাগজে এখনও চোখ বুলাইনি। একটু পরে, নীচে নেমে দেখে নেব। তার আগে, জ্যোতিকে একটা ধন্যবাদ জানাব কি না, ঠিক মনস্থির করতে পারলাম না।

টেবলের ওপর চায়ের কাপ রাখার শব্দ হল। চোখ মেলে দেখি, মেজবৌদি। মুখটা হাসিতে ভরিয়ে বলল, "কার ধ্যান করা হচ্ছে বুবলুবাবু ? শর্মিলার ?"

মা আমাকে ডাকত বুবলু বলে। আর কেউ ডাকে না। মেজবৌদির পিছনে লাগার জন্য বললাম, "আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন, পিঙ্কিদি।"

চোখ পাকাল মেজবৌদি, "সাহস বেড়ে গেছে, না ? বড়দের নাম ধরে ডাকছ আজকাল। বড়দিকে ডাকব ?"

—ডাকলেও সুপ্রিয়াদি এখন আসতে পারবেন না। এমন ব্যস্ত।

বড়বৌদির নাম সুপ্রিয়া। বাপী ছাড়া এ নামে বাড়িতে আর কেউ ডাকে না। বড়দা ডাকে প্রিয়া বলে। তবে খুব কম। বড়বৌদির নামটা শুনে মেজবৌদি বলল, "ছোড়দা, তোমার এত অধঃপতন হয়েছে!"

—অবনীমোহনবাবু বাড়িতে নেই বলে, সাহস বেড়ে গেছে পিঙ্কিদি।

মেজবৌদি এগিয়ে এসে কান ধরল আমার। বাবার নাম অবনীমোহন। বাড়িতে আমরা সবাই ডাকি বাপী বলে। এমনকী, বাড়ির বউরাও। মেজবৌদি কান ধরে রেখেই বলল, "জার্নালিস্ট বলে তুমি যা ইচ্ছে তাই করবে নাকি?"

—অয়ন আবার কী করল, পিঙ্কি? বলতে বলতে ঘরে ঢুকল বড়বৌদি। হাতে একগাদা খবরের কাগজ। "এ কী, এত বড় ছেলের কান ধরে আছিস কেন পিঙ্কি?"

—দিদি, ও আমাকে পিঙ্কি বলে ডাকছে।

বড়বৌদি কিছু বলার আগেই বলে উঠলাম, "আমাকে বুবলু বলল কেন?"

শুনে বড়বৌদি হাসল। তারপর খবরের কাগজগুলো এগিয়ে দিয়ে বলল, "অয়ন তোমার খবরটা আজ ভাল হয়েছে। মা বেঁচে থাকলে আজ খুব খুশি হতেন।"

মেজবৌদি আগ্রহ দেখিয়ে বলল, "ছোড়দার কী খবর বেরিয়েছে দিদি, দেখি। আমাকে তোমরা কেউ বলোনি, আশ্চর্য!"

আমার হাত থেকে কাগজগুলো ছিনিয়ে নিল মেজবৌদি। দৈনিক প্রভাত কাগজটা মেলে ধরল। বিছানায় বসেই চোখে পড়ল, প্রথম পাতায় ছয় কলম লিড হয়েছে ময়দান অঞ্চলে জমি বেআইনি হাত বদলের খবরটা। বারো পয়েন্টে আমার নাম, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখেই বুকটা ধক করে উঠল। এর আগে রবিবাসরের পাতায় আমার নাম দিয়ে লেখা বেরিয়েছে। কিন্তু কাগজের প্রথম পাতায় এই প্রথম আমার নাম বেরোল। আমার জীবনে আজ একটা মনে রাখার মতো দিন।

মেজবৌদি খবরটায় একবার চোখ বুলিয়েই বলল, "ছোড়দা, এবার থেকে আমাদের চিনতে পারবে তো?"

বড়বৌদি চোখ পাকিয়ে বলল, "এই যা তো পিঙ্কি, পালা। নীচে গিয়ে ডাইনিং টেবলটা রেডি কর। অয়নের অনারে আজ সবাই মিলে ব্রেকফাস্ট করব।"

মেজবৌদি শাসন করার ভঙ্গিতে একবার তাকিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যার অর্থ, এবারকার মতো ছেড়ে দিলাম। পরে মজা দেখাব। টেবল থেকে চায়ের কাপটা টেনে নিলাম। মেজবৌদি আমার সমবয়সী। খুব হাসিখুশি। বড়বৌদির দূর সম্পর্কের আত্মীয়। মেজবৌদির বাবা দিল্লিতে সেন্ট্রাল গভর্মেন্টের বড় অফিসার ছিলেন। রিটায়ার করার পর কলকাতায় ফিরে, রিজেন্ট পার্কে বাড়ি করেন। তখনই আমাদের বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। এ বাড়িতে বউ আনার ব্যাপারে বড়বৌদির নিজস্ব একটা থিওরি আছে। দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছাড়া আর কাউকে আনবে না। বড়বৌদি বলে, এতে নাকি সংসারের বাঁধনটা খুব মজবুত হয়। বড়বৌদির খুব ইচ্ছে ছিল, পরমাকে এ বাড়ির ছোট বউ করে আনার। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব না।

লেখার টেবলে দশ বারোদিন বসার সময় পাইনি। আগোছাল অবস্থায় পড়ে ছিল। বড়বৌদি গুছিয়ে দিতে লাগল। হাত চালাতে চালাতেই বলল, "সকাল থেকে বুবুনটা জ্বরে পড়ল। মাঝে মাঝেই শরীর খারাপ হচ্ছে। মেয়েটাকে ডাক্তার দেখাতে হবে। আজকাল কী যে হল মেয়েগুলোর। ডায়েটিং শুরু করেছে। এটা খাব না,

ফ্যাট। ওটা খাব না, বেশি প্রোটিন।"

বুবুনের কথা উঠতেই, হঠাৎ মনে পড়ল, কাল রাতে রীতাদের বাড়ি থেকে ওকে আমার নিয়ে আসার কথা ছিল। কাজের চাপে ভুলেই গিয়েছিলাম সে কথা। মনে পড়তেই জিজ্ঞাসা করলাম, "বৌদি, কাল রাতে ও কার সঙ্গে ফিরল?"

—তোমার দাদা গিয়ে নিয়ে এল। রাত সাড়ে দশটায় ফোন করে বলল তুমি যাওনি। রীতাদের বাড়িতে বোধহয় খুব হইহুল্লোড় করেছে। হিম লাগিয়েছে। এখন কাহিল।

—কত জ্বর?

—ভোরের দিকে ছিল আড়াই। এখন অবশ্য উঠে বসেছে। অয়ন, লক্ষ্মীটি ভাই, দেরি কোরো না। ফ্রেশ হয়ে নীচে এসো। তুমি না আসা পর্যন্ত ব্রেকফাস্ট শুরু হবে না।

টেবল গুছিয়ে দিয়ে বড়বৌদি নীচে নেমে গেল। মনটা খুব ঝরঝরে লাগছে। দৈনিক প্রভাত কাগজটা টেনে, নিজের খবরটাই একবার মন দিয়ে পড়লাম। নাগেরবাজারের সেই খুনের খবরটা নীচের দিকে রয়েছে। চার কলম অ্যাঙ্কর। "পুলিশের সন্দেহ, খুনি সজল নয়, অন্য কেউ।" দীপেনকে কাল যতটুকু বলেছিলাম, তার বাইরে আর কিছু ও জোগাড় করতে পারেনি। খবরে পুরকায়স্থর নামটা কোথাও নেই। পুরো খবরে ভৌমিকের নাম অবশ্য দু'বার আছে। পুরকায়স্থ আমার উপর চটে যাবে। খবরটা পুরো পড়ে বুঝতে পারলাম, দীপেন ইচ্ছে করে এই খচড়ামিটা করেছে।

কাগজে চোখ বোলাতে বোলাতে হঠাৎই মনে হল, জ্যোতিকে ফোন করে একবার ধন্যবাদ জানানো দরকার। খবরটা ও না দিলে, আজ আমার নাম দিয়ে এত বড় করে বেরোত না। কথাটা মনে হতে, নম্বর টিপতে শুরু করলাম। রিঙ হচ্ছে। জ্যোতিই এসে ধরল, "হ্যালো।"

—অয়ন বলছি। থ্যাঙ্কস।

—হঠাৎ?

—না, মানে ... খবরটার জন্য।

—কিৎসু হয়নি। তোর খবরে অনেক খুঁত আছে। ফালতু রিপোর্ট করেছিস। ঠিক মতো চেজই করিসনি।

BOIRBOI.NET

—কেন?

—ময়দান এরিয়াটা কি তোদের বাড়ির উঠোনের মতো জায়গা? কোন জায়গাটায় হোটেল হচ্ছে, লিখেছিস? জায়গাটা কত একর, বের করতে পেরেছিস। যে কর্পোরেট বডিটা জায়গা নিয়েছে, তারা কারা হিন্টস দিয়েছিস? অন্য যে কেউ, এ খবরটা আরও ভাল করত।

ভেবেছিলাম, জ্যোতি উৎসাহ দেবে। ও তো উল্টো কথা বলছে! মনটা দমে গেল। আমতা আমতা করে বললাম, "কুণালদা ফোন করেছিল। ভীষণ প্রশংসা করল।"

—আর তাতেই তুই গলে গেলি। কুণালটা সাদা শুয়ার। তোকে এক রকম কথা বলবে, এডিটোরিয়াল মিটিংয়ে গিয়ে বলবে উল্টোটা। ওকে তুই চিনিস না?

কথাটা মিথ্যে নয়। চুপ করে রইলাম। জ্যোতি গজরাতে লাগল, "দ্যাখ অয়ন, এ লাইনে যদি টিকতে চাস, খেটে খা। কতদিন তোকে বাঁচাব ? বাড়ির আদর খেয়ে তুই গোল্লায় গেছিস। তোর দ্বারা হবে না। আগে তো এমন ছিলিস না ?"

এ প্রান্ত থেকে কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে জ্যোতি একটা সময় ফোন ছেড়ে দিল। আমি গুম হয়ে বসে রইলাম। জ্যোতির উপর রাগ হচ্ছে একটু একটু। কী ভাবছে কী নিজেকে ? অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারটা আমার উপর ভর করে পেরিয়ে এল। আর এখন আমাকে জ্ঞান দিচ্ছে। ও যখন যা চাইত, বিনা দ্বিধায় তা দিতাম। ভাল ভাল সব প্রফেসরের নোট। তখন ও-ই আমার পিছন পিছন ঘুরত। এ সব কথা সবাই জানে। লোকে বলত, অয়ন-জ্যোতির এমন বন্ধুত্ব দেখা যায় না। আর এখন ? আমায় জ্ঞান দিচ্ছে !

ধূর, এই প্রফেশনে আর থাকবই না। অন্যের কাছে ছোট হওয়া, আর পোষাচ্ছে না। কী ক্ষতিটা হবে, খবরের কাগজে চাকরি না করলে ? আমি ইউনিভার্সিটির গোল্ড মেডেলিস্ট। জ্যোতির মতো ছেলেরা, আমার নখের যোগ্য না। রাগটা বাড়তে লাগল। নিজেকে সামলাবার জন্যই তাড়াতাড়ি মুখ-টুখ ধুয়ে নীচে নেমে এলাম। হঠাৎই মনে হল, আজ আর অফিস যাব না। কাল-পরশুও যাব না। আয়েস করে কাটাব। ভাবব, ভাল করে ভাবব। কাগজ ছেড়ে অন্য কী করা যায়। কুণালদাকে একটা ফোন করে দেব। মায়ের অবস্থা খুবই খারাপ।

ডাইনিং টেবলে আজ কিন্তু সবাই হাজির। বড়দা-বড়বৌদি, মেজদা-মেজবৌদি, বুবুন-টুবলু সবাই। দু'টো চেয়ার শুধু খালি। আটজনের জন্য এই ডাইনিং টেবলটা মা খুব শখ করে বানিয়েছিল একসময়। মায়ের ইচ্ছে ছিল, দিনের বেলায় যে যেমন ইচ্ছে খাও, ডিনার খেতে হবে সবাই একসঙ্গে। বেঁচে থাকলেও মায়ের এই ইচ্ছেটা হয়তো, কখনই পূরণ হত না। রাতে ঠিক সময়ে, কোনওদিনই বাড়ি ফিরতে পারতাম না। মাও কি আমাকে সাংবাদিক হতে দিত ? মনে হয় না।

বুবুনকে দেখেই মনে হচ্ছে, শরীরটা ওর ভাল নেই। মুখটা ফোলা, রুমাল দিয়ে ঘনঘন নাক মুছছে। ওকে দেখে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। ওর পাশের চেয়ারটা খালি। সেখানে গিয়ে বসতেই বড়বৌদি বলে উঠল, "অয়ন, ওখানে নয়। আমার পাশে এসে বোসো।"

গিয়ে বসলাম, উল্টোদিকের চেয়ারে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে শোভামাসি। বড়বৌদির ইশারা পেলেই খাবার এনে দেবে। বাড়ির এত জন একসঙ্গে, এ রকম সাধারণত হয় না। মেজদা খুব ব্যস্ত মানুষ। রোজ দেখা হয় না। আমাকে বসতে দেখে বলল, "অয়ন, তোর সঙ্গে নর্থ চব্বিশ পরগনার এস পি-র খাতির-টাতির কেমন ?"

নর্থ চব্বিশ পরগনার এস পি হলেন প্রসূন বসু। আগে লালবাজারে ছিলেন। তখন থেকে চেনা। বললাম, "ভালই। কেন ?"

—আর বলিস না। বাগুইআটিতে যেখানে আমার নেক্সট প্রোজেক্ট, সেখানে একটা লোকাল ছেলে ট্রাবল দিচ্ছে। ছেলেটার নাম মনা, মনোতোষ। নটরিয়াস। এস পি-কে বলে একটু ঠাণ্ডা করে দিবি ?"

—এখুনি বলে দিচ্ছি। টেলিফোনটা দাও।

—না, এখনই বলতে হবে না। ছেলেটাকে আজ ডেকে পাঠিয়েছি। কিছু টাকা পয়সা চাইলে, দেব। সব জায়গাতেই দিই। বেগড়বাই করলে তুই তো আছিসই।

কথাটা শুনে চমকে উঠলাম। 'তুই তো আছিসই।' সাংবাদিক বলে আমাদের সম্পর্কে লোকের কী ধারণা! আমি অন্য কোনও পেশায় থাকলে মেজদা এ কথা বলতে পারত?

দরজার সামনে শোভামাসি দাঁড়িয়েই আছে। খাবার আনার কোনও উদ্যোগ নেই। কারও জন্য কি অপেক্ষা করছে? কার জন্য? বাড়িতে তো আর কেউ নেই। খাবার টেবলে আমি চুপ করে বসে থাকতে পারি না। বড়বৌদি তা জানে। রোজ বাথরুমে ঢোকার আগে, বড়বৌদিকে বলে ঢুকি, বেরিয়েই যেন সব রেডি পাই। আজ অবশ্য অন্য ব্যাপার। ছুটির মেজাজ। জানি না, সত্যিই ছুটির দিন কি না। তাড়াহুড়ো করা তাই ঠিক হবে না।

হঠাৎ কলিং বেলের শব্দ। একটু পরেই চাঁদু এসে বলল, "ছোড়দাবাবু দু'জন লোক তোমায় ডাকছে।"

—তুই চিনিস?

—না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। এত সকালে আবার কে এল? আমার খোঁজে ইদানীং খুব বেশি লোকজন আসে না। আগে মাঝেমধ্যে বন্ধুদের বাড়িতে যেতাম। এখন যাওয়ার সময় পাই না। তাই কেউ আমার খোঁজও করে না। আমার জগৎটা খুব ছোট হয়ে গেছে। কোনও বুধবার সময় পেলে অবশ্য রোয়িং ক্লাবে যাই। একটা সময় রোয়িং করতাম। নাম ছিল রোয়ার হিসাবে। এখনও মেম্বার।

বাইরে বেরিয়ে দেখি, টাটা সুমোর সামনে দুই ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। কখনও দেখেছি বলে মনে করতে পারলাম না। একজনের গায়ে দামি স্যুট। অন্যজনের জ্যাকেট। আমাকে দেখেই ওরা দু'জন এগিয়ে এলেন। স্যুটপরা ভদ্রলোক বললেন, "অয়নবাবু, মিনিট দুয়েক কথা বলা যাবে?"

—আসুন।

ড্রয়িংরুমে সোফায় বসে ভদ্রলোক বললেন, "অয়নবাবু, আমার নাম রাজকুমার কেডিয়া। আমি একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।"

—বলুন।

BOIRBOI.NET

—আমাদের একটা কর্পোরেট বডি আছে। পরে সে সম্পর্কে ডিটেল বলা যাবে। আমরা একটা টিভি চ্যানেল ওপেন করছি। বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য আলাদা একটা চ্যানেল। এই উদ্যোগটা বাংলাদেশের দু'তিনজন আর আমরা নিয়েছি। আপনাকে আমরা পেতে চাই।

—আমাকে? কেন?

—দেখুন, নিউজ পেপার ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার সম্পর্কে আমরা খোঁজ খবর নিয়েছি। টিভি-র নিউজ রিপোর্টিংয়ের জন্য আপনার মতো লোক দরকার। হ্যান্ডসাম, ডায়নামিক, ড্যাশি ...

দরজার পর্দা হঠাৎ সামান্য নড়ে উঠল। তলার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, বড়বৌদি। কথা শুনছে। ড্রয়িং রুমের সব কথা ডাইনিং হল থেকে এমনিতেই শোনা যায়।

মনের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, এই সুযোগ। মুখে বললাম, "মিঃ কেডিয়া, প্রস্তাবটা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। সরি, আপনাদের অফারটা নিতে পারছি না।"

—অয়নবাবু, আমরা কিন্তু এখনও পুরো অফারটা দিইনি। আমাদের প্রোজেক্ট একশো কোটি টাকার। আমরা কিন্তু ভাল স্যালারি দেব।

—যেমন ?

—ধরুন, পার এনাম থ্রি ল্যাকস।

শুনে মাথা ঘুরে গেল। বছরে তিন লাখ ! মানে, মাসে পঁচিশ হাজার টাকা ? টিভি কোম্পানিগুলো আজকাল ভাল মাইনে দেয়, জানি। তাই বলে এত টাকা ! আজ সকাল থেকে যা ঘটছে, সবই ভাল। কী হলটা কী আমার ?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে কেডিয়া বললেন, "অয়নবাবু, প্রিন্ট মিডিয়ার ভবিষ্যৎ কিন্তু খুব ভাল নয়। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সুইচ ওভার করুন। এখন ঢুকলে, অনেকের চেয়ে এগিয়ে থাকবেন। ফর ইওর ইনফরমেশন, আপনার এক কলিগও কিন্তু আমাদের এখানে জয়েন করছেন। অ্যান্ড হি ইজ ভেরি ভেরি সাকসেসফুল রিপোর্টার।"

—কে বলুন তো ?

—সরি, এখনই নামটা ডিসক্লোজ করা যাচ্ছে না। উনিই আপনার নামটা রেফার করেছেন। আপনি হেজিটেট করছেন কেন ?

—দেখুন, ইলেকট্রনিক মিডিয়া সম্পর্কে আমার কোনও অভিজ্ঞতাই নেই।

—হয়ে যাবে। আমরা আপনাকে, ট্রেনিং নেওয়ার জন্য বিদেশে পাঠাব। প্রোবাবলি লন্ডনে। আগে বলুন, আপনি রাজি কি না। তিন লাখটা, সাড়ে তিনও হতে পারে। সেটা নেগোসিয়েবল।

পাত্তাই দিলাম না কথাটা। বললাম, "মিঃ কেডিয়া, আমি আর জার্নালিজম করব কি না, সিওর নই।"

হাসলেন কেডিয়া। তারপর বললেন, "অয়নবাবু, আপনার বয়স খুব বেশি না। একটা কথা বলি। আপনার মধ্যে ভাল জার্নালিস্টের সব ক'টা লক্ষণই আছে। ইন বরন্ কোয়ালিটি। অন্য লাইনে গেলেও আপনি সুস্থির থাকতে পারবেন না। আমার কথা মিলিয়ে নেবেন। সে যাক। আপনার জন্য আমরা অপেক্ষা করব। আগে প্রস্তাবটা নিয়ে ভাবুন। চ্যানেল শুরু হতে এখনও মাস ছয়েক দেরি। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আজ তা হলে আমরা চলি ?"

যাওয়ার আগে একটা নেমকার্ড এগিয়ে দিলেন কেডিয়া। তারপর বললেন, "বাই দ্য বাই, আপনার আজকের স্টোরিটা খুব সেনশেসনাল। এই রকম স্টোরিই আমরা টিভি-তে ব্রেক করতে চাই।"

মনে মনে হাসলাম। ভদ্রলোকরা বেরিয়ে যেতেই, ডাইনিং টেবলে আবার ফিরে এলাম। মেজদার কানে সব কথা গেছে। চেয়ারে বসতেই মেজদা বলল, "অয়ন, তোর মাথাটা কি খারাপ হয়েছে ? এত বড় অফারটা তুই ছেড়ে দিচ্ছিস !"

মেজবৌদি বলল, "মাসে পঁচিশ হাজার ! রাষ্ট্রপতিও পায় না।"

বুবুন বলল, "ছোড়দা তুই প্রফেশন ছেড়ে দিবি ? কেন রে ?"

বড়দা বলল, "বাংলা চ্যানেলের খবরটা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডে পড়েছি। বিরাট

প্রোজেক্ট। অন্তত দৈনিক প্রভাতের চেয়ে ভাল ফিউচার। তুই ছাড়িস না অফারটা।"

একমাত্র বড়বৌদিই কোনও কথা বলল না। আমি জানি, বলবে না। বড়বৌদি জানে, নিশ্চয় কোনও কারণ আছে। না হলে আমি এই সিদ্ধান্তটা নিতাম না। পরে জিজ্ঞাসা করবে।

শোভামাসি খাবার সাজিয়ে দিচ্ছে টেবলে। কী একটা ঠাট্টা করতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ভেতরের দিকে চোখ পড়তেই দেখি, বড়বৌদির ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে প-র-মা ! পরনে গাঢ় মেরুন রঙের বনশৃঙ্গার শাড়ি। একই রঙের ফুল স্লিভ ব্লাউজ। গলায় মুক্তোর মালা। চুলে শ্যাম্পু। ওর উজ্জ্বল ফর্সা রঙ চোখ ধাঁধিয়ে দিল। পরীর মতো মনে হচ্ছে পরমাকে। ওকে দেখেই বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল। বহুদিন পর ওকে সামনা-সামনি দেখলাম। আরও সুন্দর লাগছে। এক ঝলক তাকিয়েই মুখটা আমি নামিয়ে নিলাম। সহ্য করতে পারলাম না ওর রূপের ছটা। ফের যখন মুখটা তুললাম, তখন কাছে এসে, শাড়ির আঁচলটা কাঁধে তুলে দিতে দিতে টেবলের সবার উদ্দেশে, এক মুখ হাসি ছড়িয়ে পরমা আদুরে গলায় বলল, "গুড মর্নিং এভরিবডি।" বলেই আমার ঠিক উল্টোদিকের চেয়ারে বসে পড়ল।

হঠাৎ কী হল, জানি না। পরমার গলাটা শোনামাত্রই চিনচিনে রাগ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। ওর দিকে একবার জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে, চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম।

বড়বৌদি বলে উঠল, "এ কী, অয়ন উঠছ কেন ?"

বললাম, "বৌদি, ভুলেই গেছিলাম। এখুনি একবার শর্মিলার বাড়ি যেতে হবে। জরুরি দরকার।" বলতে চাইলাম, জ্যোতির বাড়ি। কেন যে শর্মিলার নামটা মুখ থেকে ছিটকে বেরোল, জানি না।

॥ চার ॥

যতীন দাস পার্কের কাছে থাকে শিলাজিৎ। ঘুরতে ঘুরতে ওর বাড়িতে এসেছি। ইউনিভার্সিটিতে আমরা একই সঙ্গে পড়তাম। তখন ওর বাড়িতে খুব যেতাম। ও তখন থাকত আরপুলি লেনে। ইউনিভার্সিটি থেকে মাত্র কয়েক পা দূরে। ওদের বাড়িটা সে সময় একেবারে ভেঙে পড়া অবস্থায়। তখন ভাবতাম, ওরা থাকে কী করে, ওই রকম বাড়িতে ? খবরের কাগজের অফিসে ঢোকার পর থেকে শিলাজিতের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ খুব কমই হয়েছে। শেষ বার ওকে দেখি বইমেলায়। ইউ বি আই অডিটোরিয়ামে একটা সেমিনার কভার করতে গেছিলাম। হঠাৎ দেখি, শিলাজিৎ এক পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনছে। কাঁধে একটা শান্তিনিকেতনি ব্যাগ। ওকে খুব রোগা দেখাচ্ছিল। দেখে মনে হয়েছিল, খুব অভাবের মধ্যে রয়েছে।

পড়াশুনায় কিন্তু খুব ভাল ছিল শিলাজিৎ। ইউনিভার্সিটিতে পরিচয় হওয়ার পর থেকে, লক্ষ করতাম, অদ্ভুত এক ধরনের হীনম্মন্যতায় ভুগত ও। ধনী পরিবারের ছেলেদের সঙ্গে মিশত না। প্রথম প্রথম আমাকেও এড়িয়ে যেত। আমি বহুবার ওদের বাড়ি গেছি। কিন্তু কোনওদিন ওকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারিনি।

মণিকার সঙ্গে ওর বিয়ে হয় ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পড়তেই। রেজেস্ট্রি ম্যারেজের সময় আমি আর জ্যোতি সাক্ষী হয়েছিলাম। বিয়ের খবরটা শিলাজিৎ ওর বাড়িতে জানায়, তীর্থপতি ইন্সটিটিউশনে চাকরি পাওয়ার পর। আরপুলি লেনের বাড়ি ছেড়ে মণিকা আর ও, যতীনদাস পার্কের কাছে চলে আসে।

বইমেলায় শেষ যেদিন শিলাজিতের সঙ্গে দেখা হয়, সেদিন ওর পাশে ছিল মণিকাও। দু'জনে মিলে অনুযোগ করেছিল, আর যোগাযোগ না রাখার জন্য। মণিকা এমনও বলেছিল, "অয়নদা, আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দেবেন ? সংসার আর টানতে পারছি না। আপনাদের তো অনেক ক্ষমতা।" বাচ্চা-কাচ্চা হয়েছে কি না, জানতে চাওয়ায়, শিলাজিৎ ম্লান মুখে বলেছিল, "তোর মাথা খারাপ ? একটা প্রাণীকে নিয়ে এসে কষ্ট দেব।" শুনে খুব খারাপ লেগেছিল।

সকালে হুট করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় অবশ্য শিলাজিতের কথা মনে হয়নি। শেষবার যখন বড়বৌদির দিকে চোখ পড়ে, তখন চমকে উঠেছিলাম। এমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছিল সেই মুখটা। কেন বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে, জানি না। বউদির ওই পাণ্ডুর মুখটাই আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বেরোবার সময় হেলমেট নিয়ে আসিনি। মোটরবাইক চালিয়ে রেসকোর্সে পৌঁছতেই পুলিশ থামিয়ে দিয়েছিল। নো এন্ট্রি। ছাব্বিশে জানুয়ারির প্যারেডের জন্য মহড়া চলছে রেড রোডে। ওদিকে যাওয়া যাবে না।

সার্জেন্ট ভদ্রলোক হেস্টিংস থানার। ভাল করে তাকাতেই চিনতে পারলাম। পরে দেখলাম, উনিও আমাকে চেনেন। সাবধান করে দিলেন উনি, "দাদা, হেলমেট ছাড়া এসপ্ল্যানেডের দিকে এখন যাবেন না। বড় কর্তারা অনেকে ওখানে আছেন। আপনি যাবেন কোথায় ?"

মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "ফোর্ট উইলিয়ামে।"

—খবরের জন্য ?

—সে রকমই কিছু।

সার্জেন্ট ভদ্রলোক সামান্য এগিয়ে এসে বললেন, "আমাদের থানায় একবার যান। খবর পাবেন। ডি সি আছেন। ভোরবেলায় রেইড করে উনি হিউজ কোয়ানটিটির আর ডি এক্স সিজ করেছেন।

—কোত্থেকে ?

—খিদিরপুরের এক লিডারের বাড়ি থেকে। নামটা শুনলে চমকে উঠবেন। জানি না, ডি সি ডিসক্লোজ করবেন কি না।

—কে বলুন তো ?

—আপনি যান না থানায়। এই তো মিনিট কয়েকের রাস্তা। ফ্লাইওভার দিয়ে চলে যান। ডি সি-কে পেয়ে যাবেন।

থানায় যাচ্ছি, এটা সার্জেন্টকে দেখাবার জন্য বাইকটা উল্টোদিকে ঘুরিয়ে নিলাম। কিন্তু মনে মনে বললাম, ধুর, আমার কী দরকার। খবর জ্যোতিরা করুক। কোনও ইচ্ছে নেই আমার। রেসকোর্সের দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছে বাইক ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম আলিপুরের দিকে। রাজা সন্তোষ রায় রোডে থাকে আমার এক বন্ধু শিবদাস। ওর বাড়িতে গিয়ে শুনলাম, বউ নিয়ে শ্বশুরবাড়ি গেছে। চেতলায় আর এক বন্ধু

সোমনাথকেও পেলাম না। মায়ের অসুখ। নার্সিংহোমে। তখনই হঠাৎ শিলাজিতের কথা মনে হয়। সোমনাথও ওর বিয়েতে সাক্ষী হয়েছিল।

দরজা খুলে দিয়েছিল মণিকা। আমাকে দেখে হাসিমুখে বলে উঠেছিল, "অয়নদা, আপনি ?"

—শিলাজিৎ নেই ?

—কাছেই আছে। ডাকতে পাঠাচ্ছি। আসুন, ভেতরে আসুন। ভাবতেই পারছি না, আপনি এসেছেন। কালই ও আপনার কথা বলছিল। কী যেন একটা বলতে গিয়ে।

মণিকার পরনে বেশ দামি একটা ম্যাক্সি। দেখে একটু অবাকই হলাম, ঘাড়ের কাছে ছাঁটা ওর চুল। মুখটা ভরাট হয়েছে। বেশ লাগছে ওকে দেখতে। দেখে মনে হল, নিয়মিত বিউটি পার্লারে যায়।

—আপনি বসুন। জিতের কাছে খবর পাঠাচ্ছি। বলেই ভারী পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল মণিকা।

সাংবাদিকদের সব সময় একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করে। ঘরের চার পাশে চোখ বুলিয়ে বুঝতে পারছি, গত চার বছরে শিলাজিৎ ওর অবস্থা অনেকটা বদলে ফেলেছে। ওয়াল টু ওয়াল সোফা। মেঝেতে কাশ্মীরি কার্পেট। মাঝে কাচের লো টেবল। এক পাশে উনত্রিশ ইঞ্চি টিভি। তার পাশে সুন্দর একটা বুকসেলফ। নানা ধরনের হ্যান্ডিক্রাফট। সিলিং থেকে বাল্ব লাগানো একটা লণ্ঠন ঝুলছে। সর্বত্র রুচির ছাপ। দেখে বেশ ভাল লাগল। নিশ্চয়ই মণিকা সাজিয়েছে।

পর্দা সরিয়ে এই সময় ঘরে ঢুকল মণিকা। ম্যাক্সি পাল্টে শাড়ি পরে এসেছে। সোফায় বসে বলল, "এসেছেন যখন, আপনাকে ছাড়ছি না। দুপুরে কিন্তু খেয়ে যাবেন।"

—না গো। একটু তাড়া আছে।

মণিকা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, "ছাড়ুন তো। কাজ আর কাজ। কী হবে এত কাজ করে ? আপনার সঙ্গে আজ এক জনের পরিচয় করিয়ে দেব। অনেকদিন ধরে বলছে।"

—কে ভদ্রলোক ?

—ভদ্রলোক নন মশাই, ভদ্রমহিলা। আপনার লেখার খুব ভক্ত। আপনার একটা গল্প পড়ে, আপনাকে একটা চিঠি লিখেছিল। জিৎ আপনার বন্ধু জেনে, বলে রেখেছে, আপনি এ বাড়িতে এলেই ওকে ডেকে আনতে।

মণিকার চোখ-মুখ ঝকঝক করছে। ভদ্রমহিলা সম্ভবত, ওদের কোনও প্রতিবেশিনী। মাঝেমধ্যে রবিবারের পাতায় গল্প লিখি। পড়ে থাকবেন। ভক্ত কথাটা শুনে একটু লজ্জাই লাগল। আমাদের মতো ফালতু লেখকের আবার ভক্ত ! মণিকা একটু বাড়িয়েই বলছে। রবিবারের পাতায় আমার একটা গল্প পড়ে অবশ্য, সত্যিই এক ভদ্রমহিলা চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন, "আরও লিখুন।" কিন্তু লিখবটা কখন ? খবরের খোঁজেই সারাটা দিন আমাদের কেটে যায়। তার মাঝে, মন ঠিক করে, লেখার জন্য বসা যায় না। এক-একটা গল্প লিখতেই আমার সময় লেগে যায় মাস ছয়েক। জীবিকার প্রয়োজনে এত জায়গায় ঘুরতে হয়, এত লোক, এত

ঘটনা চোখের সামনে দেখি, অনেক সময় সে সব মনের মধ্যে গেঁথে যায়। তখনই হঠাৎ লিখতে ইচ্ছে করে।

—মণিবৌদি আসব ?

বাইরে থেকে কে যেন বলল মিষ্টিগলায়।

—আয়।

পরমুহূর্তেই একুশ-বাইশ বছরের একটা মেয়ে এসে দাঁড়াল ঘরের মধ্যে। পরনে সালোয়ার-কামিজ। মেয়েটার হাইট চোখে পড়ার মতো। প্রায় পাঁচ ফুট সাত-আট। বাঙালি বলে মনেই হয় না। মুখটা একটু লম্বা ধরনের। তবে চোখটা খুব সুন্দর। গায়ের রঙ মাজা। ঘরে ঢুকে মেয়েটা সপ্রতিভভাবে বলল, "আপনি নিশ্চয়ই অয়নদা। আমি কৃষ্ণা।"

আর তখনই মণিকা বলল, "এর কথাই একটু আগে বলছিলাম। হিসট্রি নিয়ে এম এ পড়ছে। আপনার কথা খুব জিজ্ঞেস করে আমাকে।"

—তাই নাকি ? ইতিহাসের ছাত্রী। অথচ সাহিত্যে এত আগ্রহী কেন ?"

মেয়েটা বলল, "বই পড়তে আমার খুব ভাল লাগে। আপনার ওই গল্পটা পড়ে চমকে গেছিলাম। এত সুন্দর লেখেন কী করে ?"

—কোন গল্পটা ?

—ওই, মৃতের ঠিকানা। নায়কের জন্য আমার এমন কষ্ট হয়েছিল, কী বলব। বহুদিন ওই চরিত্রটা আমাকে হন্ট করেছিল। নায়ককে আপনি মেরে না ফেললেই পারতেন।

মনে মনে হাসলাম। এ বার মনে পড়ল, কৃষ্ণা যে চিঠিটা আমাকে লিখেছিল, তাতে এই অভিযোগটা করেছিল। হেসে বললাম, "সব গল্পের শেষটা কি আর সুচিত্রা-উত্তমের সিনেমার মতো হয় ?"

—সেটা অবশ্য ঠিক। জানেন অয়নদা, সুদর্শনা বলে একটা মেয়ে আমাদের ক্লাসে পড়ে। সে আপনাদের পাড়ায় থাকে। ওর মুখে আপনার কথা শুনে শুনে, আপনার সম্পর্কে আমার একটা ধারণা হয়েছিল। সেটা একদম মিলে গেছে।

—আমার সম্পর্কে কী বলেছিল সুদর্শনা ?

—হ্যান্ডসাম। পারফেক্ট জেন্টলম্যান।

মণিকা হেসে উঠল। তারপর বলল, "এই কৃষ্ণা, তুই যা জিজ্ঞাসা করবি বলেছিলি, এই বেলা করে নে। জিৎ এসে বসলে, দুই বন্ধু এমন গল্পে জমে যাবে, আর সুযোগ পাবি না।"

বললাম, "কী ব্যাপার কৃষ্ণা ?"

—আচ্ছা, আমি যদি জার্নালিস্ট হতে চাই, কী করতে হবে ?

এই প্রশ্নটা অনেকেই আমাকে করে। আগে খুব উৎসাহ নিয়ে উত্তর দিতাম। এখন এড়িয়ে যাই। হালকাভাবেই বললাম, "আগে এম এ পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস পেতে হবে।"

কৃষ্ণাও হালকাভাবে বলল, "সে তো পাবই। তারপর ?"

—তারপর কাগজ যখন বিজ্ঞাপন দিয়ে অ্যাপ্রেন্টিস চাইবে, তখন অ্যাপ্লাই করে পরীক্ষায় বসতে হবে।

—আচ্ছা, কাগজে এই অ্যাড কখন বেরোয় ?

—তার ঠিক নেই। মাঝেমধ্যে বেরোয়।

—অয়নদা, আপনাদের প্রফেশনটা খুব অ্যাডভেঞ্চারাস, তাই না ?

—বাইরে থেকে অবশ্য সেটা মনে হয়। বেশিদিন ভাল লাগে না। ইনফ্যাক্ট, আমার তো মনে হয়, অন্য কোনও প্রফেশনে গেলে হয়তো ভাল করতাম।

অবিশ্বাসী চোখে তাকাল কৃষ্ণা, "যাঃ, আপনি ঠাট্টা করছেন।"

এই সময় ভেতর থেকে চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকল চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সী একটা মেয়ে। কৃষ্ণা উঠে গিয়ে তার হাত থেকে ট্রে নিয়ে সেন্টার টেবলে রাখল। মেয়েটাকে আমার হঠাৎই বেশ ভাল লাগল। খুব আন্তরিক। চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে কৃষ্ণা বলল, "জীবনে কোনওদিন কোনও রিপোর্টারের সঙ্গে আলাপ হয়নি। আপনিই প্রথম। আমার সম্পর্কে কাগজে কয়েকবার লেখা বেরিয়েছে। অবাক হতাম এই ভেবে, রিপোর্টাররা আমার কথা জানলেন কী করে ?"

—কী বেরিয়েছে তোমার সম্পর্কে ?

এ বার উত্তর দিল মণিকা, "কৃষ্ণা বলেনি বোধহয়, না ? ও বাস্কেটবল খেলে। বেঙ্গল টিমেও খেলেছে।"

—তাই নাকি ? বাঃ।

—আসলে ও চিত্তরঞ্জনের মেয়ে। ওখানে খেলার তেমন সুযোগ-সুবিধা নেই। তাই এখানে চলে এসেছে। ওর বাবা-মা চিত্তরঞ্জনেই থাকেন। কৃষ্ণা এখানে খেলা আর পড়াশুনা দু'টোই চালিয়ে যাচ্ছে। এখন থাকে কাছেই, ওর দূরসম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়িতে।

এই সময় মণিকার সঙ্গে কৃষ্ণার চোখে চোখে কিছু কথা হয়ে গেল। তারপরই কৃষ্ণা বলল, "থাকার খুবই অসুবিধা। অয়নদা, আমাকে একটু হেলপ করবেন ? কোনও লেডিস হোস্টেলে চলে যেতে চাই। রিপোর্টারদের শুনেছি অনেক ক্ষমতা। কোথাও একটা ব্যবস্থা করে দেবেন ?"

কথাটা এমনভাবে বলল, এড়িয়ে যেতে পারলাম না। বললাম, "লেডিস হোস্টেল সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই নেই। তুমি কি কোথাও অ্যাপ্লাই করেছ ?"

—না। ইউনিভার্সিটির হোস্টেলে থাকতে চাই না। ওখানে খুব পার্টি পলিটিক্স। ওয়ার্কিং গার্লসদের জন্য একটা হোস্টেল আছে গড়িয়াহাটে। এক বন্ধুর গেস্ট হয়ে সেখানে কিছুদিন ছিলাম। ওখানে কোনও ডিসিপ্লিন নেই। বাধ্য হয়ে চলে এসেছি। ওখানে অবস্থা আরও ভয়ানক এখন।

—যেমন ?

—বিশ্রী সব ঘটনা। হোস্টেল সুপারের একটা ছেলে আছে। মস্তান টাইপের। আসলে সে-ই মেয়েদের উপর ছড়ি ঘোরায়। কয়েকদিন আগে একটা মেয়েকে মলেস্ট করার চেষ্টা করেছিল। মেয়েটা লোকাল থানায় ডায়েরি করে। সেটা জানতে পেরে ছেলেটা হোস্টেলে এসে শাসিয়ে যায়। কিছু মেয়ে প্রতিবাদ করেছিল। সেজন্য একদল ছেলেকে নিয়ে গিয়ে সুপারের ছেলে হোস্টেল ভাঙচুর করে। এই ঘটনাটা নিয়ে ওখানে এখন খুব উত্তেজনা।

জিজ্ঞাসা করলাম, "ওটা তো সরকারি হোস্টেল, তাই না ? সুপার নিশ্চয়ই সরকারি

কর্মী।"

—হ্যাঁ।

—ভিক্টিম মেয়েটার নাম বলতে পারো ? তার সঙ্গে দেখা করা যাবে ?

—নাম শ্রেয়সী মিত্র। জানি না, এখনও হোস্টেলে আছে কি না। আমার যে বন্ধুটা ওখানে থাকে, তার নাম কল্যাণী। ওর সঙ্গে কথা বলা যাবে। কেন, আপনি কি খবরটা কাগজে বের করতে চান ? যদি বেরোয়, সুপার কিন্তু তা হলে বেশ দমে যাবে। মেয়েরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।

খবরটা অবশ্যই করা যায়। হয়তো ফ্রন্ট পেজ স্টোরি হয়ে যাবে। তবে হোস্টেলে গিয়ে কথা বলা দরকার। মনে মনে তারিফ করলাম কৃষ্ণার। মেয়েটা খুব স্মার্ট। প্রসঙ্গটা এমনভাবে নিয়ে এল, ইচ্ছে করছে এখনই গড়িয়াহাটে গিয়ে খবরটা করতে। পরক্ষণেই মনে হল, কী দরকার। সময় নষ্ট করে কোনও লাভ নেই। টেলিফোনে একবার বলে দিলেই হবে যে কোনও জুনিয়র ছেলেকে। একটা কথা মনে হওয়ায় হাসলাম। খবরের কাগজ সম্পর্কে হঠাৎ বিতৃষ্ণা আসার পর থেকে, আজ খবর আসছে যেচে যেচে। প্রথমে আর ডি এক্স, তারপর এই হোস্টেলের ঘটনা। আসুক, আসুক। আমার কিছু আসে-যায় না। কয়েকটা দিন আড্ডা, খালি আড্ডা।

চায়ে চুমুক দেওয়ার ফাঁকেই এসে পড়ল শিলাজিৎ। বেশ মোটা হয়ে গেছে। মাথার চুল পাতলা হওয়ার দিকে। পরনে নীল জিনসের প্যান্ট। সাদা হাফ হাতা শার্ট। চোখ-মুখের রঙই পাল্টে গেছে শিলাজিতের। আগের মতো সেই হীনম্মন্যতার ছাপ নেই। বরং উল্টোটাই, বেশ ঝকঝকে আর আত্মবিশ্বাসী মনে হল ওকে দেখে।

বললাম, "তোর আক্কেলটা কী বল তো ? আধ ঘণ্টা ধরে বসে আছি। তোর কোনও পাত্তা নেই। এলি কোত্থেকে ?"

সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে শিলাজিৎ বলল, "ছাত্তর পড়িয়ে। মণি, অয়নকে কিছু খাইয়েছ ?"

—না। তোমার জন্য ওয়েট করছিলাম।

—কুইক। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাকে আবার ব্যাক করতে হবে। মণিময়বাবু আজ আসেননি। ওর ব্যাচের পরীক্ষাটাও আমি নিয়ে নিচ্ছি।

মণিকা উঠে ভেতরে চলে গেল। পিছন পিছন কৃষ্ণাও। ওই একটা কথাতেই বুঝলাম, শিলাজিৎ আজকাল খুব ব্যস্ত। না এলেই বোধহয় ভাল করতাম। বললাম, "থাক, আবার ব্রেকফাস্ট কেন ?"

—ঢ্যামনামো করিস না তো। এদ্দিন পর দেখা। তোকে ছাড়ব ভেবেছিস ? আসলে কী জানিস, মণি আজকাল খুব স্লো হয়ে গেছে। তাই একটু তাড়া দিলাম।

—কী করছিস আজকাল ?

—বিদ্যে শেখানোর ব্যবসা। একটা টিউটোরিয়াল হোম খুলেছি। গাইড। এই কাছেই। অপূর্ব মিত্তির লেনে। শ' চারেক ছেলে-মেয়ে পড়ে।

—বাপরে। এত ছেলে-মেয়ে ?

—জায়গা দিতে পারলে আরও হত। গাইড মানেই, মাধ্যমিক আর হায়ার সেকেন্ডারিতে ফার্স্ট ডিভিশন। এই ক' বছরেই খুব নাম হয়ে গেছে। আমরা যে সব সাজেশন দিই, পরীক্ষায় হুবহু এসে যায়।

BOIRBOI.NET

—কার মাথায় এল এ সব ?

—মণির। ভাল টিচিং স্টাফ রেখেছি। সাত-আট জন। আমি প্রিন্সিপাল। আরপুলি লেনে আমাদের বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেল। ভাগের টাকা পেলাম, লাখখানেক। ঢেলে দিলাম এই বিজনেসে।

—তাও কিছু একটা করেছিস। শুনে ভাল লাগল। স্কুলের চাকরিটা, করছিস ?

—হ্যাঁ। সেটাও চালিয়ে যাচ্ছি। যা জমানা পড়েছে, বাড়তি একটা কিছু না করলে ভদ্রভাবে বেঁচে থাকা এখন মুশকিল রে। একটা সময় অনেক কষ্ট করেছি। তুই তো দেখেছিস। বলতে নেই, ভাল আছি এখন। মাস গেলে হাজার পঞ্চাশ। রোজগারটা মন্দ নয়, কী বলিস।

যত শুনছি, অবাক হচ্ছি। মাস গেলে আমি হাতে পাই হাজার ছয়েক টাকা। অথচ শিলাজিৎ...। মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না। টাকা মানুষকে বদলে দেয়। অনেক আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। শিলাজিৎকে দেখে তাই মনে হচ্ছে। ওর মুখে যেন খই ফুটছে। চুপ করে আছি দেখে ও বলল, "তুই আসায় ভাল হয়েছে রে অয়ন। একটা ঝামেলায় পড়েছি। তোকে উদ্ধার করতে হবে।"

—তোর আবার কী ঝামেলা ?

—আর বলিস না। যে বাড়িতে আমার টিউটোরিয়াল হোম, বাড়িওয়ালা অশান্তি করছে। বাড়িটা ভাড়া করেছিলাম, মাস্থলি পাঁচ হাজারে। লোকটা তখন যেচে দিয়েছিল। এখন দেখছে, হোমটা দাঁড় করিয়ে ফেলেছি। এখন ভাড়া বাড়াতে চাইছে। লাফিয়ে একেবারে দশ হাজার। রোজ রোজ লোক পাঠিয়ে হুমকি দিচ্ছে।

—বাড়িওয়ালাটা থাকে কোথায় ?

—মুদিয়ালিতে। বলছে, ছেলের বিয়ে দেবে। একটা ফ্লোর ছাড়তে হবে।

—লোকটার ব্যাকগ্রাউন্ড কী ?

—ব্যাকগ্রাউন্ড মানে ?

—মানে, পার্টি করে ?

—ডাইরেক্ট করে না। তবে জানাশুনো, নেতাদের। তাই তড়পাচ্ছে। যাক গে, এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অনুপ ভদ্রকে তুই চিনিস ?

—খুব ভাল করে চিনি।

—ওকে একটু বলে দিবি ভাই। ধরব ওকে ফোনে ?

—ধর।

BOIRBOI.NET

পকেট থেকে টেলিফোন ডিরেক্টরি বের করে, নম্বরটা দেখে নিয়ে শিলাজিৎ ফোন করল অনুপ ভদ্রকে। তারপর বলল, "ধর, রিঙ হচ্ছে।"

শিলাজিতের ব্যস্ততা দেখে একটু অবাকই হলাম। ও প্রান্তে অনুপের গলা। বললাম, "অয়নদা বলছি।"

—বলুন দাদা। কোত্থেকে ?

—তোমার ওয়ার্ডেই। অপূর্ব মিত্তির লেনে এক বন্ধুর বাড়ি থেকে। ফোর বাই ওয়ান। একটা দরকার আছে। এখুনি একবার আসবে ?

—সিওর। দাদা, আপনাকেও আমার দরকার। মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যে আসছি।

শিলাজিৎ বলল, "সত্যি তোদের ক্ষমতা আছে মাইরি। এই অনুপ লোকটাকে গত তিন দিন ধরার চেষ্টা করছি। দেখাই করেনি।"

এই ধরনের কথা অনেকের মুখে শুনি। এক কান দিয়ে শুনি, অন্য কান দিয়ে বের করে দিই। এই অনুপের একটা উপকার একবার করে দিয়েছিলাম। প্রতি বছর বাইশে আগস্ট পাড়ায় ও একটা ফাংশান করে। গত বছর মান্না দে-কে আনতে চেয়েছিল। সরাসরি মান্নাদার কাছে গিয়ে বোধহয় সুবিধে করতে পারেনি। কে যেন ওকে বলেছিল, মান্নাদার সঙ্গে আমার একটা আলাদা সম্পর্ক আছে। সেটা জেনে ও আমাকে খুব ধরে। মান্নাদাকে আমি রাজি করিয়েছিলাম। এখন আমি যদি অনুপকে কোনও অনুরোধ করি, তা হলে ফেলতে পারবে না।

পর্দা ঠেলে ঢুকল কৃষ্ণা। বলল, "চলুন, ভেতরে। খাবার রেডি।"

শিলাজিতের সঙ্গে এসে বসলাম ডাইনিং টেবলে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল আমাদের বাড়ির ডাইনিং টেবলের কথা। আমি উঠে পড়ার পর, কী হল, আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম। পরমা কি বুঝতে পারেনি, কার জন্য উঠে পড়েছিলাম ? নিশ্চয়ই পেরেছে। ও অবশ্য হার মানার মেয়ে নয়। আট বছর ওকে গভীরভাবে দেখেছি। আমি জানি, আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও, ও খেতে খেতে বাকিটা সময় হাসিমুখে গল্পগুজব করে গেছে। পরমা একটা আশ্চর্য মেয়ে। বরং বড়বৌদিই আঘাত পেয়েছে বেশি। হয়তো একটা কথাও বলতে পারেনি।

টেবলে লুচি, মাংস আর মিষ্টি। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। খাবার দেখে খিদেটা চাগাড় দিয়ে উঠল। প্লেটে মাংস তুলে নিতে নিতে শিলাজিৎ বলল, "মণি, কাউন্সিলার বদমাইশটা এখুনি আসবে। স্ট্রেট এখানে নিয়ে এসো।"

শিলাজিতের মুখে বদমাইশ কথাটা শুনে একটু চমকে উঠলাম। সত্যিই, ও বদলে গেছে। ওর মুখে কোনও দিন একটা খারাপ কথা শুনিনি। হয়তো জীবনের অভিজ্ঞতাই ওকে এ সব কথা শিখিয়েছে। টুকটাক কথাবার্তার মাঝেই এসে পড়ল অনুপ। শিলাজিৎকে দেখেই বলল, "দাদা, আপনি ? অয়নদা আপনার কেউ হয় নাকি ? আগে বলেননি কেন ?"

শিলাজিৎ সোজাসুজি বলল, "গাইডের প্রবলেমটা তুমি মিটিয়ে দাও অনুপ।"

অনুপ সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, "কোনও চিন্তা করবেন না দাদা। আপনার কেসটা আমি জানি। শালা, বাড়িওয়ালা লোকটা একটু টেটিয়া টাইপের। ওকে টাইট করে দিচ্ছি।"

ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "ঝামেলার দরকার নেই। তুমি মাঝখানে থেকে মিউচুয়াল করে দাও।"

—না অয়নদা। শিলাজিৎদা শিক্ষক। সমাজে খুব সম্মানি লোক। আমরা পাশে না দাঁড়ালে, এঁরা যাবেন কোথায় ?

অনুপের স-এর দোষ ভীষণ। শুনে কৃষ্ণা ফিকফিক করে হাসতে শুরু করল। তা দেখেও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই অনুপের। বলে উঠল, "শিলাজিৎদা, আপনি ঠিক কী চান, বলুন তো ? ভাড়া কি সামান্য বাড়াতে পারবেন ? না পারলেও কোনও ক্ষতি নেই।"

শিলাজিৎ বলল, "সেটা তো পরিষ্কার করে বলতেও পারে লোকটা। তা না করে,

BOIRBOI.NET

স্টুডেন্টদের প্যানিক করছে।"

হাত জোড় করল অনুপ, "আর হবে না দাদা। অয়নদা আমাদের গার্জেনের মতো। বলে দিয়েছে একবার। দেখুন না সিচুয়েশন ইমপ্রুভ করে কি না।"

এই সময় কৃষ্ণা বলল, "অনুপবাবু, আপনাকে কি শ্মশানের পাশে পার্টি আপিসে সকালের দিকে পাওয়া যাবে?" স-গুলো ও উচ্চারণ করল অনুপের মতো। ডেঞ্জারাস মেয়ে!

ব্যঙ্গ বুঝতে না পেরে অনুপ বলল, "কেন, কোনও দরকার আছে বৌদি?"

খিলখিল করে হেসে উঠল মণিকা কথাটা শুনে, "বৌদি ও নয়, আমি।"

—সরিবৌদি। শিলাজিৎদার সঙ্গে মাঝেমধ্যে এনাকে দেখি। তাই বলে ফেললাম।

বলেই অনুপ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ওর পকেটে সেলুলার ফোন বাজছে। কানে লাগিয়ে, কার সঙ্গে যেন ও কথা বলতে শুরু করল। বোরো কমিটিতে কী ঝামেলা হয়েছে। সে সব নিয়ে কথা। অনুপ মাঝে মধ্যে রেগে উঠছে। ভুলে গেছে কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। কথা শেষ করে ও বলল, "অয়নদা, বোরো কমিটির চেয়ারম্যানটাকে ধরে একটু রগড়ান তো। শালা, চুরি করে ফাঁক করে দিচ্ছে।"

—কে তোমাদের চেয়ারম্যান?

—আবার কে, সুষ্যি গাঙ্গুলি। এত করাপ্টবাজ লোক, কর্পোরেশনে একটাও নেই। শালা, পেয়ারের কাউন্সিলারদের টাকা দিচ্ছে। আর আমরা আঙুল চুষছি। আমার ওয়ার্ডে কোনও কাজই করাতে পারছি না।

—কাগজপত্র কিছু আছে?

—আছে। আপনাদের দীপেনদাকে একবার বললাম, লিখুন। বলল, লিখবে। তারপর একদিন দেখলাম, সুষ্যি আর দীপেনদা একসঙ্গে লিডো রেস্টুরেন্ট থেকে বেরোচ্ছে। হাসতে হাসতে। বুঝলাম, কোনও ডিল হয়ে গেছে। পরে শুনলাম, দীপেনদা গড়িয়াহাট সুপার মার্কেটে একটা দোকানঘর চেয়েছিল। পাবলিশিং কোম্পানি খুলছে। সুষ্যি সেটা করে দিয়েছে।

—কী বলছ তুমি, দীপেন দোকানঘর নিয়েছে?

—নিজের নামে নয় দাদা। বউয়ের নামে নিয়েছে। শিউলি সরকার। যাই বলুন আপনি, খুব করাপ্টবাজ রিপোর্টার।

দীপেন সম্পর্কে কথা আর বাড়তে দিলাম না। শিলাজিৎরা সব শুনছে। হয়তো সব রিপোর্টার সম্পর্কে এক ধারণা করে বসবে। অনুপকে কাটাবার জন্যই বললাম, "ঠিক আছে, কাল সকালে বাড়িতে একবার ফোন কোরো। টাইম ঠিক করে নেব। কাগজপত্র নিয়ে না হয় বসা যাবে। আমার প্রুফ দরকার।"

কথাটা বলেই মনে হল, না বললেও পারতাম। আমি দৈনিক প্রভাতে আর না গেলে, দু'-এক দিনের মধ্যে তা রটে যাবে। অনুপদের মতো লোকেদের কানে তা দ্রুত পৌঁছে যাবে। রাজনীতির লোকেরা সব খবর রাখে কাগজের। রিপোর্টারদের উত্থান-পতন, সব ওদের নখদর্পণে। লোকের সঙ্গে সম্পর্কও রাখে ওরা সেভাবে। এই অনুপই হয়তো আমাকে শিলাজিতের মতো তিন দিন ঘোরাবে যদি কাগজের চাকরি ছেড়ে দিই।

BOIRBOI.NET

ঘাড় নেড়ে অনুপ চলে গেল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কৃষ্ণা বলল, "জিৎদা, ভাবতেও লজ্জা লাগে, এই লোকগুলো আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ। একটা কথা পর্যন্ত ভালভাবে বলতে পারে না।"

খেতে খেতে আমি প্রতিবাদ করলাম, "বাইরে থেকে দেখে ওকে ভুল বুঝো না। ছেলেটা কিন্তু খুব কাজের।"

শুনে শিলাজিৎ বলল, "হ্যাঁ রে। আমার কাজটা করবে তো?"

—করবে। তুই নিশ্চিন্ত থাক।

ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা ফের ড্রয়িংরুমে এসে বসলাম। কৃষ্ণা চলে যাচ্ছিল। যাওয়ার সময় একবার মনে করিয়ে দিল, "অয়নদা, হোস্টেলের ব্যাপারটা...একটু মনে রাখবেন।"

ঘাড় নাড়লাম। তারপর একটু মজা করার জন্যই বললাম, "আপনি নিসচিন্তে থাকুন,বৌদি।" স-টা উচ্চারণ করলাম অনুপের মতো। খিলখিল করে হেসে উঠল কৃষ্ণা। ওর হাসি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মনে হল, একটা ঝর্নার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। জলতরঙ্গের শব্দ শুনছি। হঠাৎ, হঠাৎই কৃষ্ণাকে ভাল লেগে গেল।

ড্রয়িংরুমে একটা সময় শিলাজিৎ আর আমি বসে কথা বলতে লাগলাম। টুকটাক সব কথাবার্তা। ওর বিয়ের আট বছর হয়ে গেল। অথচ কেন এখনও সন্তান হল না, জিজ্ঞেস করায় শিলাজিৎ একটু মিইয়ে গেল। তারপর চাপা গলায় বলল, "আমারই দুর্বুদ্ধিতে বুঝলি। বিয়ের পরপর আমার কী অবস্থা ছিল, তা তো জানিস। তখন আমরা ঠিক করেছিলাম, ফ্যামিলি বাড়াব না। তা সত্ত্বেও, বছর পাঁচেক আগে মণি কনসিভ করে যায়। অ্যাবরশন করে ফেলি। সেটাই কাল হয়ে দাঁড়াল। কী একটা কমপ্লিকেশন হল, তখন বুঝিনি। এখন সন্তান চাইছি। ডাক্তার বলছে, সম্ভব না। মণি খুব কষ্টে আছে। ওকে দেখে অবশ্য বুঝবি না। এই যে তুই এসেছিস, ওর সময়টা ভাল কাটল।"

শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিছু বলতে হয়, তাই বললাম, "টেস্টটিউব বেবিও তো আজকাল হচ্ছে। মণির কেসটা কি আরও ভাল ডাক্তার দিয়ে করানো যায় না?"

—চেষ্টা করেছি। গত দেড় বছর কলকাতার সব বড় গাইনির কাছে যাওয়া হয়ে গেছে আমাদের। কেউ হোপফুল কিছু বলেনি। ইটস মেয়ার ব্যাড লাক। যাক গে, তোর কথা বল। কবে বিয়ে করছিস?

—এখনও কিছু ভাবিনি।

—পরমা কাকে বিয়ে করছে রে?

প্রশ্নটা শোনামাত্র একটু শক্ত হয়ে গেলাম, "পরমা বিয়ে করছে? মানে?"

—তুই জানিস না? আশ্চর্য। এই দিন সাতেক আগে মণিকে নিয়ে পি সি চন্দ্রে গেছিলাম অর্নামেন্টস কিনতে। হঠাৎ পরমার বাবার সঙ্গে দেখা। বললেন, পরমার বিয়ে। গয়নার অর্ডার দিতে এসেছেন। ছেলে জার্মানিতে থাকে। তখনই তোর কথা মনে পড়ল। আমি আর মণি এক সময় বলাবলি করতাম, তোরা দু'জন মেড ফর ইচ আদার। কী হল রে তোদের মধ্যে?

শিলাজিৎ আরও যেন কী সব বলে যাচ্ছিল। আমার মাথায় কিছু ঢুকল না। শুধু একটা কথাই কানে বাজতে লাগল, পরমার বিয়ে। হঠাৎ খুব কষ্ট হচ্ছে আমার। এই

BOIRBOI.NET

কয়েক ঘণ্টা আগে, ওকে বাড়িতে দেখে এসেছি। তবে কি বিয়ের আগে, শেষ বারের মতো দিদির বাড়িতে বেড়িয়ে যেতে এসেছে পরমা ? ওকে খুব উচ্ছল দেখাচ্ছিল। নিশ্চয়ই এ বিয়েতে ও খুশি। তা হলে কেন এতটা বছর ও আমার সঙ্গে তঞ্চকতা করল ? কথাটা ভাবতেই চিনচিনে রাগ হতে শুরু করল। না, ওকে ক্ষমা করা যায় না।

সোফা ছেড়ে হঠাৎ উঠে পড়লাম। শিলাজিৎকে কিছু বুঝতে না দিয়ে, খুব স্বাভাবিকগলায় বললাম, "এই রে, একদম ভুলে গেছি। এখুনি একবার অফিসে যাওয়া দরকার। চলি রে। পরে আবার দেখা হবে।"

বাইরে বেশ রোদ্দুর। বাইকে কিক মারতেই, চোখের কোণ ঝাপসা হয়ে উঠল। মাথাটা এখন শূন্য। বুঝে উঠতে পারলাম না, কী করব, কোথায় যাব। হঠাৎই মনে হল, আমি শেষ হয়ে গেলাম। সাংবাদিক হিসাবে রোজ আমি হারছিলাম। তাতেও আমার কোনও যন্ত্রণা হচ্ছিল না। কিন্তু পরমার কাছে হারতে হল শেষ পর্যন্ত ! জীবনে আর রইলটা কী ? বিয়ে করতে রাজি হল পরমা, এই কথাটাই সব থেকে বেশি কষ্ট দিতে লাগল আমাকে। কালীঘাটের মন্দিরে দাঁড়িয়ে, আমাকে একবার কী বলেছিল, ও সেটা ভুলে গেল কী করে ?

॥ পাঁচ ॥

সকালে ব্যাগ গোছাচ্ছিলাম। এমন সময় এল সুজয়। বললাম, "কী ব্যাপার রে তোর ? মাসখানেক কোনও পাত্তা নেই।"

—বস, ব্যস্ত ছিলাম। পেটের ধান্ধায়।

—সে তো বুঝতেই পারছি। ধান্ধাটা কী, জানতে পারি ?

—আর একটা স্টুডিও ওপেন করছি। শোভাবাজারে। ঠিক পাতাল রেল স্টেশনের সামনে।

—এটা নিয়ে ক'টা হল ?

—মাত্র তিনটে বস।

—তুই তো দেখছি, সারা কলকাতাটাকে একটা সময় কিনে ফেলবি।

—সবই আপনার আশীর্বাদে, বস।

BOIRBOI.NET

মনে মনে হাসলাম। সুজয় ফ্রিল্যান্স ফোটোগ্রাফার। বছর ছয়েক আগে, চেতলায় ওর স্টুডিওতে একবার ছবি তুলতে গেছিলাম। প্রেস কার্ডের জন্য তখন পাশপোর্ট সাইজের একটা ছবি তোলার দরকার ছিল। কথায় কথায় ও জানতে পেরে যায়, আমি দৈনিক প্রভাতের রিপোর্টার। পরদিন নিজে বাড়িতে এসে ছবিটা দিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে মাঝেমধ্যেই আসতে শুরু করে। প্রথমে টুবলুর নানা ছবি তুলে, ল্যামিনেশন করে তা উপহার দিয়ে বড়বৌদির মন জয় করে নেয়। তারপর ধরে বুবুনকে। মাস ছয়েকের মধ্যে বুবুন সুজয়দা বলতে অজ্ঞান। বিনা পয়সায়, হাজার ভঙ্গিতে ছবি তোলার এমন সুযোগ পেলে কোনও মেয়ে ছাড়ে ?

সুজয়ের হাত অবশ্য খুব ভাল। ওর ছবির ডেপথ আছে। নিউজের কিছু ছবিও আমি ওকে দিয়ে করিয়েছি। এক্সক্লুসিভ ছবি। দৈনিক প্রভাতে প্রথম ওকে আমিই

নিয়ে যাই। কুণালদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। সুজয় এমন খলিফা ছেলে, কুণালদাকেও পটিয়ে ফেলেছে। আমাদের কাগজের চিফ ফোটোগ্রাফার শ্যামল চন্দ। তার সঙ্গে সুজয়ের এখন আদায়-কাঁচকলায়। একবার কুণালদা সুজয়ের ছবি ফ্রন্ট পেজে ছাপান, শ্যামলের ছবি বাদ দিয়ে। শ্যামল চটে গিয়ে নালিশ করেছিল নিউজ এডিটর কল্যাণদার কাছে। কোনও লাভ হয়নি। কল্যাণদা নাকি বলেছিল, "যার ছবি ভাল হবে, তারটাই ছাপা হবে।"

আমাকে কিট ব্যাগ গোছাতে দেখে সুজয় জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাচ্ছেন, বস ? দূরে কোথাও ? কাল একবার কুণালদার বাড়ি গেছিলাম। শুনলাম, দিন চারেক অফিস যাচ্ছেন না।"

—কুণালদা আর কী বলছিল ?

—সেই এক কথা। অয়ন ছেলেটা মন দিয়ে কাজ করছে না। তোমরা একটু ওকে বোঝাও।

—আর, তুই আমাকে বোঝাতে এসেছিস।

দু' কানে হাত দিয়ে, জিভ কেটে সুজয় বলল, "ভুল বুঝবেন না বস।"

—ওই বাস্টার্ডটা, চার দিন আগে ফোন করে বলল, আমার স্টোরিটা নাকি দুর্দান্ত হয়েছে। আবার তোকে উল্টো কথা বলছে ?"

আমার গলায় ঝাঁঝ দেখে অবাক হল সুজয়। আমাকে ও কখনও রাগতে দেখেনি। বাস্টার্ড বলে কাউকে কখনও গালাগাল দিতেও শোনেনি। শুকনো গলায় ও বলল, "কী হল, বস। এত রাগের ?"

—না, কিচ্ছু হয়নি। আমার একটু তাড়া আছে। কিছু বলার থাকলে, বল।

—কিছু বলার নেই। বুবুন কয়েকটা ছবি চেয়েছিল। রীতার জন্মদিনের পার্টির। সেদিন আমি ছবি তুলেছিলাম।

—ও। তুই তো বেশ ভালই চালিয়ে যাচ্ছিস। এ দিকে, দৈনিক প্রভাত মাঝেমধ্যে ছবি দিয়ে পাবলিসিটি নিচ্ছিস। আর সেটা ভাঙিয়ে,...সে যাক।

কথাটা শুনে হাঁ করে তাকিয়ে রইল সুজয়। আমার ব্যাগ গোছানো হয়ে গেছিল। তুলে নিয়ে পা বাড়ালাম। দিন চারেক ধরে, আমার সবার উপর রাগ। কেন হচ্ছে, তা অবশ্য জানি না। সাংবাদিকতা করতে গিয়ে, এই ক'বছর আমাকে অনেক মূল্য দিতে হল। জীবনে অনেকটাই পিছিয়ে পড়লাম। এই যে সুজয়, একটু আগে আমাকে বস, বস করছিল, এই ছেলেটাও চোখের সামনে এগিয়ে গেল। চেতলায় ওর একটা স্টুডিও ছিল। এমন কিছু বলার মতো না। কাগজে ওর ছবি ছাপা শুরু হতেই, সুজয় একটা প্ল্যাটফর্ম পেয়ে গেল। সেই সঙ্গে পরিচিতিও। এমনি ফোটোগ্রাফার আর প্রেস ফোটোগ্রাফারের মধ্যে পার্থক্য অনেক। সেই পার্থক্যটা চট করে বুঝে নিল সুজয়। ব্যস, লাফ দিয়ে দিয়ে এখন এগোচ্ছে।

ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে এক বছরের মধ্যেই আর একটা স্টুডিও খুলল সুজয় বর্ধমান রোডে। ওই অঞ্চলটায় অবাঙালি ব্যবসায়ীদের বাস। তাদের সঙ্গে দহরম-মহরম করে ফেলল অল্পদিনের মধ্যে। ছবি তোলা ছাড়াও ও ল্যামিনেশন করার যন্ত্রপাতি আনিয়েছে। ভিডিও করার ইউনিট খুলেছে। ওর কাছে এখন কুড়ি-বাইশ জন কাজ করে। আগে একটা স্কুটার নিয়ে ঘুরে বেড়াত। এখন চাপে টাটা সুমোয়। তবে

আমাকে খুব সম্মান করে। সবাইকেই নাকি বলে, অয়নদা আমার এক নম্বর বস। বললে, ওনার জুতোও মাথায় নিতে পারি।

দোতলা থেকে নামার সময় দেখা মেজবৌদির সঙ্গে। আমার হাতে ব্যাগ দেখে অবাক হয়ে বলল, "কোথায় চললে ছোড়দা ? দিদি জানে ?"

—না। বলা হয়নি। সুন্দরবনে যাচ্ছি। ফ্রেঞ্চ টিভি-র কাজ করতে।

—ফিরবে কবে ?

—ঠিক নেই।

পিছন পিছন নেমে আসছিল সুজয়। সেটা দেখে তাড়াতাড়ি পা চালালাম। নিশ্চয়ই ওর টাটা সুমো বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে লিফট দিতে চাইবে। বহু দিন দিয়েছে। নিজের কাজ ফেলেও, আমার কাজ ও করে দিয়েছে। আজ ওর গাড়িতে চড়ব না। ও নয়, ঠিক করেছি, কোনওদিন আর কারও সাহায্য নেব না।

পিছন থেকে মেজবৌদি বলল, "ছোড়দা, খেয়ে গেলে না।"

আমি একটু ব্যস্তভাবেই বললাম, "বাইরে কোথাও খেয়ে নেব।"

বেলা বারোটার মধ্যে আমাকে তাজ বেঙ্গলে পৌঁছতে হবে। ওখান থেকেই রওনা হব। আমি আর সবিতা। কাল রাতে হঠাৎ নিরঞ্জনদা ফোন করলেন। এ কথা সে কথার পর বললেন, "অয়ন, তোমাকে দিনকয়েক আগে ফ্রেঞ্চ টিভি-র কথা বলেছিলাম, মনে পড়ছে ?"

—হ্যাঁ, ওরা কি এসেছেন ?

—না। প্ল্যান একটু বদলেছে। দিল্লিতে ওদের যে রিপ্রেজেনটেটিভ আছে, আগে সে কলকাতায় এসে সুন্দরবনে যাবে। মিট করবে জলদস্যুদের সঙ্গে। তারপর সিডিউল তৈরি করে পাঠিয়ে দেবে প্যারিসে। তখন ওরা টিম পাঠাবে।

—দিল্লির লোকটা আসবে কবে ?

—লোক নয়, একটা মেয়ে। নাম সবিতা মেমন। অ্যাকচুয়ালি বাঙালি মেয়ে। বিয়ে করেছে আয়াজ মেমন বলে রয়টারের এক রিপোর্টারকে। মেয়েটা আজ রাতেই দিল্লি থেকে প্লেনে আসছে। উঠবে তাজ হোটেলে। কাল সকালে ফোনে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। ওর সঙ্গে বেলা দশটা-সাড়ে দশটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ো। ওর কী প্রোগ্রাম, তা অবশ্য আমি জানি না। ওর সঙ্গে কথা বলে নিয়ো।

আজ সকালে সবিতা ফোন করেছিল। কথা হয়ে গেছে। বেলা বারোটা নাগাদ আমাদের বেরিয়ে পড়ার কথা। ঘণ্টা দেড়েক লাগবে জয়নগর, যদি অ্যাম্বাসাডরে যাই। সেখান থেকে নদীপথে কুলতলি থানা। ও সি সমীর গড়গড়ি আমার চেনা। তাঁকে অনুরোধ করে পুলিশ লঞ্চ নিতে হবে। প্রথম দিন থাকব ঝড়খালি। যদি পুলিশের লঞ্চটা পাওয়া যায়, তা হলে বিকেল চারটের মধ্যে ঝড়খালি বাজারে পৌঁছে যাওয়ার কথা। ওখান থেকে কাটা জঙ্গল পেরিয়ে মিনি'জ মেরিন নামে একটা ভেড়িতে গেলে, দেখা হতে পারে জগু সর্দারের সঙ্গে। ভেড়ির কাছেই তার বাড়ি। কাটা জঙ্গল থেকে সাত-আট কিলোমিটার পথ আমাদের হাঁটতে হবে। খুবই বিপদসঙ্কুল সেই পথ। সাপ-খোপের ভয় তো আছেই। ভাগ্য খারাপ থাকলে বাঘের দেখাও মিলতে পারে। আগের বার আমরা যে দিন হেঁটে গেছিলাম, তার আগের দিন নাকি পীরখালি এলাকা থেকে এক বাঘিনী, ওই কাটা জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে হেঁটে

গেছিল।

মাস তিনেক আগে, অনেক কষ্টে খুঁজে বের করেছিলাম জগু সর্দারকে। দাগী জলদস্যু। সুন্দরবন অঞ্চলে সবাই এর ভয়ে কাঁপে। সাতটা থানার পুলিশ একে খুঁজে বেড়াচ্ছে। অথচ ধরতে পারেনি। জগু সর্দারের বিরাট দল। মৎস্যজীবীরা যখন সমুদ্র থেকে ট্রলার ভর্তি মাছ নিয়ে ফেরে, তখন অতর্কিতে দলবল নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এই জগু সর্দার। তাদের কোনও নির্জন দ্বীপে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে। মুক্তিপণ আদায় করে মহাজন অথবা ট্রলারের মালিকের কাছ থেকে। মৎস্যজীবীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে জগু সর্দারের অত্যাচারে। জলদস্যুদের হাতে প্রাণ দিয়েছে অনেক মৎস্যজীবী। পুলিশ কিছুই করতে পারছে না। জগু সর্দার একটা রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে রয়েছে। পুলিশ খোঁজাখুঁজি করতে গেলে তারাই সরিয়ে দেয় অন্য জায়গায়। আমি জগু সর্দারের ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য সাহায্য নিয়েছিলাম ওই পার্টির এক মন্ত্রীর। তিনিই সঙ্গে এক জন লোক দেন। না হলে কিছুতেই জগু সর্দারের গোপন আস্তানায় পৌঁছতে পারতাম না।

খুব সাড়া ফেলে দিয়েছিল জলদস্যুদের নিয়ে সেই লেখাটা। সবাই খুব প্রশংসা করেছিল। একমাত্র বড়বৌদি ছাড়া। এত ঝুঁকি নিয়ে জল-ডাকাতদের সম্পর্কে লিখতে যাওয়ার জন্য বড়বৌদি খুব বকাবকি করেছিল আমাকে। এ বার তাই বাড়িতে কাউকে কিছু জানাইনি।

সেদিন ডাইনিং টেবল থেকে হঠাৎ উঠে বেরিয়ে যাওয়ার পর বড়বৌদিকে আমি, সত্যি বলতে কী, একটু এড়িয়েই যাচ্ছি। পরমার বিয়ের খবরটা আমাকে সুস্থির থাকতে দেয়নি। খানিকটা অভিমানও হয়েছে বড়বৌদির উপর। পরমার বিয়ে, বড়বৌদি নিশ্চয়ই জানে। তবু কেন আমাকে বলল না ? পরমার বাবা-মা বড়বৌদির পরামর্শ ছাড়া পরমা সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তই নেবেন না। এটা আমি ভাল করে জানি। তবে কী বড়বৌদিও চায়নি, আদরের বোনটা আমার মতো অপদার্থ এক রিপোর্টারের হাতে পড়ুক ? এই সব ভাবনার মধ্যে দিনকয়েক ছটফট করছি। কলকাতা থেকে পালিয়ে যেতে চাইছিলাম। সেই সুযোগটা করে দিলেন নিরঞ্জনদা।

হিন্দুস্তান সুইটসের দিকে হাঁটছি। ওখানে ট্যাক্সি পাওয়া যায়। সুজয় এখনও আমাদের বাড়ি থেকে বেরোয়নি। নিশ্চয়ই বৌদিরা ওকে পাকড়াও করেছে। খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করছে, হঠাৎ আমার কী হল ? করুক, আমার তাতে কিৎস্যু আসে-যায় না। আগের অয়ন ব্যানার্জি শেষ হয়ে গেছে। ফিনিশ। এ বার নতুন অয়ন ব্যানার্জিকে সবাই দেখবে।

রাস্তার মোড়ে তিনটে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। একটাতে উঠে পড়লাম। পাশ দিয়ে একটা মেয়ে হেঁটে গেল। কোথায় যেন দেখেছি। চট করে মনে পড়ে গেল। শ্রীময়ী। মেজবৌদিদের পাড়ার এই মেয়েটা ক'দিন আগেই আমার কাছে একবার এসেছিল। প্রসটিটিউটদের নিয়ে রিসার্চ করছে। মনের অবস্থা আগের মতো থাকলে, মেয়েটাকে ডেকে নিতাম। বাড়িতে আমাকে না পেয়ে, ফিরে যাবে। যাক, কী আর করা যাবে।

—কোথায় যাব স্যার ?

—চিড়িয়াখানা।

সিটের পিছন দিকে মাথাটা হেলিয়ে দিলাম। চোখ বুজতেই পরমার মুখটা ভেসে উঠল। ওকে আমি প্রথম দেখি, বড়দার বিয়ের দিনে। সোমনাথ হলে ভিড়ের মাঝে হারিয়ে, এক কোণে দাঁড়িয়েছিলাম আমি আর জ্যোতি। বৌদিদের বাড়ির কাউকেই চিনি না। বরযাত্রীদের আদর-আপ্যায়ন করছিলেন মাঝবয়েসী এক মহিলা। বৌদির কে হন, তখন জানি না। দেখলাম, সেই মহিলা কিন্তু আমাকে চেনেন। হঠাৎ পনেরো-ষোলো বছরের একটা মেয়েকে টানতে টানতে এনে, ওই মহিলাই আলাপ করিয়ে দিলেন, "অয়ন, এ আমার মেয়ে পরমা। এ বার মাধ্যমিক দেবে। তুমি একটু উৎসাহ দাও তো বাবা। যেন তোমার মতো নম্বর পায়।"

উজ্জ্বল লাল রঙের একটা কাঞ্জিভরম শাড়ি পরে ছিল পরমা। ওর দিকে একবার তাকিয়েই আমি মুখটা নামিয়ে নিয়েছিলাম। সুন্দরী মেয়েদের সামনে আমি স্বচ্ছন্দ হতে পারতাম না। পরমা তখনই অসম্ভব সুন্দরী। একটা চেয়ার টেনে সামনে বসে পরমা বলেছিল, "মাধ্যমিকে তুমি কত পেয়েছিলে অয়নদা ?"

শুরুতেই তুমি ! একটু অবাক হলেও বলেছিলাম, "বেশি না। সাতশো চুরাশি।"

—বাপরে ! সাত জন্ম চেষ্টা করলেও আমি এত নম্বর পাব না।

পাশেই দাঁড়িয়ে জ্যোতি। ও উৎসাহ নিয়ে বলেছিল, "কোন স্কুলে পড়ো তুমি ?"

—কারমেল। দেখুন না, সাত দিন পরেই পরীক্ষা। অথচ একটা দিন নষ্ট হয়ে গেল। আসতে চাইছিলাম না। তবু মা জোর করে নিয়ে এল। বলল, বড়দির বিয়ে। যাবি না, তা হয়।

জ্যোতি একটু ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছিল, "ভালই হল। তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল।"

—মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে আপনার ভাল লাগে বুঝি ?

—কোন ছেলের না লাগে ?

—আপনার বন্ধুকে দেখে তো মনে হচ্ছে না।

কথাটা শুনে আমি একটু গুটিয়ে গেছিলাম। আচ্ছা পাকা মেয়ে তো। চোখে-মুখে কথা বলে। জ্যোতি দমবার পাত্র নয়। বলেছিল, "আমার বন্ধু কিন্তু খুব স্মার্ট। দেখে বোঝা যায় না।"

পরমা চেয়ার ছেড়ে উঠে এক পা এগিয়ে এসেছিল। তারপর আচমকা আমার থুতনিতে হাত দিয়ে বলেছিল, "কেমন স্মার্ট তুমি দেখি অয়নদা। আমার চোখে চোখ রাখো।"

BOIRBOI.NET

সদ্য পরিচিত একটা মেয়ে, এমন ব্যবহার করতে পারে, আমার ধারণাই ছিল না। ওর কাঁধ আমার বুকের কাছাকাছি। মুখে এলাচের গন্ধ। শরীর থেকেও সুগন্ধি আসছে। ওর চোখে চোখ রাখতেই, হঠাৎ কাছাকাছি একবার ক্যামেরার ফ্ল্যাশ বাল্ব জ্বলে উঠল। বিয়েবাড়ির ছবি তুলছিলেন এক ফোটোগ্রাফার। শাটারটা তিনিই টিপে দিয়েছিলেন।

আমাকে হেনস্তা হতে দেখে জ্যোতি মজা পেয়েছিল। তারপর বলেছিল, "না, মানতেই হবে পরমা, তুমি বেশি স্মার্ট।"

মুক্তোর মতো দাঁতগুলো ঝলসে উঠেছিল ওর, "অতঃপর, দয়া করে আর আমার পিছনে লাগবেন না। কারমেল-এর মেয়েরা কখনও কোনও কিছুতে পিছিয়ে যায়

না।" আঁচল সামলে, হাসতে হাসতে, রাজেন্দ্রানীর মতো চলে গেছিল পরমা।

জ্যোতির মুখ হঠাৎ খুব গম্ভীর। আমার দিকে ফিরে ও বলেছিল, "জেভিয়ার্সে পড়িস, কাউকে বলিস না। একটা পুঁচকে মেয়ের সঙ্গে পারলি না।" শুনে বিয়েবাড়ির আনন্দটাই মাটি হয়ে গেছিল সেদিন পরমুহূর্ত থেকে। রাতে আমাদের থাকার কথা ছিল সোমনাথ হলে। আর থাকতে ইচ্ছে করেনি। খেতে বসার সময়, অনেক খুঁজেছিলাম পরমাকে। আর দেখতে পাইনি। অন্য বরযাত্রীদের সঙ্গে বাসে ওঠার সময়, কোত্থেকে যেন উদয় হয়েছিলেন পরমার মা। আমার গাল ছুঁয়ে খুব আন্তরিকভাবে অনুরোধ করেছিলেন, "অয়ন, একদিন এসো আমাদের লেক গার্ডেন্সের বাড়িতে। মেয়েটার পরীক্ষা হয়ে যাক, তারপর।"

..."স্যার, চিড়িয়াখানা এসে গেছি।" ড্রাইভারের গলা শুনে ফের বাস্তবে ফিরে এলাম। হাতঘড়িতে বারোটা বাজতে দশ। সবিতা লাউঞ্জে অপেক্ষা করবে আমার জন্য। ভাড়া মিটিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এলাম ট্যাক্সি থেকে। উল্টোদিকেই হোটেল।

সবিতা মেমন প্রায় আমারই সমবয়সী। পরনে লাল অ্যাডিডাস টি শার্ট আর ফেড জিনস। মুখটা সামান্য ফোলা। বোধহয় একটু আগেই ঘুম থেকে উঠেছে। ওর হাতে একটা সানগ্লাস। কাঁধে কিটব্যাগ। লাউঞ্জে আমাকে এ দিক-সে দিক তাকাতে দেখে নিজেই এগিয়ে এসে বলল, "অয়ন, আমি সবিতা।"

ওকে পরিষ্কার বাংলা বলতে দেখে আমি একটু অবাক হয়ে তাকালাম। মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "তুমি এখনও বাঙালি রয়ে গেছ?"

হাসল সবিতা, "অফকোর্স আমি বাঙালি। তবে মানুষ হয়েছি দিল্লিতে। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক। গাড়িতেই বাকি কথা হবে।"

—তুমি কি লাঞ্চ করেছ?

—না, হোটেল থেকে দুটো লাঞ্চ প্যাকেট তুলে নিচ্ছি। আসলে কাল রাতে প্লেনটা এল ঘণ্টাখানেক দেরিতে। তারপর হোটেলের ঘরে ঢুকে একটা হরর ফিল্ম দেখতে বসে গেলাম। রাত তিনটের সময় ঘুমিয়েছি। সকালে তোমার ফোন পাওয়ার পর, ফের ঘণ্টা দুয়েক ঘুমোলাম। উঠে দেখি, এগারোটা বাজে।"

কথা বলতে বলতে দু'জনে লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে এলাম। সবিতাকে প্রথম দর্শনেই মনে হল, খোলামেলা টাইপের মেয়ে। ফ্রেঞ্চ টিভি-তে চাকরি করে। নিশ্চয়ই প্রচুর টাকা মাইনে পায়। জানি না, সাংবাদিকতার পেশায় কতটা অভিজ্ঞ। সুন্দরবন সম্পর্কে ওর কোনও ধারণা আছে কি না। জলদস্যু জগু সর্দারের কাছে পৌঁছবার জন্য রাস্তায় যে ধরনের কষ্ট করতে হবে, সেটা সহ্য করতে পারবে কি না। নিশ্চয়ই পারবে। না হলে একটা বিদেশি টিভি কোম্পানি ওকে পয়সা দিয়ে রাখত না। আজকাল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচুর মেয়ে ঢুকেছে। অনেকেই ঝুঁকি নিয়ে ভাল ভাল প্রোগ্রাম করছে। ভোটের আগে, নলিনী সিংহ বলে একটা মেয়ে তো দুর্দান্ত একটা প্রোগ্রাম করেছিল, ইউ পি-র মাফিয়াদের ইন্টারভিউ নিয়ে।

গাড়িতে উঠে বসলাম, ঠিক সোয়া বারোটায়। টুকটাক প্রশ্ন করতে লাগল সবিতা। একবার বলল, "নিরঞ্জনবাবু, পাইরেটসদের নিয়ে তোমার লেখাগুলোর জেরক্স পাঠিয়েছিলেন আমার কাছে। মোটামুটি একটা আইডিয়া হল। আচ্ছা, জগু সর্দারকে পাওয়া যাবে তো? পাইরেটদের নিয়ে আমরা কিন্তু এক ঘণ্টার একটা

প্রোগ্রাম করব।"

—তা হলে দিন পনেরো থাকতে হবে তোমাদের টিমকে।

—থাকবে। আমরা হেলিকপ্টারও ভাড়া করব, ওপর থেকে শট নেওয়ার জন্য। দুটো ট্রলার নিশ্চয়ই লাগবে। তেমন হলে, জেলেদের সঙ্গে আমাদের টিমটা ফিশিংয়েও যাবে। ট্রলারের ব্যবস্থা কিন্তু তোমাকে করে দিতে হবে।

—দেওয়া যাবে। তবে তার জন্য আমাদের কিন্তু যেতে হবে রায়দিঘি। সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য যে সব ট্রলার বেরোয়, তা ছাড়ে রায়দিঘি থেকে। একটা কাজ করব আমরা। কাল বা পরশু জয়নগরে ফিরে, বাই রোড চলে যাব রায়দিঘি। এই গাড়িটাকে জয়নগরে রেখে দিতে হবে।

—অয়ন, তুমি কত দিন আছ প্রফেশনে ?

—পাঁচ-ছ' বছর। তুমি ?

—সেম। পাঁচ-ছ' বছর। প্রথম তিনটে বছর ছিলাম টাইমস অফ ইন্ডিয়াতে। খবরের কাগজে কাজ করতে ভাল লাগল না। স্বাধীনভাবে কাজ করা যায় না। এদের এখানে ভাল আছি।

—কী করতে হয় তোমাকে ?

এরা হেড কোয়ার্টার থেকে বলে দেয়, কী করতে হবে। মাঝেমধ্যে আমিও সাজেশন দিই।

—যেমন ?

—এই ক'দিন আগে বারমুডার প্রাইম মিনিস্টার ভারতে এসে, মজঃফরপুরে দেখা করতে গেলেন তাঁর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে। দেড়শো বছর আগে, এই ভারত থেকেই বারমুডা গেছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষরা। খুব ইমোশনাল হয়েছিল সেই প্রোগ্রামটা।

—বাঃ, আর কী করেছ ফ্রেঞ্চ টিভি-র জন্য।

—অনেক। একটা প্রাইজ পেয়েছিলাম আন্দামানের ব্যারেন আইল্যান্ডসে গিয়ে আগ্নেয়গিরির প্রোগ্রাম করে। খুব রিস্কি ছিল ব্যাপারটা।

দু'জনে গল্প করতে করতে যাচ্ছি। গাড়ি গড়িয়া ছাড়িয়ে নরেন্দ্রপুরের দিকে এগোচ্ছে। জীবনে কখনও রিপোর্ট করতে বাংলার বাইরে যাইনি। সুযোগই দেয়নি আমাকে আমার কাগজ। অথচ এই মেয়েটা সারা ভারত চষে বেড়াচ্ছে। শুনে বেশ ভাল লাগল। কথায় কথায় হঠাৎ সবিতা বলল, "জানো অয়ন, নিরঞ্জনবাবুর মুখে তোমার কথা শুনে, তোমার সম্পর্কে একটা ধারণা হয়েছিল। সেটা একদম মিলে গেছে।"

—কী ধারণা হয়েছিল।

—হ্যান্ডসাম, ভেরি মাসকিউলার, বাট পারফেক্ট জেন্টেলম্যান।

শুনে হেসে উঠলাম। কয়েক দিন আগে ঠিক এই কথাটাই কে যেন আমাকে বলেছিল। দু'-তিন সেকেন্ড পরই মনে পড়ল, কৃষ্ণা। শিলাজিতের বাড়িতে আলাপ হওয়া সেই মেয়েটা। সবিতাকে বললাম, "তোমার সম্পর্কেও আমার একটা ধারণা হয়েছিল, সকালে ফোনে কথা বলার পর।"

—কী সেটা ?

—কালচার্ড, ভেরি কনফিডেন্ট, বিউটিফুল লুকিং, বাট...ভেরি ভেরি ভলাপচুয়াস।

BOIRBOI.NET

ভাবলাম, সবিতা লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "থ্যাঙ্কস ফর দ্য কমপ্লিমেন্টস।"

—দিল্লিতে তুমি কোথায় থাকো সবিতা ?

—পঞ্চশীল মার্গে।

—শুনেছি, সেটা খুব পশ এলাকা।

—হ্যাঁ। বাবা আমাকে ফ্ল্যাটটা দিয়েছেন।

—কলকাতায় আগে কখনও এসেছ ?

—মাত্র একবার। বহুদিন আগে। এই শহরটার সম্পর্কে নানা বদনাম শুনি। কিন্তু আমার তো মনে হয়, অনেক সেফ সিটি। কাল রাতে, বারোটার সময় একা এলাম এয়ারপোর্ট থেকে। দিল্লিতে ভাবতেই পারি না। ওখানে এত কিডন্যাপ, রেপিং, নিশ্চিন্তে হাঁটা-চলা যায় না।

—ঠিকই বলেছ। কলকাতায় ভায়োলেন্স কম।

গল্প করতে করতে একটা সময় কথা ফুরিয়ে গেল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম। গাড়ি সোনারপুর পেরিয়ে যাচ্ছে। এ দিকটা, আকাশ বেশ মেঘলা। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। চুল সামলাতে সবিতা জানলার কাচটা তুলে দিল। গলায় সরু সোনার চেন। সেখানে ঝুলিয়ে রেখেছে ও সানগ্লাসটা। টি শার্টের একটা বোতাম খোলা। বুকের কাছে ওই জায়গাটা অসম্ভব ফর্সা। বহুদিন আগে, পরমার সঙ্গে একদিন যাচ্ছিলাম রায়চকে। হাওয়ায় ওর বুকের আঁচল হঠাৎ সরে গেছিল। দুষ্টুমি করে সেদিন তাকিয়েছিলাম বুকের দিকে। সেটা লক্ষ করে ও সত্যিই খুব রেগে গেছিল আমার উপর। সেই কথা মনে পড়তেই, চোখটা সরিয়ে নিলাম। পরমার কথা যতই ভোলার চেষ্টা করি না কেন, ভুলতে পারছি না।

গাড়িতে লং ড্রাইভে গেলে আমার ঘুম ঘুম পায়। বাতাসের ঝাপটায় চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে। রাস্তার দু'পাশে সবুজ আর সবুজ। পরমা পাশে থাকলে সরে আসত। বলত, "দেখো, দেখো, কী সুন্দর জায়গাটা।" অনেক সময় ওকে রাগাবার জন্যই বলতাম, "তোমার থেকে সুন্দর আর কিছু হয় না।" মুখ ঝামটা দিয়ে উঠত ও, "ফালতু ফ্ল্যাটারি কোরো না। আমার ভাল্লাগে না।"

চোখ বুজে পুরনো দিনের কথা ভাবতে লাগলাম। কী সুন্দর সেই সব দিন। বড়দার বৌভাতে পরমা আসতে পারেনি পরীক্ষার জন্য। সারাটা দিন আমি কিন্তু মুখিয়ে ছিলাম। কনেযাত্রীদের মধ্যে ওকে না দেখে সত্যিই আমার মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেছিল। একটা সময় জ্যোতি বলেছিল, "কী ব্যাপার বল তো ? অপর্ণা সেনের হিট ফিল্ম আজ এল না।"

—সেটা আবার কী।

—আরে পরমা। দাঁড়া, খোঁজ নিই।

কয়েক মিনিটের মধ্যে জ্যোতি শুধু খোঁজ নিয়েই এল না, বাড়ির টেলিফোন নম্বরটাও জোগাড় করে এনেছিল। তারপর আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেছিল ড্রয়িংরুমে। পরে বড়বৌদির কানে গেলে পাছে কিছু মনে করে, এই ভয়ে সেদিন জ্যোতিকে আমি বারণ করেছিলাম, "প্লিজ, বাড়াবাড়ি করিস না।" ও পাত্তাই দেয়নি কথাটা। কর্ডলেসে বাটন পুশ করে ফোনে ধরেছিল পরমাকে। তারপর ইশারা

করেছিল প্যারালাল লাইনটা ধরতে।

—কে বলছি, বলো তো ?

ও প্রান্ত থেকে পরমা বলেছিল, "বুঝতে পারছি না।"

—যে মেয়ের মেমারি এত শর্ট, সে পাশ করবে কী করে মাধ্যমিক ?

—কে বলছেন আপনি ?

—জ্যোতিদা। মনে আছে ?

—আপনার সেই স্মার্ট বন্ধুটার বুঝি সাহস হল না, নিজে নিজে ফোন করার ?

কথাটা শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। কী বুদ্ধিমতী মেয়েটা ! ঠিক ধরেছে, আমি আশপাশে আছি।

জ্যোতি বলেছিল, "এলে না কেন ?"

—কথাটা আপনি জানতে চাইছেন, না অন্য কেউ ?

—ধরো তাকে।

কী বলব আমি ? ভয়ে তাড়াতাড়ি ফোনটা রেখে দিয়েছিলাম। জ্যোতি খুব রেগে উঠেছিল, "তুই একটা অপদার্থ। তোর কিৎস্যু হবে না। একটা পুঁচকে মেয়েকেও ফেস করতে পারিস না।"

...গাড়িতে মৃদু ঝাঁকুনি। তাল কেটে গেল। কাঁধের কাছে কিসের ছোঁয়া। তাকিয়ে দেখি, সবিতা। আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। ঠিক বুঝতে পারলাম না, সরিয়ে অথবা জাগিয়ে দেওয়া উচিত হবে কি না। ফের চোখ বুজলাম। এখনও নিমপীঠ আসেনি। ওখানে একটা রামকৃষ্ণ মিশন আছে। রাষ্ট্রপতি একবার ওই মিশনে এসেছিলেন। তখন প্রেস পার্টির সঙ্গে আমিও আসি কলকাতা থেকে। পরদিন আমার রিপোর্ট কিন্তু দৈনিক প্রভাতে ছাপা হয়নি। ছাপা হয় অমিতাভ-র খবর। আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার। খুব বেইজ্জত হয়েছিলাম পি আই বি-র লোকেদের চোখে সেবার।

জয়নগরের দিকে রাস্তাটা খুব খারাপ। একে সরু, দুটো বাস পাশাপাশি যেতে পারে না। তার উপর মাঝেমধ্যে প্রচণ্ড গর্ত। সেই সঙ্গে ধুলো। এই রাস্তায় অবশ্য চলে ট্রেকার। খেয়াঘাট থেকে শেয়ারে ট্রেকার ছাড়ে। জয়নগর স্টেশন ছুঁয়ে ট্রেকার চলে যায় সোনারপুর, রাজপুর হয়ে নরেন্দ্রপুর, গড়িয়া। কুলতলি অঞ্চলের লোক এই পথ দিয়েই কলকাতা যায়।

জয়নগর খেয়াঘাটে পৌঁছলাম বেলা দুটো নাগাদ। গাড়ি থামতেই ধুলোর ঝড় উঠল। আমাদের দু'জনের গায়েও এসে লাগল। সবিতা রুমাল দিয়ে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, "এখানে বসে কোথাও লাঞ্চ সেরে নেওয়া যাক। কী বলো অয়ন ?"

—আমার কোনও অসুবিধে নেই। দাঁড়াও দেখি, কাছাকাছি কোথাও সফট ড্রিঙ্কস বা মিনারেল ওয়াটার পাওয়া যাবে কি না। এখানকার জল খাওয়া ঠিক হবে না।

—কারেক্ট। চিন্তা নেই, মিনারেল ওয়াটারের দুটো বোতল, আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

শুনে মনে মনে তারিফ করলাম মেয়েটার। খুব মেটিকুলাস। হবেই বা না কেন ? বিদেশিদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওকে কাজ করতে হয়। সব কিছু আগাম ভেবে নেওয়া শিখে গেছে। আগের বার এসে খুব অসুবিধায় পড়েছিলাম আমি জল নিয়ে।

BOIRBOI.NET

কিটব্যাগ থেকে দুটো লাঞ্চ বক্স বের করল সবিতা। ভর্তি স্যান্ডউইচ আর চিলি চিকেন। গাড়ির ভেতর বসেই আমরা খেতে শুরু করলাম।

গাড়ির একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আমাদের অবাক হয়ে দেখছে কয়েকটা ছেলে-মেয়ে। সাত থেকে দশ বছর বয়স। খুবই দীনদরিদ্র চেহারা। হয়তো আশপাশে থাকে। আমাদের মতো লোক খুব কমই আসে এ দিকে। সে জন্য হাঁ করে দেখছে। আমাদের লাঞ্চ বক্সে প্রচুর স্যান্ডউইচ। একটা প্যাকেটই দু'জনে মিলে শেষ করতে পারলাম না। বাকিটা রেখে কী হবে। তাই বললাম, "সবিতা, প্যাকেটটা ওই বাচ্চাগুলোকে দিয়ে দাও।"

—সেটা কি ঠিক হবে অয়ন ? রাতে হয়তো এমন জায়গায় থাকব, যেখানে কোনও খাবার পাওয়া যাবে না।

দ্বিতীয়বার তারিফ করলাম সবিতার বিচক্ষণতায়। খাওয়া শেষ করে বললাম, "একটা ভটভটি ভাড়া করতে হবে। খেয়াঘাটে যাচ্ছি। সব থেকে ভাল হয়, যদি আগের বারের মাঝিটাকে পাই।"

আকাশে কালো মেঘ। বাতাসের জোর বাড়ছে। খেয়াঘাটের দিকে এগোলাম। কুলতলি থানা খুব বেশি দূরে নয়। যে কোনও ভটভটিতে উঠলেই নামিয়ে দেবে। আমরা যাব অনেক দূর। ভটভটি ভাড়া করে নেওয়াই সব থেকে ভাল। থানা থেকে যদি লঞ্চ পাওয়া না যায়, তা হলে ফের ফিরে আসতে হবে খেয়াঘাটে। সন্ধের মধ্যে আমাদের ঝড়খালি পৌঁছতে হবে। দিনেরবেলায় গিয়ে লাভ নেই। জগু সর্দারকে পাওয়া যাবে না। গোপন আস্তানা থেকে বেরোয় না পুলিশের ভয়ে। রাতে ইন্টারভিউ নিয়ে, সকালে রওনা হতে হবে বেনিফেলির জঙ্গলের দিকে। ওই অঞ্চলে প্রায়ই ডাকাতি হয়। ডকুমেন্টারির লোকেশনের পক্ষেও চমৎকার।

পুরনো মাঝিটাকে পাওয়া গেল না। একটা ভটভটি ভাড়া করে আমরা চেপে বসলাম। নদীর জল অনেকটা নেমে গেছে। কাদা মাড়িয়ে উঠতে হল। ছইয়ের ভেতর ঢুকে, পা-টা ছড়িয়ে দিলাম। একটা বাঁক পেরোতেই চোখে পড়ল এক পাশে গভীর জঙ্গল। অন্য পাশে গ্রাম। ভটভট শব্দ করতে করতে ভটভটি এগোচ্ছে। ইংরেজিতে এগুলোকে বলে মেকানাইজড বোট। চলে ট্রামের গতিতে। যেতে যেতে দেখলাম, নদী ক্রমশই চওড়া হচ্ছে। অনেক শাখা বেরিয়ে গেছে। তা দেখে সবিতা একসময় বলল, "গত বছর ভেনিস গেছিলাম। এখানে এসে ভেনিসের কথা মনে পড়ছে। জায়গাটা ঠিক এ রকম। পার্থক্য শুধু একটা। এখানে ভটভটিতে যাচ্ছি, ওখানে গণ্ডোলায়।

বললাম, "এখনও তো নীচের দিকে যাওনি। অথবা টাইগার প্রোজেক্টে। এত সিনিক বিউটি আর কোথাও পাবে না। এক দিকে গা ছমছম করবে, অন্য দিকে মন ভরে যাবে।"

—এখান থেকে কত দূর ?

—দূর বেশি নয়। তবে দুর্গম। নদী-উপনদী পেরিয়ে যেতে হবে। ভাল কথা, তোমাদের টিমটা যখন আসছেই, তখন বাঘের উপরও একটা ডকুমেন্টারি করতে বলো না।

—ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া। একই সঙ্গে দুটো কাজ হয়ে যাবে।

—বাঘের উপর ছবি করতে হলে, তোমাদের অবশ্য পার্মিশন নিতে হবে গভর্মেন্ট থেকে।

—সে দায়িত্ব তোমার।

—আরও একটা ডকুমেন্টারি করতে পারো, মউলেদের নিয়ে। তবে এখন করা যাবে না। আসতে হবে মার্চ-এপ্রিলে।

—মউলে কারা ?

—যারা বনে মধু সংগ্রহ করতে যায়। এই সুন্দরবনে বিধবাদের একটা গ্রাম আছে। তাদের হাজবেন্ডরা ছিল মউলে। বনে মধু জোগাড় করতে গিয়ে বাঘের পেটে গেছে।

—ভেরি ইন্টারেস্টিং।

—এখানে মিডিয়ার লোকজন খুব একটা আসে না। কিন্তু এই জায়গাটা খবরের খনি। জানো, আগের বার এসে নগেনাবাদ বলে একটা জায়গায় গেছিলাম। সেখানে এমন অনেক লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম, যাদের বয়স একশোর বেশি।

—আরে, এই সাবজেক্টটা নিয়েও তো ডকু করা যায়। দাঁড়াও, দাঁড়াও, সব লিখে নিই।

কিটব্যাগ থেকে নোট বই বার করল সবিতা। নানা ধরনের প্রশ্ন করে সব লিখতে লাগল। আকাশ প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। ভটভটি মাঝনদী থেকে সরে এসেছে পারের কাছাকাছি। ঝড় উঠলেই মুশকিল। স্রোতের টান বাড়ছে। এ দিকটায় জেলেদের গ্রাম। পারে জাল শুকোচ্ছে। একটা জায়গায় দেখলাম, ট্রলার তৈরি হচ্ছে। সামনের দিকটা ময়ূরকণ্ঠী। শুধু রঙ করা বাকি।

সবিতা যা দেখছে, তাতেই অবাক। একবার বলল, "ভাবাই যায় না পশ্চিমবাংলায় এমন সব জায়গা আছে। আমি কিছু সাজেশন পাঠিয়ে দেব। দেখি, হেড কোয়ার্টার থেকে কী বলে।"

—সব থেকে ইম্পরট্যান্ট ফ্যাক্টর, জগু সর্দারকে আজ পাওয়া যাবে কি না। ওকে পেলে দেখবে, পাইরেটসদের নিয়ে তোমার প্রোগ্রামটা জমে যাবে। আমি বাইচান্স সেবার পেয়ে গেছিলাম।

—ওহ্, আগে থেকে খবর দিয়ে যাওনি ?

—খবর দিলে থাকতই না। রাত আটটার সময় ওর হাইড-আউটে পৌঁছলাম। দেখি, অন্ধকারের মধ্যে থেকে কে একজন লাল রঙের আলো দেখাচ্ছে। আলোটা জ্বলছে-নিভছে।

—তারপর কী হল ?

—আমার সঙ্গে ওদের যে ছেলেটা ছিল, সে অদ্ভুত ধরনের একটা শিস দিল। তারপর বলল, অয়নবাবু নড়াচড়া করবেন না। নড়লেই জগু সর্দারের সঙ্গীরা গুলি চালাবে।

—মাই গড, তারপর ?

—ছেলেটা পকেট থেকে টর্চ বের করে তিনবার জ্বালিয়ে নেভাল। সঙ্গে সঙ্গে মাটি ফুঁড়ে উঠে এল এক জন। সেই লোকটাই পরে আমাদের নিয়ে গেল জগু সর্দারের কাছে।

—একা গেলে তো তুমি খুব বিপদে পড়তে তা হলে ?

—যেতেই পারতাম না ওখানে।

—ঠিক এই সিকোয়েন্স কিন্তু আমরা রাখব ডকুমেন্টারিতে।

—যদি জগু সর্দারকে পাওয়া যায়।

—ও কি অন্য কোথাও যায় ?

—যায়। তবে ছদ্মবেশে। আমরা জানি না, হয়তো জয়নগরের খেয়াঘাটেই ও ছিল। কাকদ্বীপ থেকে কলস দ্বীপ সর্বত্রই ওর গতিবিধি।

এই সব আলোচনার ফাঁকেই আমরা কুলাতলি থানার ঘাটে পৌঁছে গেলাম। একটু দূরে পুলিশের লঞ্চ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মানে, ও সি সমীর গড়গড়ি এখন থানাতেই। বাইরে যাননি। থানার সামনে ওর কোয়ার্টার। হয় থানা, না হয় কোয়ার্টারে পাওয়া যাবে গড়গড়িকে। ভদ্রলোক খুব সাহায্য করেছিলেন আগের বার। নিজের হাতে রান্না করে মুরগির মাংস খাইয়েছিলেন আমাকে আর সুজয়কে। আমার সঙ্গে ছবি তুলতে এসেছিল সুজয় আগের বার।

ঘাট থেকে ইট বিছানো রাস্তা সোজা চলে গেছে থানা পর্যন্ত। আসলে ওটা রাস্তা নয়, আল। বর্ষার সময় খুব কাদা হয়। সে জন্যই ইট বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। দু'পাশে ইউক্যালিপটাস গাছ। বাতাসে দুলছে লম্বা লম্বা গাছ। সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছে। আকাশ চিরে একবার বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল। যে কোনও সময় বৃষ্টি নামবে। তাড়াতাড়ি পা চালালাম। বৃষ্টি নামার আগেই থানায় ঢোকা দরকার। ছোট্ট থানা। একতলা বাড়ির তিনটে মাত্র ঘর। তবে অনেকটা জায়গা নিয়ে। থানার সামনে পৌঁছে দেখি, ছোট্ট জটলা। গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে কিছু লোক। নিশ্চয়ই কোনও পলিটিক্যাল পার্টির লোক। দু'-এক জনের হাতে পোস্টার—সমীর গড়গড়ির বদলি চাই।

সবিতাকে নিয়ে ও সি-র ঘরে ঢুকতেই গড়গড়ি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, "অয়নবাবু আপনি ?"

হেসে বললাম, "এত অবাক হচ্ছেন কেন ?"

—এই হল বড় রিপোর্টার। ঠিক সময়ে খবর পেয়ে গেছেন।

—কোন খবর ?

—জগু সর্দার আজই ধরা পড়েছে।

BOIRBOI.NET

॥ ছয় ॥

গড়গড়ি লোকটা ছয় ফুট দু'তিন ইঞ্চির মতো লম্বা। প্রায় আমার সমান। কথা বলে গাঁক গাঁক করে। খুব দাপুটে। আগের বার কথায় কথায় বলেছিলেন, হম্বিতম্বি না করলে লোকে মানবে কেন ? গত চৌদ্দ-পনেরো বছরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার চারটে থানায় ঘোরা হয়ে গেছে গড়গড়ির। এ সব জায়গায় পোস্টিং মানে নির্বাসন। কিন্তু গড়গড়ি এই জেলা থেকে যেতে চান না। অঞ্চলগুলো হাতের তালুর মতো চেনা। অপরাধীদেরও। রায়দিঘি, পাথরপ্রতিমায় কিছু হলেও তাই ডাক পড়ে গড়গড়ির।

সারা মুখ হাসিতে ভরিয়ে গড়গড়ি বললেন, "জগু সর্দার অনেকবারই হাত ফসকে পালিয়েছে। এ বার ধরেছি। অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল মশাই। ধরা পড়লে ও যেন আমার হাতেই পড়ে।"

জগু সর্দার ধরা পড়া মানে, আমাদের কাছে বড় খবর। লোকটাকে নিয়ে দিনের পর দিন কাগজে নানা ঘটনা বেরিয়েছে। সাধারণ লোকের মধ্যেও তাই প্রচুর আগ্রহ। রবিবাসরীয়তে আমার লেখাটা বেরোবার পর যেখানেই গেছি, লোকে জানতে চেয়েছেন জগু সর্দারের কথা। খবরটা যখন পেয়েছি, তখন দৈনিক প্রভাতে ফোন করে জানানো উচিত। গত কয়েকদিন কয়েকটা বড় খবর পেয়েও, কাগজের উপর অভিমান করে, ছেড়ে দিয়েছি। এই খবরটা বোধ হয় ছাড়া উচিত না। আফটার অল, আমি একজন ক্রাইম রিপোর্টার। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে নিলাম, গড়গড়ির কাছে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করা ঠিক হবে না। জানি না, ওঁর সঙ্গে কোনও রিপোর্টারের যোগাযোগ আছে কি না। থাকলে আমার আগ্রহ দেখে, সেই রিপোর্টারকে হয়তো গড়গড়ি খবর দিতে পারেন। তবে বাইরে আকাশের যা অবস্থা, তাতে কলকাতা থেকে রিপোর্টার আসা আজ অন্তত সম্ভব না।

খুব হালকাভাবেই বললাম, "জগু সর্দারকে ধরলেন কোথায়?"

—জয়নগরের খেয়াঘাটে।

—তাই নাকি? কিন্তু ও তো থাকে ঝড়খালির দিকে। এ দিকে কেন এসেছিল?

—পুলিশের চোখে ধুলো দিতে। ওকে নিয়ে আপনার লেখাটা বের হওয়ার পরই ভবানীভবন থেকে অর্ডার আসে, ওকে ধরো। সেটা ওর কানে নিশ্চয়ই গেছে। নর্মালি পার্টি লিডারদের সঙ্গে ও যোগাযোগ রাখত বাসন্তী-গোসাবা অঞ্চল দিয়ে। আমাদের লোক ওয়াচে রাখছিল। তাই এ বার ও দিক দিয়ে না গিয়ে মাতলা পেরিয়ে এই ফুলতলি দিয়ে জয়নগর হয়ে কলকাতা যাচ্ছিল।

—খবর পেলেন কী করে?

—আমার এক ইনফর্মার ওকে চিনত। সে আগে ওর দলে ছিল। সে-ই আজ সকাল দশটা নাগাদ খবর দিল, কালো রঙের ভটভটি করে জগু সর্দার এ দিকে আসছে। না কোনও রকম এনকাউন্টারে যায়নি। খেয়াঘাটে লাফিয়ে ভটভটিতে উঠে, কলার ধরতেই চুপচাপ চলে এল আমার সঙ্গে। সেটা দেখে আমার ইনফর্মার ঘাটেই অজ্ঞান হয়ে যায়।

বলে হাসতে লাগলেন গড়গড়ি। লোকটাকে সমীহ করতে ইচ্ছে হল। দুঃসাহসিক কাজ করেছেন ভদ্রলোক। জিজ্ঞেস করলাম, "জগু সর্দারকে রেখেছেন কোথায়?"

—এই থানাতেই। লক আপে। লোকটার এমন মাহাত্ম্য, ভয়ে আমার লোকেরা কেউ লক আপে ডিউটি দিতে চাইছে না। লোকটা নাকি মন্ত্র জানে। মন্ত্র দিয়ে সাপ ডেকে আনতে পারে। মন্ত্র-তন্ত্র জানে বলে বাঘও নাকি লোকটাকে এড়িয়ে যায়। আমি মশাই, দুই লাথি মেরে লক আপে ঢুকিয়েছি। অনেক দিনের রাগ। তা যাক, এ বার বলুন, আপনারা কী মনে করে...।

—আমরা জগু সর্দারের কাছেই যাচ্ছিলাম। বলে পরিচয় করিয়ে দিলাম সবিতার সঙ্গে।

শুনে গড়গড়ি বললেন, "যান, একবার দেখে আসুন শয়তানটাকে। যেন বাঘ ধরা

পড়েছে। এমনভাবে গজরাচ্ছে এখন।"

—বড় কর্তাদের খবর দেননি ?

—দিয়েছি। ওর বিরুদ্ধে পাঁচটা থানায় নানা অভিযোগ। ওই সব থানার ও সি-রাও সব কাল সকালে আসছেন। বেশিদিন রাখা যাবে না এখানে, পার্টির লোকেরা চাপ দেবে তা হলে।

গড়গড়ি ভবানীভবনে খবর দিয়েছেন মানে, কলকাতার কাগজের রিপোর্টাররাও এতক্ষণে খবর পেয়ে গেছে। জেলার সাংবাদিকরা রোজই একবার করে ঢুঁ মারে ভবানীভবনে। সঙ্গে সঙ্গে মন ঠিক করে নিলাম। খবরটা কাগজে পাঠাতে হবে। সম্ভব হলে এখনই। গড়গড়িকে বললাম, "একটা ফোন করা যাবে ?"

—কোথায় করবেন ?

—অফিসে।

—ফোনের প্লাগটা ইচ্ছে করেই খুলে রেখেছি। যাতে জগু সর্দারের জন্য কেউ রিকোয়েস্ট করতে না পারে। তবে আপনার জন্য পাঁচ মিনিটের জন্য প্লাগ লাগিয়ে দিচ্ছি। একটা কথা, আপনি কিন্তু আমাকে ডোবাবেন না।

—দাঁড়ান। দাঁড়ান। লোকটাকে আগে দেখে আসি। তারপর অফিসে ফোন করব।

—চলুন।

দু'টো ঘর পেরিয়েই থানার লক আপ। দশ বাই চার হাত-সরু একটা ঘর। আলো নেই। আবছা অন্ধকারের মধ্যে জগু সর্দার একটা টুলের উপর বসে আছে। মাস তিনেক আগে লোকটাকে যখন খুঁজে বের করি, তখন ও মদ খেয়ে চুর হয়ে ছিল। ভেড়ির সেই ছোট্ট ঘরে, লণ্ঠনের আলোয় লোকটাকে ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল। গড়গড়ি ওর মুখে আলো ফেললেন টর্চের। তারপর ব্যঙ্গ করে বললেন, "বাবুর আবার মেজেয় বসা অভ্যাস নেই। তাই টুল না দেওয়া পর্যন্ত পায়চারি করে যাচ্ছিল।"

ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল জগু সর্দার কথাটা শুনে। মুখের রঙ রোদে পুড়ে গেছে। চোখ টকটকে লাল। চুলে ব্যাকব্রাশ। মুখে কাঠিন্যের ছাপ। দেখেই বোঝা যায় লোকটা নিষ্ঠুর। বলে বলে খুন করতে পারে। জঙ্গলে বাঘ, সাপ, জলে কুমির-কামোঠ যে ভয় পায় না, তার কাছে একটা মানুষ খুন করা তো জল-ভাত। লোকটার বিরুদ্ধে অন্তত গোটা কুড়ি খুনের অভিযোগ আছে।

সবিতা আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। ফিসফিস করে বলল, "ইস, ভিডিও ক্যামেরা আনলে এখানেই অর্ধেক কাজ হয়ে যেত। এর বিরুদ্ধে যে সব চার্জ আছে, মাস তিনেকের আগে কোনওমতে বেল পাবে না। আমাদের পুরো প্রোগ্রামটাই বানচাল হয়ে গেল।"

গড়গড়ি শুনতে পেয়েছিলেন কথাটা। জগু সর্দারকে শুনিয়েই একটু জোরে বললেন, "মাস তিনেক কী বলছেন সবিতাদি। তিন বছর বলুন। এই যে ভেতরে ঢোকালাম, আর শয়তানটাকে বের হতে দেব না। বছর দশেক আমাদের নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দেয়নি।"

জগু সর্দার ঘরঘরে গলায় ভেতর থেকে কী একটা বলতেই, ছাদ ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলেন গড়গড়ি, "চোপ শালা। চোপ। তোর পাছায় যদি আজ রাতে রুল না

ঢোকাই, তা হলে ঘুমোতে পারব না। আসুক বড় কর্তারা। মজা দেখাচ্ছি।"

গলা শুনে আমরাও চমকে উঠলাম। পরক্ষণেই গড়গড়ি স্বাভাবিক গলায় বললেন, "অয়নবাবু, চলুন, ঘরে গিয়ে বসি। একটু চা হয়ে যাক।"

ও সি-র ঘরে এসে বসতেই সবিতা বলল, "কী করা যায় বলো তো অয়ন ?"

বললাম, "এত আপসেট হয়ে পড়ছ কেন ?"

—পুলিশ আর ক'টা দিন পরে ধরলে কী এমন ক্ষতি হত ?

হার্ডকোর রিপোর্টার। সবিতা নিজের কথাই ভাবছে। ভাগ্যিস, চায়ের কথা বলতে গড়গড়ি পাশের ঘরে গেছেন। কথাটা শুনতে পাননি। শুনলে হয়তো দাবড়ে উঠতেন। আশ্বস্ত করার জন্য সবিতাকে বললাম, "একটা কাজ করা যেতে পারে। আমার জানা এক ফ্রি ল্যান্স ফটোগ্রাফার আছে। গতবার স্টিল ছবি তুলতে আমার সঙ্গে এসেছিল এই অঞ্চলে। সে ভিডিও ফটোগ্রাফিও করে। একটা ফোন করলে, সে ছুটে আসবে।"

—কিন্তু কোয়ালিটি ভাল হবে না।

—দেখোই না, চান্স নিয়ে।

—বলো তাকে, তা হলে।

এই সময় ঘরে ফিরে এলেন গড়গড়ি। তারপর বললেন, "এই মাত্র ওয়ারলেসে খবর এল, কাল এস পি আসছেন দলবল নিয়ে। যা করার আজই করে ফেলুন অয়নবাবু। কর্তারা এলে আমার কথা আর কিন্তু খাটবে না।"

—ফোনটা তা হলে ঠিক করে দিন। কথা বলি অফিসের সঙ্গে।

—দিচ্ছি। 'টেবলের নীচে দেয়ালের দিকে উবু হয়ে বসে গড়গড়ি কী যেন করে বললেন, "ফোনটা তুলে দেখুন তো ডায়াল টোন আছে কি না।" রিসিভারটা কানে লাগিয়ে দেখলাম, আছে। ডায়াল করে একবারেই লাইন পেয়ে গেলাম অফিসের।

—নমস্কার দৈনিক প্রভাত। সান্দ্রার গলা। বললাম, "সান্দ্রা, রিপোর্টিংয়ে দাও তো লাইনটা।"

—দিচ্ছি অয়নদা। কোত্থেকে ?

—সুন্দরবন।

—দিচ্ছি। লাইনটা এনগেজড আছে।

—হ্যালো, সান্দ্রা, শোনো, নিউজ ডেস্কে দাও। জরুরি। দেয়াল ঘড়িতে দেখলাম, বেলা প্রায় পাঁচটা। রিপোর্টাররা প্রায় সবাই এখন বাইরে। দু'একজন ফিরে এলেও, লেখায় ব্যস্ত। সাব এডিটররা বরং এখন ফাঁকা। কেউ একজন ফোনটা তুলল।

—হ্যালো। মেয়ের গলা।

—অয়নদা বলছি। কে বলছেন ?

—স্নিগ্ধা।

ওহ্ সেই মেয়েটা ! গোয়েঙ্কা টাওয়ার্সে থাকে। মাস কয়েক হল জয়েন করেছে। এত বড় খবর ও নিতে পারবে না। তাড়াতাড়ি বললাম, "রিপোর্টিংয়ে কে আছে দেখো তো। একটা খবর দেওয়ার আছে।"

—কুণালদা দাঁড়িয়ে আছে, দেব।

—দাও।

ফোনটা এসে ধরল কুণালদা, "কী ব্যাপার অয়ন, ক'দিন তোমার পাত্তা নেই। কোত্থেকে ফোন করছ ?"

—কুলতলি থেকে। দারুণ একটা খবর আছে। সেই জলদস্যু জগু সর্দারকে পুলিশ আজ ধরেছে।

—ওহ্ দাঁড়াও, জেলা ডেস্কের কাউকে ডেকে দিই। এক ঘণ্টা পরে ফোন করতে পারবে ? কাউকে তো দেখছি না।

—কুণালদা, আপনি শুনে নিন। অন্য কাগজ কিন্তু খবরটা করবে।

—আমি এখুনি বেরোব অয়ন। রবীন্দ্রসদনে একটা প্রোগ্রাম আছে। সুধীনকে খবরটা দিয়ে যাচ্ছি। তুমি সাতটার সময় ওকে ধোরো। বলেই লাইনটা কেটে দিল কুণালদা। সবিতা আর গড়গড়ি আমার দিকে তাকিয়ে। একটু লজ্জাও লাগছে ওদের সামনে। অফিসে আমার কী অবস্থা। কেউ খবর নিতে চাইছে না। সঙ্গে সঙ্গে মন ঠিক করে নিলাম। আবার ডায়াল করলাম। এ বার অবশ্য দৈনিক প্রভাতে নয়। আনন্দবাজারে। আমাদের রাইভাল কাগজে।

—হ্যালো, প্রসূন ব্যানার্জি আছেন ?

—রিপোর্টিংয়ের ?

—হ্যাঁ।

—ধরুন।

এক সেকেন্ডের মধ্যে প্রসূনের গলা ভেসে এল। বোঝা যায়, আনন্দবাজার কত পেশাদার। এই কারণেই কাগজটা সবার ওপরে। বললাম, "অয়ন বলছি, একটা খবর আছে।"

—বল।

গুছিয়ে বললাম সব। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সব খবর দেওয়া হয়ে গেল। শেষ হওয়ার পর ওদিক থেকে প্রসূন জিজ্ঞাসা করল, "খবরটা তোদের কাগজে দিচ্ছিস না ?"

—না রে। দিতে চেয়েছিলাম। ওরা নিল না।

—ওহ্, বুঝেছি। আসছিস কবে ?

—ঠিক নেই। সুজয়কে এখনই একটা খবর দিতে পারবি ? কাল সকাল দশটার মধ্যে ও যেন এখানে চলে আসে। ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে।

BOIRBOI.NET

—দেব। তোর বাড়িতে কোনও খবর দেওয়ার আছে ?

—না।

এ বার নিজেই কেটে দিলাম লাইনটা। গড়গড়ির মুখে হাসি। প্রসূনকে খবরটা দেওয়ার সময় একবার বলেছিলাম, পুরো কৃতিত্বটা সমীর গড়গড়ির। রিসিভার ক্রেডলে রাখার পর গড়গড়ি জানতে চাইলেন, "আচ্ছা, আপনি যে এই খবরটা দিলেন, এটা পুরো বেরোবে, না কাট ছাঁট করা হবে ?"

হেসে বললাম, "পুরোটাই বেরোবে।"

বাইরে এই সময় বৃষ্টি নামল। বিরাট শব্দ করে কোথায় যেন বাজ পড়ল। এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে জোরে। জানলা—দরজা দড়াম করে খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। জলের ঝাপটায় টেবলের উপর রাখা কয়েকটা কাগজ ভিজে গেল। তা দেখে

গর্জে উঠলেন গড়গড়ি, "চারশো দুই। অ্যাই চারশো দুই।"

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতরে ঢুকে এল এক কনস্টেবল। পা ঠুকে দাঁড়িয়ে, বলল, "স্যার ডাকছেন ?"

খিঁচিয়ে উঠলেন গড়গড়ি, "দেখতে পাচ্ছ না, ছাঁট আসছে। জানলা বন্ধ করে দাও।"

শশব্যস্ত হয়ে জানলাগুলো বন্ধ করে দিল সেই কনস্টেবল। তারপর বলল, "স্যার, আর কিছু ?"

—চা কী হল ? আধঘণ্টা আগে যে বলে এলাম ?

—আনছে স্যার।

চুপচাপ বসে আমরা গড়গড়ির কাণ্ড দেখছি। সবিতা একটু দমে গেছে। দমে যাওয়ারই কথা। যে জন্য আসা, সেটাই ভেস্তে গেল। ঝড়খালি যাওয়ার দরকার হল না। ওখান থেকে বাই রোড বাসন্তী চলে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। সেখান থেকে গোসাবা হয়ে টাইগার প্রোজেক্ট। তারপর দক্ষিণ দিকে যতটা পারতাম ঘুরিয়ে দেখাতাম সবিতাকে। ফের এ দিকে এসে রায়দিঘি যেতাম। পরে বেনিফেলির জঙ্গল হয়ে একেবারে কলস দ্বীপ পর্যন্ত নিয়ে মোটামুটি প্ল্যান করে নিতে পারতাম, কীভাবে শুটিং করা যাবে টি ভি-র জন্য। সব আপসেট হয়ে গেল।

সেই কনস্টেবল চা নিয়ে এল। সঙ্গে বিস্কুট। চা খেতে খেতে সবিতাকে বললাম, "এত আপসেট হওয়ার কিছু নেই। বেস্ট হচ্ছে, আজ রাতটা এখানে কাটিয়ে, কাল সকালে পেটকুলচাঁদ নদী ধরে সোজা নগেনাবাদ চলে যাওয়া। ওখানে ভানু সর্দার বলে আরেকজন জলদস্যু আছে। সে অন্য পার্টি করে। তাকে ধরা।"

সবিতা বলল, "তুমি যা বলবে, তাই হবে। পুরো অঞ্চলের একটা ম্যাপ পেলে ভাল হত।

গড়গড়ি শুনতে পেয়ে বললেন, "এই তো। দেওয়ালেই টাঙানো আছে। দেখে নিন না।"

সবিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে ম্যাপ দেখতে লাগল। আমি উঠে থানার বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। বাইরে অন্ধকার। বৃষ্টির তোড় বেড়েই চলেছে। সারা আকাশ চিরে একেক সময় বিজলি চমকাচ্ছে। প্রকৃতির এই রুদ্র রূপ বহুদিন দেখিনি। আমাদের দিন কাটে অফিসের একটা হল ঘরে। সেখানে বসে জানার উপায়ও নেই, বাইরে কী হচ্ছে না হচ্ছে। ফ্যাক্স, ফোন, কম্পিউটার, এক্সক্লুসিভ আর খবর মিস—এ নিয়েই আমাদের জীবন। বৃষ্টিতে কতদিন ভিজিনি, মনে নেই। বহুদিন আগে, এ রকমই এক বৃষ্টির দিনে পরমা একবার আমাকে বোকা বানিয়েছিল।

থানার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে সেই দিনটার কথা মনে পড়ে গেল। বড়দার বিয়ের মাস দেড়েক পর আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল পরমা। পরীক্ষা দেওয়ার পর অখণ্ড অবসর। তাই জোর করে ওকে এ বাড়িতে নিয়ে এসেছিল বড়দা। কলেজ আর রোয়িং নিয়ে তখন আমি ব্যস্ত। জানতামও না পরমার কথা। লেক ক্লাবে ইন্টার কলেজ রোয়িং চ্যাম্পিয়নশিপ চলছে তখন। ফাইনালের দিন তিনটে ট্রফি জিতে মনে এত আনন্দ হয়েছিল যে বাড়িতে ফিরেই ট্রফি দেখাতে ঢুকেছিলাম বড়বৌদির ঘরে।

দেখে বড়বৌদি উৎসাহ দিয়েছিল, "বাঃ, খুব সুন্দর দেখতে তো ট্রফিগুলো। আজ পেলে ?"

—তুমি খুব পয়া বৌদি।

—আমাকে একদিন দেখাতে নিয়ে যাবে ? কেমন করে রোয়িং করো, দেখব।

—কাল যাবে ? কাল থেকে স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ আরম্ভ।

—তোমার দাদাকে একবার জিজ্ঞাসা করে নিই।

—চলো না বৌদি। সবার বাড়ি থেকে লোক যায়। আমাদের বাড়িতে কারও খেলাধুলো নিয়ে ইন্টারেস্ট নেই।

—কখন যেতে হবে ?

—দু'টোর পর। লেক ক্লাবে।

—ঠিক আছে। যাব। বাপীকে দেখিয়েছ ট্রফিগুলো ?

—বাড়িতে নেই বোধহয়।

—যাও, হাতমুখ ধুয়ে নাও। খাবার আনছি। সবাই মিলে আজ খানিক্ষণ গল্প করব।

দোতলায় আমার ঘরে জামা কাপড় বদল করার সময় হঠাৎ একটা ফোন এল। ফোনটা তুলতেই অপরিচিত এক মহিলার গলা, "অয়ন ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলতে পারি ?"

—বলুন, কে বলছেন ?

—আমাকে চিনবেন না। আমি সুরভি মিত্র। ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস বোর্ডের মেম্বার। রোয়িং কম্পিটিশনটা দেখি। আজ আপনি তিনটে ট্রফি জিতেছেন ?

—হ্যাঁ।

—ট্রফিগুলো কি আপনি বাড়ি নিয়ে গেছেন ?

—হ্যাঁ, কী ব্যাপার বলুন তো ?

—একটা ভুল হয়ে গেছে। যারা টাইম কিপার ছিলেন, তারা ভুল করেছেন। আপনি ফার্স্ট হননি।

—হতেই পারে না।

—দেখুন, তর্ক করবেন না। প্রাইজ দেওয়া হয়ে যাওয়ার পর একটা কমপ্লেন আসে। মিটিং করে আমরা ডিসিশন নিয়েছি, একটা ট্রফি আপনাকে বাড়তি দেওয়া হয়ে গেছে। আপনি ডিসকোয়ালিফায়েড। আমরা সবাই ওয়েট করছি। একবার ট্রফি নিয়ে আপনাকে আসতে হবে লেক ক্লাবে। না এলে বোর্ড আপনাকে সাসপেন্ড করবে।

সাসপেন্ড হওয়ার কথা শুনে ঘাবড়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি জামা গলিয়ে দৌড়লাম লেক ক্লাবে। আমাদের বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। কিন্তু সেদিন প্রবল বৃষ্টি। লেক ক্লাবে পৌঁছতে গিয়ে খুব ভিজে গেছিলাম। ক্লাবে গিয়ে দেখি, স্পোর্টস বোর্ডের কেউ নেই। আমাকে ক্লাব কর্তারা সবাই চেনেন। সুরভি মিত্র-র কথা বলতে, সবাই হাসাহাসি করলেন। বললেন, "কেউ তোমাকে লেগ পুল করেছে।"

ভিজে চপচপে অবস্থায় বাড়ি ফিরে এলাম। দেখি, ডাইনিং টেবলে বসে সবাই আড্ডা দিচ্ছে। বড়দার পাশে বসে পরমা। পরনে বেগুনি রঙের চোলি আর ঘাঘরা।

জারির কাজ করা। বসে আছে রাজেন্দ্রানীর মতো। বড়দার বিয়ের দিন প্রথম দেখেছিলাম পরমাকে। তারপর এই সামনাসামনি দেখলাম দ্বিতীয়বার। আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছিল পরমা। বউভাতের দিন ফোনের কথা মনে হতেই গুটিয়ে গেলাম। আমার অবস্থা দেখে বড়বৌদি বলে উঠেছিল, "কোথায় হুট করে বেরিয়ে গেলে অয়ন? তোমার খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

কেউ বোকা বানিয়েছে, তা তো বলা যায় না। বিশেষ করে পরমার সামনে। বললাম, "জ্যোতিদের বাড়িতে গেছিলাম। ওর মাকে ট্রফিগুলো দেখিয়ে আনলাম।"

—যাও, চট করে জামা কাপড় বদলে এসো। আজ আর পড়াশুনা করতে হবে না। আজ আড্ডা। আমার ঘরে পঞ্চাশের বেশি ট্রফি তখন। বেশিরভাগ রোয়িং থেকে পাওয়া। কিছু জেতা গলফ খেলে। বাপী টলি ক্লাবের মেম্বার। তখন নিয়মিত গল্ফ খেলতেন। বাপীর সঙ্গে টলি ক্লাবে গিয়ে আমিও মাঝেমধ্যে গলফ খেলতাম। ওই সময় দু'টো স্টিক আর অন্য সরঞ্জাম বাপী কিনে দিয়েছিলেন আমাকে। শো কেসে ট্রফিগুলো সাজিয়ে রাখার সময় দেখলাম, পরমা উঠে এসেছে। ঘাড় বেঁকিয়ে তা দেখতে দেখতে হঠাৎ বলল, "এত সব ট্রফি, কোত্থেকে কিনে এনেছ, অয়নদা?"

আচ্ছা মেয়ে তো! বললাম, "কিনে আনার দরকার হয়নি। রোয়িং আর গলফ খেলে জিতেছি।"

—দূর, রোয়িং আবার একটা খেলা নাকি! মাঝিরাও পারে। খেলা হচ্ছে ফুটবল। মরদের খেলা। কৃশানু দে, শিশির ঘোষ...সবাই চেনে।

কী বলব মেয়েটাকে? বিয়ের দিন থেকে আমার পিছনে লেগেছে। তাই চুপ করে রইলাম। ভিজে জামা-প্যান্ট বদলানো হয়নি। একটা মেয়ে ঘরে দাঁড়িয়ে থাকলে সেটা সম্ভব? ওয়ারড্রোব থেকে পাজামা-পাঞ্জাবি তুলে বাথরুমে ঢুকলাম। মিনিট পাঁচেক পর বাইরে বেরিয়ে দেখি, পরমা তখনও দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে কৌতুকের সুরে বলেছিল, "লেক ক্লাবে সুরভি মিত্রর সঙ্গে দেখা হল?"

কথাটা শুনে আমি হাঁ করে তাকিয়েছিলাম। তা হলে, তা হলে ফোনটা ওর? কোত্থেকে করল? পরক্ষণেই খুব হাসি পেল। উফ্, আমাকে এমন বোকা বানাল শেষ পর্যন্ত! মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "দেখা হয়নি। এই মাত্র হল।"

—বাঃ এই তো বুলি ফুটেছে।

—আস্তে আস্তে ফুটছে। পুরোটা ফুটলে কিন্তু থামানো যাবে না।

—গল্পটা কি সুপ্রিয়াদির কাছে করব?

—না করলেই ভাল। এক মাঘে কখনও শীত যায় না।

—চ্যালেঞ্জ?

—অ্যাকসেপ্টেড।

—বেশ। বলে নীচে নেমে গেছিল পরমা। সেই দিন রাতেই আমি ঠিক করেছিলাম, যদি কখনও বিয়ে করি, তো সে এই মেয়েটাকেই করব।

সেবার দিন চারেক আমাদের বাড়িতে ছিল পরমা। বাড়ির সবাইকে মাতিয়ে রেখেছিল। ওকে নিয়ে যেতে এসেছিল ওর বাবা-মা। মনে আছে, বাপী সেদিন কথায় কথায় বলেছিলেন "পরমার জন্য এই ক'টা দিন যে কোত্থেকে কেটে গেল,

BOIRBOI.NET

টেরই পেলাম না। আর কয়েকটা দিন, থেকে যাক না। বউমারও ভাল লাগবে।" উত্তরে পরমার মা বলেছিলেন, "ওকে এ বাড়িতেই রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন না।"

সেই সময় পরমা আমার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসেছিল। ওরা চলে যাওয়ার সময় আমি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। ঠিক যাওয়ার আগে পরমা উঠে এসেছিল।

—অয়নদা, চলি।

—আবার কবে আসছ ?

এই সময় আমার একটা হাত টেনে নিয়েছিল পরমা। তারপর হাতে কী একটা গুঁজে, মুঠো বন্ধ করে বলেছিল, "প্লিজ, এখন দেখো না। আমি চলে যাওয়ার পর মুঠো খুলো।"

মিনিট পাঁচেক পর মুঠো খুলে দেখি, একটা চিরকুট। তাতে লেখা, "আই লাভ ইউ।" ওই তিনটে শব্দ দেখে মনে হয়েছিল, চিরকুটটা নয়, সারা পৃথিবীটাই যেন আমার হাতের মুঠোয়।

...."বাবু, আমি থাকব, না, চলে যাব।"

কথাটা শুনে সম্বিত ফিরে পেলাম। বৃষ্টিতে টোকলা মাথায় দিয়ে একটা লোক প্রশ্নটা আমাকেই করছে। ভাল করে তাকাতেই চিনতে পারলাম, ভটভটির মাঝি। মনেই ছিল না, ভটভটি এখনও আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। বললাম, "দাঁড়াও, দিদিমণিকে জিজ্ঞাসা করে আসি।"

সবিতা নোটবইয়ে কী যেন টুকছে। গড়গড়ি বলে যাচ্ছেন। মেয়েটার সিনসিয়ারিটি দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। একদম সময় নষ্ট করে না। যে কাজের জন্য এসেছে, প্রতি মুহূর্ত ভাবছে তা নিয়ে। শেখার আছে ওর কাছ থেকে। সুধাংশুদা একবার বলেছিল, সাংবাদিকতার পেশায় মেয়েরা দারুণ সফল হতে পারে, যদি আন্তরিক হয়। মেয়েরা অনেক বেশি মনোযোগী হয়। কম ফাঁকিবাজ। তারপরই কয়েকজন মেয়েকে আমাদের কাগজে নেওয়া হয়েছে। ঈশিতা, সঙ্গীতা, স্নিগ্ধা, পারমিতা। কেউ অবশ্য তেমন আন্তরিক নয়। চাকরি করার জন্য কাগজে ঢুকেছে। ওরা যদি এই সবিতার মতো হত !

—সবিতা, ভটভটিটা কি রেখে দেব ?

—সবিতার হয়ে উত্তর দিলেন গড়গড়ি, "রেখে আর কী করবেন ? এই দুর্যোগে বাইরে বেরোতে পারবেন ? এখানকার বৃষ্টির মা-বাপ কিছু নেই। শুরু হলে, টানা তিন দিনও চলতে পারে। এই, মাঝিটাকে ভেতরে পাঠিয়ে দে তো।" লোকটা হাতজোড় করে ভেতরে এল। চোখ-মুখে ভয়। দেখে মায়া হল। দারোগা বাবুকে কে না আর ভয় করে। লোকটাকে দেখে গড়গড়ি বললেন, "কার ভটভটি রে ?"

—রসিক মণ্ডলের, স্যার।

পকেট থেকে একশো টাকার একটা নোট বের করে এগিয়ে দিলাম। গড়গড়ির দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে, লোকটা হাতে নিল। তারপর পালিয়ে বাঁচল। গড়গড়ি বললেন, "এই মাঝিগুলি বদমাশ। এরাও চুরি চামারি করে। ভালই হল, আপনারা এবার নিশ্চিন্তে যেতে পারবেন।"

সবিতা নিজের মনে নোট লিখে যাচ্ছে। ওর সামনে একটা ফাইল। আমি ওর

পাশের চেয়ারে বসতেই, গড়গড়ি বললেন, "আরেকটা ঝামেলা মেটাতে হবে। চুপচাপ দেখে যান মশাই, কোন যুগে বাস করছি।" বলেই হাঁক পাড়লেন, "এই, সুধা দাসীকে পাঠিয়ে দে তো।"

কুড়ি-বাইশ বছর বয়সী একটা মেয়ে জড়োসড়ো হয়ে ঘরে ঢুকল পরনে সস্তা ডুরে শাড়ি। বোঝাই যায়, নিম্নবিত্ত পরিবারের। ঘোমটা দিয়ে থাকার জন্য তার মুখটা দেখা যাচ্ছে না। তবে বেশ স্বাস্থ্যবতী, কর্মঠ। একটু আগে এই মেয়েটাকেই বারান্দায় বেঞ্চের উপর বসে থাকতে দেখেছিলাম। ঘরে ঢুকে মেয়েটা দাঁড়াল দেয়াল ঘেঁষে।

গড়গড়ি গর্জন করে বললেন, "এই মাগী, তোকে নিয়ে এত ঝামেলা হচ্ছে কেন রে? একটা মেয়েছেলের ক'টা মরদ থাকে?"

মেয়েটা নিচু গলায় কী একটা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই ধমকে উঠলেন গড়গড়ি, "চোপ। একটা কথা বললে জিভ ছিঁড়ে ফেলব। তোর বাপটা এসেছে? এই নিয়ে আয় তো মাধব দাসকে!" ছোট্টোখাটো চেহারার মাধব দাস এসে দাঁড়াল। গড়গড়ি বললেন, "সত্যি কথা বলবি। নইলে গারদে পুরে রাখব। তোর মেয়ের কটা বিয়ে?"

—হুজুর আমি কিছু জানি না। মেইয়েকে এত করে বুঝালাম। আমার কথা শুনে না। আমার মেইয়ে লষ্ট হয়ে গেছে।

—কার সাথে বিইয়ে দিইছিলি তুই?

—গজালন। সে দুখখু কষ্ট দেয়। মেইয়ে থাকতি পারল না। উঠল গিয়া রাধাপদর ঘরে। আপনি উকে বুঝান।

মেয়েটাকে গড়গড়ি বললেন, "গজানন তোকে মারত-পিটত?"

কথা বলা বারণ। মেয়েটা তাই ঘাড় নাড়ল।

—আইনে দুটো বিয়ে বারণ আছে, জানিস? শোন, যা বিধান দেব, মানবি?

উত্তর দিল, মাধব দাস, "মালবে হুজুর। আমি বলছি।"

—মেয়েকে বল এক হপ্তা গজাননের কাছে থাকবে। পরের হপ্তায় রাধাপদর সঙ্গে। ব্যস, আমি কোনও কথা শুনব না। যা পালা, আর যেন তোদের এখানে না দেখি।

বিচার শুনে মিটিমিটি হাসছে সবিতা। মনে হল, খুব মজা পেয়েছে। ঘর ফাঁকা হওয়ার পর জিজ্ঞাসা করলাম, "এটা কী রায় হল মিঃ গড়গড়ি?"

ওরা মানবে?"

BOIRBOI.NET

—মানবে না মানে? এখানে এই রকমই সব নিয়ম। ব্যাপারটা কী জানেন, বছর সাত-আটেক আগেও মেয়েরা এখানে স্রেফ হাউস ওয়াইফ ছিল। তখন কোনও প্রবলেমও ছিল না। স্বামী অত্যাচার করলেও ওরা মুখ বুজে সহ্য করত। যবে থেকে এই সব অঞ্চলে চিংড়ির চাষ শুরু হয়েছে, তবে থেকেই এই প্রবলেম। মেয়েরা ঘরে বসে না থেকে, রোজগারে নেমে পড়েছে। সারাদিন জলে দাঁড়িয়ে ছোট জাল দিয়ে হাজার পোনা ধরলে, মহাজন দেবে পঞ্চাশ টাকা। মন্দ না, বাই দেয়ার স্ট্যান্ডার্ড। মাসে রোজগার হাজার-দেড় হাজার।

—কিন্তু তার সঙ্গে পলিগ্যামির সম্পর্কটা কী?

—আছে। রোজগার করে বলে এই সব মেয়ে এখন মুখ বুজে থাকে না। স্বামীর

সঙ্গে ঝামেলা হলে, বেরিয়ে গিয়ে ওঠে অন্য পুরুষের ঘরে। একটা বাড়তি বউ মানে বাড়তি রোজগার সংসারে। একেকজনের দু-তিনটে করে স্বামী। দু-তিনটে করে বউ। আইন-আদালত এদের কাছে অনেক দূরের ব্যাপার। থানাই সব। দেখলেন তো কোনও পক্ষ অখুশি হল না।

সবিতা মন দিয়ে সব শুনছিল। ফিসফিস করে আমাকে বলল, "আরে, এটাও তো ভাল সাবজেক্ট। সামাজিক কাঠামোটা কীভাবে ভেঙেচুরে যাচ্ছে সামান্য চিংড়ি চাষের জন্য। এ নিয়েও তো একটা ডকুমেন্টারি করা যেতে পারে।"

ঘাড় নেড়ে বললাম, "হ্যাঁ, করা যেতেই পারে।"

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে প্রচণ্ড চিৎকার, "ও বাবা রে, মেইরে ফেলল রে।"

তাঁর রাজত্বে গড়গড়ি কোনও রকম বিশৃঙ্খলা সহ্য করবেন না। চেয়ার ছেড়ে উঠে, তিনি হুঙ্কার দিলেন, "এই, কোন হারামজাদা রে।" টেবলের উপর মোটা কালো রুল পড়ে আছে। সেটা তুলে নিয়ে গড়গড়ি প্রায় দৌড়েই ঢুকে গেলেন পাশের ঘরে। ফের একটা হুঙ্কার, "চোপ শালা।" সঙ্গে সঙ্গে পুরো থানা যেন শ্মশান। সবিতা আর আমি হেসে ফেললাম। কী জীবন এই সব দারোগার। সব সময় হম্বিতম্বি করতে হবে। না হলে কেউ মানবে না।

সমানে বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। কমার কোনও লক্ষ্মণই নেই। মাঝেমধ্যে বিজলির আলো। আর কড়াৎ কড়াৎ শব্দ। গেটের বাইরে দু'চারজন দাঁড়িয়েছিল। এখন তারা আর কেউ নেই। পাশের ঘরে কার সঙ্গে যেন ওয়ারলেসে কথা বলছেন গড়গড়ি। জণ্ড সর্দারকে নিয়ে। কাল এস পি সাহেব আসছেন। খানা-পিনার আয়োজন করতে হবে। গড়গড়ি তাই জেনে নিচ্ছেন, সাহেব কী ভালবাসেন, কী নয়। কিটব্যাগ থেকে ফ্রেডরিক ফরসাইথের একটা বই বের করে, পড়তে শুরু করল সবিতা। পড়তে পড়তে দাঁত দিয়ে নখ কাটছে। বইয়ের মধ্যে ডুবে গেছে। ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। বুকের মাঝে, সোনার চেনে, সানগ্লাসটা এখনও ঝুলে আছে। সেদিকে চোখ যেতেই আমার সারাটা শরীর শিরশির করে উঠল।

বৃষ্টি যখন ধরল, রাত তখন প্রায় ন'টা। গড়গড়ি কোয়ার্টারে ছিলেন। ডাকতে এলেন। খাবার রেডি। ভাজা ইলিশ আর খিচুড়ি। তাই অমৃত মনে হল। খাওয়া শেষ হওয়ার পর গড়গড়ি বললেন, "অয়নবাবু, আমার এখেনে থাকার জায়গা নেই। যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে একটা কথা বলি।"

—বলুন।

—আমাদের লঞ্চে দু'টো কেবিন আছে। সুন্দর সাজানো। ওখানে যদি ব্যবস্থা করে দিই, তা হলে কি আপনাদের অসুবিধা হবে? আমি কিছু বলার আগেই, সবিতা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল, "গ্রেট। নদীর ওপর কখনও আমি রাত কাটাইনি। ফ্যান্টাসটিক এক্সপিরিয়েন্স হবে। অয়ন, তুমি কিন্তু না করবে না।"

ওর মুখ-চোখ দেখে মনে হল, আমি আপত্তি করলেও সেটা টিকবে না। বাধ্য হয়ে বললাম, "ঠিক আছে। আমার কোনও অসুবিধা নেই।"

যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন গড়গড়ি। বললেন, "চলুন, লঞ্চে বসেই খানিকক্ষণ গল্প করা যাক।"

বৃষ্টি একদম থেমে গেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। গড়গড়ির হাতে টর্চ। রাস্তায়

BOIRBOI.NET

নেমে উনি আলো "জ্বালালেন। তারপর বললেন, "বর্ষার সময় এ অঞ্চলটায় খুব সাপের উৎপাত। সাবধানে পা ফেলবেন মশাই। ছোবল মারলেই শেষ।"

সাপের কথা শুনেই সবিতা আমার একটা হাত জড়িয়ে ধরল। গড়গড়ি আগে আগে যাচ্ছেন। রাস্তার দিকে তাকিয়ে আমরা দু'জন পা ফেলছি। সবিতা আরও সরে এসে আমার গা ঘেঁষে হাঁটছে। ওর বুকের নরম অংশ আমার বা কনুইয়ে লেপ্টে রয়েছে। হঠাৎ শরীরে অস্বস্তি হতে শুরু করল। বাঁ হাত দিয়ে ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরলাম। তারপর কাছে টানলাম। এমনভাবে আমি কোনওদিন কোনও মেয়ের সঙ্গে হাঁটিনি।

ঘাটের সঙ্গেই পুলিশের সেই বিরাট লঞ্চ। উপরের ডেক-এ খান চারেক চেয়ার পাতা। আগেরবার ওই চেয়ারে বসেই মাতলা নদী পেরিয়ে ছিলাম। নীচের ডেক-এ নামিনি। সারেং বলেছিলেন অবশ্য, নীচে গিয়ে কেবিনে বিশ্রাম নিতে। আজ সেখানেই শুতে হবে। কাঠের পাটাতনের উপর দিয়ে হেঁটে লঞ্চে উঠলাম। উপরের ডেক-এ চেয়ারে বসে তিনজনে মিলে গল্প শুরু করলাম। গড়গড়ি জলদস্যুদের নানা ঘটনা বলতে লাগলেন। আমি আর সবিতা মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলাম। দূরে গ্রামে দু'একটা বাড়িতে লম্ফ জ্বলছে। চারদিক নির্জন। শুধু জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। আকাশ পরিষ্কার। তারাগুলো ঝলমল করছে। রাতের আকাশ যে এত সুন্দর, কলকাতায় বসে কোনওদিন তা টের পাইনি।

ঘণ্টাখানেক গল্প করে গড়গড়ি লঞ্চ থেকে নেমে গেলেন। তারপরও আমরা দু'জন উপরের ডেক-এ চুপচাপ বসে রইলাম। তারার আলোয় আবছা প্রোফাইল দেখতে পাচ্ছি সবিতার। ওর চুল উড়ছে। ওর দিকে তাকিয়ে হঠাৎই এক ধরনের অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করলাম। লঞ্চ ঘাটে আসার সময় সেই স্পর্শানুভূতি সারা শরীরের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে গেল। নিজেকে সামলাবার জন্যই উঠে গিয়ে রেলিংয়ের কাছে দাঁড়ালাম। পরমার বিয়ের খবরটা শোনার পর থেকে, লক্ষ করছি, আমার মধ্যে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন হয়েছে। আগে মেয়েদের শরীরের দিকে তাকাতে পারতাম না। এখন স্বচ্ছন্দে তাকিয়ে থাকছি। মনে বিচ্ছিরি সব ইচ্ছে জাগছে। শিলাজিতের বাড়িতে কৃষ্ণাকে দেখার পর, দু'একদিন ওকে নিয়ে খুব ভেবেছিলাম। আজ সবিতা সেই ইচ্ছেটা উস্কে দিয়েছে। সারা দিনে, এই নিয়ে তিনবার। পরমার প্রতি আমার এখন কোনও দায়বদ্ধতা নেই। আমি যা ইচ্ছে তা করতে পারি।

ডেক-এর রেলিং ধরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলাম। নদীর পাড়ে সুন্দরী গাছের জঙ্গল। ঝিঁ ঝিঁ পোকা আর ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে। আর দেখতে পাচ্ছি, জোনাকির দপদপানি। এ সব অঞ্চলে বাঘ নেই। তবে জলে কুমির আছে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে প্রশান্তিতে মন ভরে গেল। কলকাতায় কয়েকটা দিন, পরমার চিন্তায় হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। কখনও রাগ হচ্ছিল। কখনও আবার ক্ষমা করে দিচ্ছিলাম। জীবনের দৌড় অনেক লম্বা। তাতে কখনও হার, কখনও জিত। একটা সময় ভেবেওছিলাম, পরমাকে দেখিয়ে দিতে হবে, আমি হারিনি। তেমন হলে, ওর বিয়ের আসরেও যাব। হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকব। দেখিয়ে দেব, অয়ন ব্যানার্জির বুকটা অনেক চওড়া। প্রত্যাখানে তার কিছুই হয়নি।

আকাশে হঠাৎ আবার মেঘ জমছে। গুড়গুড় শব্দ হচ্ছে। সারা আকাশ চিরে

বিজলি ঝিলিক দিয়ে উঠল। আবার তাণ্ডব শুরু করার আভাষ দিচ্ছে বৃষ্টি। বাতাসে লঞ্চটা একবার দুলে উঠল।

—অয়ন।

ডাক শুনে ঘুরে তাকালাম, সবিতা! ফ্যাকাশে মুখে উঠে এসেছে চেয়ার ছেড়ে।

—কী হল?

—আমার খুব ভয় করছে।

ওর হাত ধরে বললাম, "ভয় নেই সবিতা। আমি আছি।" বলেই দু'হাত দিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে কাছে টানলাম। দু'টি দেহ-মিশে গেল। সবিতা নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টাই করল না। উল্টে, আমার বুকে মাথা রাখল। তারপর দু'হাত দিয়ে আমার পিঠ জড়িয়ে, আত্মনিবেদনের ভঙ্গিতে মুখটা তুলে ধরল। আমার সারা শরীরে আগুন ছড়িয়ে গেল। ওর ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিলাম। আমার শিক্ষাদীক্ষা, রুচি—সব নদীর জলে ধুয়ে যাচ্ছে। সবিতাকে কোলে তুলে নিতে নিতে, ফিসফিস করে শুধু বললাম, "চলো, কেবিনে চলো।"

॥ সাত ॥

সুন্দরবনে আমি অনেক কিছু ফেলে এলাম। আঠাশ বছরের আমাকে। আমার সব ভালত্ব-কে। পাঁচ দিন পর তাজ বেঙ্গলে ফিরে বুঝতে পারলাম, আমি এখন অন্য মানুষ। সন্ধ্যা তখন সাতটা। বেরিয়ে আসার জন্য পা বাড়াতেই, সবিতা হাত ধরে টানল, "আজ রাতটা এখানেই থেকে যাও না অয়ন। তোমার তো কোনও পিছুটান নেই।"

আমি হাসলাম। থাকলে আমার কোনও অসুবিধে নেই। গত সাতটা দিন খুব সুন্দর কেটেছে। দ্বিতীয় দিন সকাল সাড়ে ন'টার সময় কুলতলিতে হাজির হয়েছিল সুজয়। ভিডিও ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে। জগু সর্দার দারুন ইন্টারভিউ দিয়েছে। প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক ধরে। গড়গড়ি হেল্প না করলে সম্ভবই হত না। পুলিশের বড় কর্তারা পৌঁছলেন সেদিন বেলা দেড়টা নাগাদ। সুজয় ফিরে এসেছিল ওঁদেরই সঙ্গে। পরদিন আবার ও কুলতলিতে যায়। মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। সুজয়কে একবার ফোন করতে হবে। ক্যাসেটটার জন্য। কাল সকালের প্লেনে ক্যাসেট নিয়ে দিল্লি চলে যাবে সবিতা। বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়লাম। তারপর বললাম, "চলো, লেক ক্লাবে যাবে? ওখানেই ডিনার করে নেওয়া যাক।"

সবিতা বলল, "কোথাও যাব না। এই ঘরেই মুখোমুখি বসে আমরা ডিনার করব।"

—অ্যাজ ইউ উইশ।

—তুমি বরং একটু কফির অর্ডার দাও। আমি স্নান করে আসি। এ ক'দিনে মুখটা যেন ঝলসে গেছে।

—ক্ষতি হয়নি। তোমাকে আরও সেক্সি দেখাচ্ছে।

—ইউ নটি বয়। বলেই অ্যাটাচড বাথরুমে ঢুকে গেল সবিতা। ওকে এই এক

সপ্তাহ আগেও আমি চিনতাম না। এখন যে কেউ দেখলে বলবে, যেন অনেক দিনের সম্পর্ক। সত্যি বলতে কী, গত কয়েকটা দিন আমার, বাড়ির কথা মনেও পড়েনি। সবিতা এমনভাবে আমার সারা মন অধিকার করে ছিল। এ ক'দিনে ওর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখলাম। এক নম্বর, সাংবাদিকতায় পেশাদারিত্ব। কাজের সময় কাজ, কাজ আর কাজ। আর দু'নম্বর, রিল্যাক্সেশন। এই পর্বে, সবিতা আমাকে শিখিয়ে দিল, পুরুষ হতে।

কাল রাতে রায়দিঘির ইরিগেশন বাংলোর একটা ঘরে পাশাপাশি শুয়ে থাকার সময় হঠাৎ সবিতা আমাকে বলল, "অয়ন, কলকাতায় থেকে নিজেকে তুমি নষ্ট করছ কেন ? দিল্লিতে যাবে ? তোমার চাকরির অভাব হবে না। আমার কাছেই এখন দুটো অফার আছে। তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারো।"

তার আগে আমরা দু'জন, শরীর থেকে সুখ আদায় করে নিয়েছি। চোখ বুজেই বললাম, "একটা অপরিচিত জায়গায় গিয়ে সেটল করা, এই বয়সে, মুসকিল।"

—আমি আছি, হেল্প করব।

—না গো, আর ইচ্ছেই হয় না। আমি শেষ হয়ে গেছি।

—এই, সেন্টিমেন্টাল কথা বলো না তো। বি প্র্যাক্টিক্যাল। প্রফেশনাল।

—ভেবে দেখি।

—শোনো অয়ন, আমাদের প্রফেশনে, একটা জায়গায় খুব বেশি-দিন থাকতে নেই। থাকলেই তোমার মার্কেট ভ্যালু কমে যাবে। দিল্লিতে জার্নালিস্টরা কনস্টান্ট হাউস চেঞ্জ করে। দেখবে, খুব অল্প বয়সেই তারা ইম্পরট্যান্ট সব পোস্ট পেয়ে যায়।

—এখানে স্কোপ কম সবিতা।

—আবার তুমি এক কথা বলছ। মার্কেটটা শুধু এখানে সীমাবদ্ধ নেই। যে কাজ জানে, তার মার্কেট বিরাট। আর এখন প্রিন্ট মিডিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে এগিয়ে আসছে ইলেকট্রনিক মিডিয়া। কত টিভি কোম্পানি তৈরি হয়ে গেছে। ট্রাই ইওর লাক দেয়ার।

সবিতার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমার কেডিয়ার কথা মনে পড়ল। মুসকিল হচ্ছে, এই সব টিভি কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হওয়া মানে ঝুঁকি নেওয়া। যে কোনওদিন উঠে যেতে পারে। তবু, সবিতা যা বলছে, যুক্তি আছে। দৈনিক প্রভাত কাগজে আমার অভিজ্ঞতা তো তা-ই বলছে। ওরা ধরেই নিয়েছে, আমাদের আর কোনও গতি নেই। অন্য কোথায় যাওয়ার জায়গা নেই।

—ইটস আ গেম, অয়ন। দক্ষ প্লেয়ারের মতো তোমাকে খেলতে হবে। হেজিটেট করো না।

...বাথরুমের দরজায় নব ঘোরানোর শব্দ হল। সবিতা পোশাক পাল্টে নিয়েছে। পরনে হালকা সবুজ তাঁতের শাড়ি। স্লিভলেস ব্লাউজ। ওর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে এই প্রথম দেখলাম। শাড়িতে। একেক জন মেয়ে আছে, যাকে সব পোশাকেই সুন্দর দেখায়। সবিতা সেই রকমই একটা মেয়ে। ঘরে ঢুকেই ও জিজ্ঞাসা করল, "এ্যাই, কফির অর্ডার দিয়েছ ?"

—ছিঃ ছি, একদম ভুলে গেছি।

—কার কথা ভাবছিলে চোখ বুজে ? বাড়ির ?

—না, তোমার।

—সত্যি, ফিরে গিয়ে আমারও খুব মনে পড়বে তোমার কথা। আমাদের টিমটা যখন শুটিং করতে আসবে, তখন আসতে পারব কি না, জানি না। তুমি কিন্তু ওদের সঙ্গে থেকো।

—তুমি বললে, থাকব।

—ফোন করে দেখব ?

—এই, সুজয় ছেলেটা তো ক্যাসেট নিয়ে এখনও এল না ?

—দেখো, ততক্ষণে আমি কফি বলে দিই। বিছানার পাশেই টেলিফোন। সবিতা বিছানায় এসে বসল। আমার খুব কাছে। কাত হয়ে শুয়ে ওকে দেখতে লাগলাম। ওর শরীর থেকে সুগন্ধি ভেসে আসছে। ঘাড়ের কাছে কুন্তল। চুলে একটা বাহারি ক্লিপ। পিঠটা ভরাট। ব্লাউজ এবং শাড়ির মাঝে, শরীরের উন্মুক্ত অংশে বড় একটা খাঁজ। তাতে একটা তিল। ওই খাঁজটাই আমাকে ঈষৎ উত্তেজিত করল। অপেক্ষায় ছিলাম, ফোনে অর্ডার দিয়ে সবিতা রিসিভারটা ক্রেডলে রাখার পরই ওকে কাছে টানলাম। আঁতকে উঠে ও বলল, "এখন না, এখন না, আগে ফ্রেশ হয়ে এসো।"

হতাশ হওয়ার ভঙ্গিতে আবার আমি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। হাই উঠল। শরীরটা খুব টায়ার্ড। ভাল করে স্নান করলেই ফের তাজা হয়ে যাবে। ভাবতেই খুব অবাক লাগছে। কলকাতায় আছি, অথচ বাড়িতে নেই। এমন কখনও হয়নি। এই তাজ বেঙ্গলে বহু দিন এসেছি। কখনও প্রেস কনফারেন্স করতে। কখনও কারও সঙ্গে দেখা করার জন্য। কখনও রাত্রি বাস করিনি। সবিতার ইচ্ছেয় সেটাও হয়ে গেল। সুজয়কে একটা ফোন করা দরকার ভেবে, রিসিভারটা হাতে নিলাম। সাতটা-সাড়ে সাতটার সময় ওকে পাওয়া যায়, চেতলার স্টুডিওতে। সেখানকার নম্বরেই ডায়াল করলাম। ও প্রান্তে ফোনটা ধরল মিহির। সুজয়ের ডান হাত। জিজ্ঞেস করলাম, "সুজয় নেই।"

—দাদা, একটু বেরিয়েছে।

—কখন ফিরবে ?

—বলে যায়নি। বৌদিও সঙ্গে গেছে।

—শোনো মিহির, সুন্দরবনের সেই ক্যাসেটটা কি তৈরি হয়েছে ? আজ রাতেই ওর দেওয়ার কথা।

BOIRBOI.NET

—ক্যাসেটটা দাদা সঙ্গে নিয়েই গেছে।

—ও কি, তাজ বেঙ্গলে আসার জন্য বেরিয়েছে ?

—ঠিক বলতে পারছি না অয়নদা।

—ঠিক আছে, ফিরলে বোলো আমি ফোন করেছি। ১০১১ নম্বর ঘরে আছি। মিসেস মেমন কাল ভোরেই দিল্লি চলে যাবেন।

—ক্যাসেটটা এডিট করার সময় আমি দেখেছি অয়নদা। খুব ভাল হয়েছে। দেখবেন, খুব পছন্দ হবে।

—দেখি।

বলেই ফোনটা ছেড়ে দিলাম। ফের হাই উঠল। সঙ্গে সঙ্গে, উঠে পড়লাম।

ভাল করে স্নান করতে হবে। এ ক'দিন, সত্যি বলতে কী, ভাল করে স্নান করতে পারিনি। কখনও লঞ্চে, কখনও সার্কিট হাউস, কখনও ইরিগেশন বাংলোয় রাত কাটিয়েছি। স্নান করার সেই স্বাচ্ছন্দ্যটা পাইনি। সুন্দরবনে এত নদ-নদী খাল-বিল, অথচ তাতে স্নান করা যায় না। একে কুমির কামোঠের ভয়, অন্য দিকে নোনা জল। মাত্র একদিনই একটা মিঠে জলের নদীতে স্নান করেছিলাম। সবিতার সঙ্গে সেই দিনটা খুব সুন্দর কেটেছিল। বাথরুমে ঢুকে আয়নায় দেখলাম মুখটা সামান্য ঝলসে গেছে। রোদে সারাদিন ঘোরাঘুরির ফল। নোনা বাতাস মুখে লাগায় এই অবস্থা। কলকাতায় দু'চার দিন কাটালেই, রঙ ফের স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

শাওয়ারের নীচে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। সবিতা ফ্রেশ হয়ে যেতে বলেছে। গত সাতটা দিন ও আমি স্বামী-স্ত্রীর মতোই কাটিয়েছি। ভাবতেই অবাক লাগছে। বাপী, বড়বৌদি, বুবুন জানতে পারলে আমার সম্পর্কে কী ভাববে ? ওদের বুবলু, অয়ন খুব খারাপ হয়ে গেছে। ভাবুক। ভাল ছেলে হয়ে তো অনেকদিন রইলাম। লাভটা কী হল ?

পরমার মতো মেয়েও সম্পর্ক ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল।

পরমার বিয়েটা কি হয়ে গেছে ? জানি না। হলে কেউ না কেউ আমাকে বলত। বাড়িতে তার আঁচ পেতাম। সুন্দরবনে গিয়ে সুজয় নিশ্চয় কোনও না কোনওভাবে বলে দিত। আমাদের সম্পর্কটা এক সময় কী ছিল, ও জানে। প্রথম প্রথম আমাদের মনোমালিন্যে ও মধ্যস্থতাও করেছে। তবে প্রকাশ্যে নয়। একটু আড়ালে থেকে। কোনও কোনও সময়, আমাকে বাঁচাতে সুজয় নিজের ঘাড়েও দোষ নিয়েছে। এই মাস খানেক আগে, ও একবার কথায় কথায় বলেছিল, "বস, পরমাদির সঙ্গে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিন না।" আমি দাবড়ে থামিয়ে দিয়েছিলাম, "সুজয়, দালালি করবি না।"

স্নান করতে করতে হঠাৎই পরমার মুখটা মনে পড়ে গেল। সেদিন ডাইনিং টেবলে এসে বসার আগে উজ্জ্বল সেই মুখটা। বড়দার বিয়ের মাস দুয়েক পর ও আমাকে একটা সারপ্রাইজ দিয়েছিল। হঠাৎই একদিন সকালে ফোন করে বলেছিল, "আজ একবার আমাদের বাড়িতে আসবে ?"

এই ফোনটা ও করে, হাতের মুঠোয় চিরকুট গুঁজে দেওয়ার কয়েকটা দিন পরে। অবাক হয়ে আমি বলেছিলাম, "হঠাৎ তলব ?"

—দরকার আছে। তবে সুপ্রিয়াদি যেন জানতে না পারে।

ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেছিল। বড়বৌদির আত্মীয়ের বাড়ি যাব। অথচ তাঁকে না জানিয়ে ? পরে জানাজানি হবেই। তখন বড়বৌদি কী ভাববে আমার সম্পর্কে ? জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "কোনও দরকার আছে ?"

—ভীষণ। যদি বলি, তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

বুকের ভেতরটায় হঠাৎ কেঁপে উঠেছিল। বলেছিলাম, "কখন যেতে হবে ?"

—যখন ইচ্ছে। ভয় করছে নাকি বুবলু সোনার ? বলেই খিলখিল করে হেসে উঠেছিল পরমা।

সেদিন গিয়েছিলাম। বিকেলের দিকে লেক গার্ডেন্সে যখন পৌঁছলাম, তখন দেখি দোতলার বারান্দায় বসে ও আমারই অপেক্ষা করছে। দ্রুত পায়ে নেমে এসেছিল নীচে। লেক গার্ডেন্সে ছোট্ট ত্রিকোণ পার্কের পাশে পরমাদের বাড়ি। সামনের কিছুটা

অংশে বাগান। পরমার বাবা স্টেট ব্যাঙ্কের বড় অফিসার ছিলেন। চাকরি ছেড়ে দিয়ে উনি এক্সপোর্টের ব্যবসা শুরু করেন। এখন সেই ব্যবসা বিরাট হয়ে গেছে। পরমার কাকাও ব্যাঙ্ক অফিসার, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের। এখন দিল্লিতে থাকেন। দীর্ঘদিন বাংলার বাইরে থেকে, ব্যবসা শুরু করার বছরখানেক পর কলকাতায় ফিরে এসে এই বাড়িটা তৈরি করেন পরমার বাবা।

বাড়িতে আর কাউকে চোখে না পড়ায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তোমার মা-কে তো দেখছি না।

—নেই।

—বাবা ?

—তিনিও নেই।

—ওরা কোথায় গেছেন ?

—দিল্লি থেকে কাকা এসেছেন। দেখা করতে গেছেন শ্যামবাজার নামক জায়গায়, আমাদের পৈতৃক বাড়িতে।

—কখন ফিরবেন ?

—যে কোনও মুহূর্তে।

—তুমি গেলে না কেন ?

—তোমার জন্য। তোমাকে একটা জিনিস দেওয়ার জন্য।

—পরমা, তোমার বাবা-মা বাড়িতে নেই। এই সময় আমাকে ডাকা তোমার উচিত হয়নি।

মুহূর্তে সিরিয়াস হয়ে গেছিল পরমা। বলেছিল, "অয়নদা, আমার উপর ওদের আস্থা আছে। ওরা খুব খুশিই হবেন তোমাকে দেখলে। ইন ফ্যাক্ট, মা তোমাকে নিজেই ফোন করত, এখানে এসে আমার সঙ্গে গল্প করার জন্য। বাড়িতে অবশ্য আরও দু'জন প্রাণী আছেন। বিভা আর রবিকাকা। এখুনি বিভা উদয় হবে চা নিয়ে।"

—আই অ্যাম সরি রমা। কিছু মনে করোনি তো ?

—কী বলে ডাকলে তুমি অয়নদা ?

—কেন, রমা।

—বাঃ চমৎকার তো। আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে এ নামে ডাকেনি।

—আমি পেটেন্ট করে রাখলাম।

—বাঃ, এই তো কথা ফুটেছে বুবলু সোনার।

—এই, বুবলু নামে আমাকে তুমি ডাকবে না। মা আমাকে ওই নামে ডাকত।

—মাকে তোমার মনে পড়ে ?

—কম। খুব কম। তখন আমি ছোট।

—ইস, ওনাকে আমি দেখতে পেলাম না। আমার মা কিন্তু তোমার কথা খুব বলে। জানো, আমার এক দাদা ছিল। বেঁচে থাকলে তোমার বয়সী হত। তোমাকে দেখলে, মায়ের নাকি দাদার কথা মনে পড়ে।

সোফায় মুখোমুখি বসে, সেদিন আমরা গল্প করেছিলাম। অনেকক্ষণ ধরে। পরীক্ষা দিয়ে দিন পনেরোর জন্য দিল্লিতে বেড়াতে গেছিল ওরা। পরমা কাকার গল্প,

দিল্লি শহরের গল্প করতে করতে হঠাৎ বলেছিল, "জানো অয়নদা, বেড়াতে গিয়ে আমার কিন্তু একটুও ভাল লাগেনি।"

—কেন ?

—তোমার কথা খুব মনে হচ্ছিল। আমাদের থাকার কথা ছিল এক মাস। এক সপ্তাহেই হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। বাবাকে বললাম, আমাকে তোমরা নিয়ে চলো। ভাল লাগছে না। সুপ্রিয়াদির বাড়ি গিয়ে ক'দিন আমি থাকব।

—তোমার বাবা রাজি হলেন ?

—হবেন না মানে ? বাবা আমার কোনও কথায় না করে না। কাকুর সামনেই বাবা একদিন বলে ফেলল, আসলে সুপ্রিয়া না, ওর মন খারাপ অয়ন ব্যানার্জির জন্য।

চমকে উঠে বলেছিলাম, "যাঃ, তোমার বাবা এই কথাটা বলল ?"

—হ্যাঁ। এত অবাক হচ্ছ কেন ? চলো অয়নদা, আমার ঘরে চলো। তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।

পরমার পিছন পিছন দোতলায় উঠে গেছিলাম। চমৎকার সাজানো-গোছানো ওর ঘর। পড়ার টেবল, বইয়ের আলমারি। ডিভানে সুন্দর চাদর। একদম আমার মতো অগোছালো নয়। ওর পড়ার টেবলে চোখ পড়তেই থমকে গেছিলাম। ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবি—ওর আর আমার। পেল কোত্থেকে ? ভেবেই পেলাম না। মেয়েটার লজ্জা বলে কি কোনও বস্তু নেই ! হাত বাড়িয়ে ছবিটা তুলে বললাম, "এই ছবিটা.... পরমা, কী ব্যাপার ?

—অবাক হচ্ছ কেন, এটা সেই বিয়ের দিন তোলা।

—এভাবে রেখেছ, তোমার বাবা-মা, ওরা রাগ করবেন না ?

—ওরা জানলে তো। একজন ছাড়া, এ ছবির কথা কেউ জানেও না।

—মাই গড। কে সে ?

—সুপ্রিয়াদি। তোমার বড়বৌদি।

—তুমি দেখিয়েছ ?

—হ্যাঁ। আসলে, ওর কাছ থেকে তোমাকে আমি চেয়ে নিয়েছি।

উফ্, সেদিনই বুঝেছিলাম, কী ডেঞ্জারাস মেয়ে পরমা। কী যেন বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় খাবারের প্লেট হাতে উঠে এসেছিল বিভা। তা দেখে, সঙ্গে সঙ্গে ওই ছবিটা ড্রয়ারের ভেতর চালান করে দিয়েছিল পরমা।

....বাথরুমের দরজায় টকটক শব্দ। শুনে বন্ধ করলাম শাওয়ারটা। সবিতার গলা, "তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসো অয়ন। তোমার জন্য আমি কফি ঢালতে পারছি না।"

বললাম, "আসছি।"

—কী করছ এতক্ষণ ধরে ? ঘুমোচ্ছিলে নাকি ?

—না, চান করতে করতে স্বপ্ন দেখছিলাম।

সত্যি কথাটাই বলে ফেললাম। স্বপ্নের মতো ছিল সেই সব দিনগুলো। পরমার আমার জীবনের প্রথম প্রেম। প্রতিটা ঘটনা, প্রতিটা কথা, প্রতিটা মুহূর্তের কথা, ইচ্ছে করলে আমি মনে করতে পারি। সে দিন খুব যত্ন করে আমাকে খাইয়েছিল পরমা। আমি চলে আসার আগে, একটা প্যাকেট হাতে দিয়ে বলেছিল, "অয়নদা, প্লিজ এখানে

খুলো না। বাড়িতে ফিরে একা একা দেখো।"

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে খুব কৌতূহল হয়েছিল আমার। ভেবেছিলাম, কোনও বই। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে, নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে, প্যাকেটটা খুলে দেখি, ল্যামিনেট করা সেই ছবিটা, যা একটু আগে আমি দেখে এসেছিলাম ওর ঘরে। ছবির সঙ্গে ভাঁজ করা একটা কাগজও ছিল। তাতে লেখা, "যাতে ছিঁড়ে না ফেলো, সেজন্য ল্যামিনেট করে দিলাম। একটা কপি আমার কাছে রইল। সারা জীবন কাছে রাখব।

—ইতি, রমা।"

সেদিনই গল্প করার ফাঁকে কথায় কথায় আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "রেজাল্ট বেরোবার পর তুমি কী করবে, রমা?"

—বাবার ইচ্ছে, আমি ডাক্তার হই।

—তোমার কী ইচ্ছে?

—ডাক্তার হয়ে লাভ নেই। সারাটা দিন তা হলে ব্যস্ত থাকতে হবে। ভবিষ্যতে তোমার জন্য সময় দিতে পারব না। অনেক ভেবেই, এই ডিসিশনটা নিলাম। ম্যাথমেটিক্সে অনার্স নিয়ে পড়ব। তুমি কী বলো? অবশ্য এখনও দু'বছর ভাবার সময় আছে। আগে এইচ এস-টা তো পেরোই।

—ম্যাথসে অনার্স নেবে?

—হ্যাঁ। বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়ব। বাবার বিজনেস সামলাবেটাকে? তুমি কী করবে অয়নদা?

—জার্নালিজম।

—কখনও না। লাইনটা খুব বাজে। জার্নালিস্টরা কেউ ভাল হয় না। পাশের বাড়িতে বেঙ্গল টাইমসের এক রিপোর্টার থাকেন। রোজ মদ খেয়ে ফেরেন। সময়ের কোনও ঠিক নেই। সোসাল লাইফ বলতে কিছু নেই।

—ধ্যাৎ। সব জার্নালিস্ট কী সমান হয় নাকি?

—দেখো অয়নদা, আমি বলছি, তুমি ওই প্রফেশনে যাবে না। তুমি লন্ডনে গিয়ে এম বি এ করবে। সুপ্রিয়াদিকে আমি বলে রেখেছি।

ওকে রাগাবার জন্যই বলেছিলাম, "মামদোবাজি নাকি। আমি ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়েই খবরের কাগজের অফিসে ঢুকব। ক্রাইম রিপোর্টিং করব। তুমি বললেই আমি সব শুনব নাকি?"

—দেখো, শুনতে বাধ্য হও কি না। না শুনলে কী হয়।

—কী করবে?

—সেটা তখন টের পাবে। আমার জেদ তো কখনও দেখোনি। মা আর বাবা জানে সেটা।

কিছু দিনের মধ্যেই অবশ্য টের পেয়েছিলাম, পরমা কেমন জেদি মেয়ে। একটা সময় তো আমার উপর পুরো অধিকার কায়েম করে নিয়েছিল। রোজ রোজ খবরদারি। এটা কোরো না। ওটা করো না। অমার কিন্তু খারাপ লাগত না। দু'বাড়ির সবাই ধরে নিয়েছিল, আমাদের সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে। বড়বৌদিও মাঝেমধ্যে বলে ফেলত, "অয়ন, এই যে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে তুমি রোজ বাপীর সঙ্গে টলি ক্লাবে গলফ খেলতে যাচ্ছ, রমা জানে? ও শুনলে কিন্তু রাগারাগি

BOIRBOI.NET

করবে।" অথবা কখনও বলত, "জ্যোতির সঙ্গে আড্ডা মেরে সকালটা নষ্ট করলে, রমা কিন্তু ফোনে সব জেনে গেছে। তুমি প্রচণ্ড বকুনি খাবে।" শুধু বড়বৌদিই নয়, বড়দা-মেজদাও পরমাকে খানিকটা সমীহ করে চলত। মেজদা খুব বাস্তববাদী লোক। একদিন তো বলেই ফেলেছিল, "এই মেয়েটার মধ্যে অনেক কোয়ালিটি আছে। অয়নের জন্য সব নষ্ট করবে।" এখন ভাবলে, সে সব কথা কেমন যেন স্বপ্নের মতো মনে হয়।

....স্নান করে বেরিয়ে আসতেই সবিতা আমার দিকে তাকিয়ে একবার হাসল। তারপর পট থেকে কফি ঢালতে শুরু করল। বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, "হাসলে কেন ?"

—পাঞ্জাবিটা উল্টো করে পরেছ।

এটা প্রায়ই হয় আমার। সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেললাম। তারপর সোজা করে পরে সোফায় বসে বললাম, "সুজয়টা এখনও এল না। আমার কিন্তু ওর ওপর বেশ রাগ হচ্ছে।"

—সুজয় তো এসেছিল। মাস্টার ক্যাসেটটা দিয়ে গেছে। দিয়েই তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল। বউকে কোন এক ডিনার পার্টিতে নিয়ে যাবে।

—আর কিছু বলল ?

—তেমন কিছু না। বলল, রাতে তোমাকে বাড়িতে ফোন করবে। এই ছেলেটা খুব প্রফেশনাল।

—হ্যাঁ। তোমার মতোই।

হাসল সবিতা। তারপর কফির কাপটা এগিয়ে দিল। গত পাঁচ দিনে ওর কাজ করার স্টাইল আমার খুব ভাল লেগেছে। বিদেশি জার্নালিস্টদের সঙ্গে কাজ করে করে ও খুব অভিজ্ঞ হয়ে গেছে। প্রায় আমারই সমান বয়স। অথচ প্রফেশনে কত এগিয়ে আমার থেকে।

কফিতে চুমুক দিয়ে সবিতা হঠাৎ বলল, "আমাদের কোম্পানিতে লুই জিদানে বলে একজন জার্নালিস্ট আছে, তার কাছে এক মাস কাজ করলে তুমি একেবারে পাল্টে যেতে। লোকটাকে সি এন এন অফার দিয়েছিল। ফ্যাবুলাস টাকার। গেল না। আসলে আমাদের কোম্পানিই ওকে ছাড়ল না। যুগোশ্লাভিয়ার সিভিল ওয়ার-এর সময় জিদানে এমন সব প্রোগ্রাম করেছিল, সি এন এন প্রচণ্ড মার খায়। লোকটার অসম্ভব সাহস। না দেখলে তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না, কী ধরনের জার্নালিস্ট।"

—আমার খুব ইচ্ছে করে, এ সব লোকের কাছে ট্রেনিং নিই।

—যাবে তুমি প্যারিস ? আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তার আগে তোমাকে ঠিক করতে হবে, প্রিন্ট মিডিয়ায় থাকবে, না জয়েন করবে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়।

—আমাকে দিয়ে কি হবে ?

—কেন হবে না ? দেখো, অনেক খোলা মনে তুমি কাজ করতে পারবে।

—আচ্ছা, আমাকে তুমি একটু ভাবতে দাও।

—ভাবো। আমাকে তা হলে জানিও।

—সত্যি কথা বলতে কী, আমি আর খবরের কাগজের নোংরামির মধ্যে থাকতে চাই না। হাঁফিয়ে উঠেছি। চারপাশে সব আনপ্রফেশনাল লোক। ভাল কিছু করতে

দেবে না তোমায়।

—তুমি এত ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেছ কেন অয়ন ?

—পরিস্থিতির চাপে। জানো, কিছুদিন আগে একটা খবর পেলাম, বিনা বিচারে অজয় মিত্র বলে একজন লোককে প্রেসিডেন্সি জেলে আটকে রাখা হয়েছে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর। খবরটা করলাম। একটা লাইনও বেরোল না। পরের দিন ওই খবরটাই স্টেটসম্যান করল প্রথম পাতায় পাঁচ কলম জুড়ে। তখন আমার উপর হম্বিতম্বি। খবরটা কেন তুমি করতে পারলে না। বললাম, আমি তো করেছিলাম। না বেরোলে, কী করব ? তখন কী বলা হল, জানো ?

—কী ?

—খবরটা যে এত ইম্পরট্যান্ট সেটা তুমি বোঝাতে পারোনি কেন ?

কথাটা শুনে সবিতা হাসতে লাগল। তারপর অবিশ্বাসী গলায় বলল, "যাঃ, এমন হয় নাকি ? তুমি বানিয়ে বলছ।"

—একটা বিন্দুও বানিয়ে বলছি না। জানো, একবার....চন্দননগর থেকে এক জন ফ্রি ল্যান্স ফটোগ্রাফার এল একটা ছবি নিয়ে। একটা কুকুর মুখে করে নিয়ে যাচ্ছে সদ্যোজাত এক বাচ্চাকে। হাসপাতাল চত্বর দিয়ে। ছবিটা এক্সক্লুটিভ। নিজের পয়সা আর সময় খরচ করে ছেলেটা এতদূর এল। কিন্তু তাকে কী ট্রিটমেন্ট করা হল, জানো ?

—ঢুকতে দেওয়া হয়নি বুঝি।

—না। তা নয়। জোচ্চোর বলে তাড়িয়ে দেওয়া হল। ছবিটা নাকি সাজিয়ে তোলা। পরদিন আনন্দবাজার ফ্রন্ট পেজ স্টোরি করল ছবিশুদ্ধ। বিরাট হইচই হয়ে গেল। হেলথ্ মিনিস্টার রিজাইন করতে বাধ্য হলেন। কেন না, ঘটনাটা ঘটেছিল সরকারি হাসপাতালে। বাচ্চাটার মা-বাবা এক কোটি টাকার মামলা করেছে সরকারের বিরুদ্ধে।

—তোমাদের এখানে এমন ঘটনাও ঘটে নাকি ? সত্যি, সেদিন কুলতলি থেকে তুমি যখন তোমার অফিসে ফোন করছিলে, তখন লক্ষ করছিলাম—লাইনটা তিনবার হাত বদল হল। ভাবাই যায় না। সিম্পল ব্যাপার, লাইনটা কানেক্ট করে দেবে একটা রেকর্ডারে। তুমি তোমার সব তথ্য মুখে বলে দেবে। সব রেকর্ড হয়ে যাবে। আর পরে একজন সাব এডিটর সেই রিপোর্ট তৈরি করে ফেলবে। আচ্ছা, জগু সর্দারের অ্যারেস্ট হওয়ার খবর কী রকম ট্রিটমেন্ট করল তোমাদের কাগজ ?

—ছাপেইনি।

"সে কী।" উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ল সবিতা। তারপর বলল, "নো, দিস ইজ আটারলি ননসেন্স। এই ব্যাপারটা নিয়ে তোমার ফাইট করা উচিত।"

—কে শুনবে ?

—তার মানে ? নিউজ এডিটরকে বলবে। তিনি না শুনলে, তার উপরের লোকটাকে জানাবার চেষ্টা করবে। জানো, দিল্লিতে আমি ছোট একটা কাগজের চাকরি ছাড়লাম কেন ? জয়েন করেছিলাম বিজনেস ডেস্কে। প্রথম দিন একটা প্রেস কনফারেন্স করতে গেছি একটা বড় বিজনেস হাউসের। কনফারেন্স হয়ে যাওয়ার পর দেখি, সবাইকে ওরা একটা করে প্যাকেট দিচ্ছেন। অন্য রিপোর্টারদের নিতে দেখে

আমিও নিলাম। অফিসে গিয়ে প্যাকেট খুলে দেখি, টাকা। পরদিন সেই হাউসের পি আর ও-র কাছে ফেরত দিতে গেলাম সেই টাকা। উনি অবাক হয়ে বললেন, 'মিস দাশগুপ্ত, আপনিই প্রথম রিপোর্টার যিনি টাকা রিফিউজ করলেন। আপনাদের ডিপার্টমেন্টের সবাই নেয়।' বোঝো অবস্থা। তখনই বুঝলাম, ডিপার্টমেন্টের সবাই মারুতি চেপে অফিসে আসে কেন ?

—এখানেও হয়। তবে এতটা খুল্লমখুল্লা নয়।

—তারপর কী হল, শোনো, ডিপার্টমেন্টের রিপোর্টাররা ঘটনাটা জানতে পারল। সবাই খেপল আমার উপর। আমার বিরুদ্ধে কনস্পিরেসি শুরু হল। তখন নাইট ডিউটি দিতে হত আমাকে। নাইট ডিউটির দিন বিজনেস পেজ মেক আপের দায়িত্ব আমার। একেক রিপোর্টার, একেক রকম ইন্সট্রাকশন দিয়ে যেত। প্রত্যেকেই চাইত, তার খবরটা বড় করে বেরোক। আমি শুনতাম না। খবরের ইম্পরট্যান্স অনুযায়ী, বড়-ছোট করতাম। স্বার্থে ঘা লাগল সবার।

—একই গল্প সব জায়গায় সবিতা।

—না, শোনো। একদিন করল কী, কম্পিউটারে বসে রিপোর্ট টাইপ করতে করতে উঠে বাথরুমে গেছি, কেউ এসে আমার রিপোর্টের দুই প্যারাগ্রাফের মাঝে অশ্রাব্য গালিগালাজ ঢুকিয়ে দিল। অত আর চেক করিনি। ভাবতেও পরিনি কেউ এটা করতে পারে। রিপোর্টটা ছিল ফাইনান্স মিনিস্টারের প্রেস কনফারেন্স। ভাইটাল একটা পলিসি ম্যাটার নিয়ে। ডিক্স জমা দিয়ে বাড়ি চলে যাওয়ার পর হঠাৎ ফোন। রীতা সেহগল বলে একটা মেয়ে নাইট ডিউটিতে ছিল। সে ফোন করে বলল, তোর রিপোর্টে এ সব গালাগালি কে ঢোকাল ? ভাগ্যিস, তোর রিপোর্টে একবার চোখ বুলিয়েছিলাম। এই রিপোর্ট ছাপা হয়ে গেলে তোর তো চাকরি যেতই, কাগজেরও বদনাম হয়ে যেত। পরদিন অফিসে গিয়েই রিজিগনেশন দিলাম।

—কে এই দুষ্কর্মটা করেছিল, তা বের করতে পারলে না ?

—কী করে করব ? এ তো আর হাতের লেখা নয় যে, বুঝতে পারব। তবে ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্য। ওই চাকরি না ছাড়লে, এটা পেতাম না। আমার ফর্মার কলিগরা এখন যখন আমার মাইনের কথা শোনে, তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

—তোমার হ্যাজবেন্ডও তো রিপোর্টার, তাই না ?

—হ্যাঁ। আমার একস হ্যাজবেন্ড।

তার মানে ?

BOIRBOI.NET

—আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে গত মাসে।

—কেন.... ?

—অত্যন্ত পজেসিভ ক্যারেকটারের লোক ছিল। আমার প্রফেশনাল কাজেও নাক গলাচ্ছিল। বছর দুয়েক সহ্য করেছি। আর পারলাম না। এখন একা। ভালই আছি। আমার অনেক শিক্ষা হয়েছে।

—এত বড় একটা ধাক্কা তুমি কী করে সামলালে সবিতা ?

—জীবনটা অনেক বড় অয়ন। চলার পথে দু'একটা পাথরের কুচি তো পায়ে লাগবেই। তোমাকে মাড়িয়ে যেতে হবে। না হলে এগোতে পারবে না।

ফোনটা বেজে উঠল। উঠে গিয়ে ধরলাম। সঞ্জয়ের। বলল. "বাড়িতে

করলাম। পেলাম না। বস, একটা কথা, দৈনিক প্রভাতে গেছিলাম, শুভদাকে একটা ছবি দিতে। দীপেনদা তো দেখলাম, বেশ ঘোঁট পাকিয়েছে।

—কে দীপেনদা রে ?

—রিপোর্টিংয়ের দীপেন সরকার।

—কী ঘোঁট পাকাল ?

—বোধহয় নিউজ এডিটরের কানে তুলেছে, অয়ন ব্যানার্জি অফিস কামাই করে, ফ্রেঞ্চ টিভি-র কাজ করছে। বোধহয় আপনাকে শো কজ করবে।

—মাই ফুট। আমার একটা চুলও ছুঁতে পারবে না এন ই। ভাবছে কী নিজেকে ? ওকেই আমি প্রথম লাথিটা মারব।

—বস, এটা কিন্তু সিরিয়াস ব্যাপার।

—আমি টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিরিয়াস। তুইও এই লাগানি-ভাগানির কাজে নেমে পড়লি সুজয় ?

—না বস, আমি আপনার ভাল চাই।

—স্বপ্নাকে ডিনার পার্টিতে নিয়ে গেছিলি শুনলাম। এনজয় কর। আমার কথা ভাবতে হবে না।

—বাড়ি ফিরছেন কখন ? গাড়ি পাঠাব ?

—তোর এত কী দরকার রে ? শোন, আজ আমি হোটেলেই থাকব। এনি কোয়েশ্চেন ?

—না বস।

—বাড়িতে যখন ফোন করেছিলি, কে ধরছিল ?

—বুবুন। আপনার খবর জানতে চাইছিল।

—ঠিক আছে।

ফোনটা ছাড়তেই সবিতা জিজ্ঞাসা করল, "কাকে এত ঝাড়ছিলে, অয়ন ?"

আমি ওর কোলে মাথা দিয়ে টানটান হয়ে বললাম, "ছাড়ো। তোমার প্ল্যানটা কী বলো।"

—ঘরে যথাসম্ভব আলো কমিয়ে, তোমার সঙ্গে গল্প করা।

—আবার উঠতে হবে ?

—লক্ষ্মীটি ওঠো। আমার ভাল লাগবে।

উঠে গিয়ে একটার পর একটা আলো নিভিয়ে দিলাম। তারপর জানলার ভারী পর্দাটা সরিয়ে দিলাম এক টানে। সামনেই চিড়িয়াখানা। গাছ-গাছালি, ঘন অন্ধকার। ডান দিকেই চোখে পড়ল দ্বিতীয় হুগলি সেতু। আলো দিয়ে সাজানো। বিদেশ-বিদেশ মনে হচ্ছে। পিছন ফিরে ডাকলাম, "সবিতা, এ দিকে এসো। একটা জিনিস দেখে যাও।"

সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল সবিতা। ডান দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে বলল, "ওয়ান্ডার ফুল। কে বলে ক্যালকাটা ইজ অ্যান আগলি সিটি ?"

পিছন থেকে ঠিক ওই সময়েই ওকে জড়িয়ে ধরলাম। তারপর আলতো করে চুমু খেলাম ওর ঘাড়ের নীচে। ওর শরীরে শিহরণ টের পেলাম বেশ ভালভাবেই। জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। চিড়িয়াখানার কোথাও, বোধহয় একটা কোকিল

ডাকছে। সাত দিন আগে পুলিশ লঞ্চের রেলিংয়ের সামনে দাঁড়ানো আলিঙ্গনাবদ্ধ দু'টো শরীরের কথা মনে পড়ল। আর মনে হতেই ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বললাম, "সবিতা, আজও কি ভয় করছে?"

শরীরটা আমার দিকে ঘুরিয়ে ও বলল, "ভয়টা কেটে গেছে।" বলেই আমাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল।

আধ ঘণ্টা পর....বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে থাকা সবিতা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "ক'টা বাজে, অয়ন?"

উঠে বসে হাত বাড়িয়ে ঘড়িটা টেনে বললাম, "সাড়ে নটা।"

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল ও, "মাই গড। নীচে রেস্তোরাঁতে দশটার পর অর্ডার নেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। হারি আপ। আমার মনেই ছিল না।"

তাড়াতাড়ি দু'জনে পোশাক পরে নিলাম। তারপর আলো জ্বালাতেই সবিতা বলে উঠল, "উফ্ দেখো, ঠোঁটটার কী অবস্থা করেছ।" বাথরুমে গিয়ে ও মুখ-চোখ ধুয়ে এল। তারপর হালকা মেকাপ নিয়ে বলল, "চলো, আজ চাইনিজ খাই।"

লিফট দিয়ে নেমে, ডানদিকেই একটা ছোট্ট রেস্তোরাঁ। ওখানে অবশ্য চিনে খাবার পাওয়া যায় না। লবিতে ঢুকে ডানদিকে খানিকটা এগিয়ে সুইমিং পুলের পাশে চাইনিজ রেস্তোরাঁ। সেখানে ঢুকে আমরা দু'জন একটা কোণে বসলাম। রেস্তোরাঁয় মাঝারি ধরনের ভিড়। সবিতা মেনু কার্ড নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অর্ডার দেওয়ার ব্যাপারে আমি একেবারে কাঁচা। খাবারের বাহারি নাম কিছুতেই মনে রাখতে পারি না। বরাবরই দায়িত্বটা নিত পরমা।

মেনু কার্ডে ঝুঁকে খাবার বাছছে সবিতা। আমি অলস চোখে এ দিকে ও দিক তাকাতে লাগলাম। সাধারণ লোক এই সব রেস্তোরাঁয় খেতে আসে না। এই সব জায়গায় এলে বোঝা যায় না, দুঃখ-দারিদ্র বলে কিছু আছে এ জগতে। চোখ বোলাতে গিয়ে হঠাৎই আমার নজরে পড়ল। বাঁ দিকের কোণের টেবলে বসে আছে বড়দা, বড়বৌদি, টুবলু, পরমা, আর আমারই বয়সী একজন। কে ওই ছেলেটা? পরনে বিদেশি জামা। কলার আর স্ট্রাইপ দেখে বোঝা যাচ্ছে। গায়ের রঙ বেশ ফরসা। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। মাঝারি উচ্চতার ছেলেটা হেসে হেসে কথা বলছে পরমার সঙ্গে। বড়বৌদি ওদের কথা শুনছে।

ছেলেটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। সাংবাদিকের সিক্সথ সেন্স কাজ করতে শুরু করল। এই ছেলেটাই কি জার্মানিতে থাকে? যার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা পরমার? হতে পারে। পরমার পরনে জামদানি শাড়ি। একদিন আমিই পছন্দ করে কিনে দিয়েছিলাম গড়িয়াহাটের একটা দোকান থেকে। অসাধারণ লাগছে ওকে দেখতে। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি বুকে একটা যন্ত্রণা অনুভব করলাম। সেই ক্ষতটা থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। কষ্ট হচ্ছে, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে আমার।

এই সময় সবিতা জিজ্ঞাসা করল, "কী খাবে বলো।"

ওকে বললাম, "সবিতা, চাইনিজ খেতে আমার ভাল লাগে না। প্লিজ চলো, মোগলাই রেস্তোরাঁয়। এখানে আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে।"

আমার গলায় বোধ হয় কিছু ছিল। আর কোনও প্রশ্ন না করে সবিতা উঠে

পড়ল। দু'জনে মিলে বেরোবার সময়, হঠাৎই দেয়ালের আয়নায় চোখাচোখি হয়ে গেল টুবলুর সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে ও চেঁচিয়ে উঠল, "ছোটকা, ও ছোটকা। আমরা এখানে। পরমামাসি, ওই দেখো, ছোটকা চলে যাচ্ছে।"

শুনেও আমি ফিরে তাকালাম না।

॥ আট ॥

জীবনে এই প্রথম আমার এমন হল। বাড়িতে যেতে মন চাইছে না। ট্যাক্সিটা ছাড়লাম ত্রিকোণ পার্কের কাছে। বেলা সাতটা-সাড়ে সাতটা। ছুটির দিন। পার্কের ভেতর এক দল বাচ্চা ছেলে ক্রিকেট প্র্যাকটিস করছে। পাড়ার সিনিয়র ছেলেরাই এই কোচিং ক্যাম্পের ব্যবস্থা করেছে। অশোক মালহোত্র, না কে একজন, বাচ্চাদের শেখায়। ক্রিকেট সম্পর্কে আমার আগ্রহ একেবারেই নেই। চিনিও না আজকালকার প্লেয়ারদের।

পার্কের গেটের সামনে ট্র্যাকশুট পরে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে কৌশিক। আমাদের উল্টোদিকের বাড়িতে থাকে। কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্সি পড়ে। আমাকে দেখে বলল, "কোত্থেকে অয়নদা?"

—তাজ বেঙ্গলে একটা কাজ ছিল রে।

—একটু আগে দেখলাম, বৌদিরা সবাই বেরিয়ে গেলেন হন্তদন্ত হয়ে। কিছু হয়েছে আপনাদের বাড়িতে?

—কী আবার হবে। হয় আদ্যাপীঠ, না হয় দক্ষিণেশ্বরে গেছে। মাসে একটা রোববার বড়দা নিয়ে যায়।

—আপনি এখন বাড়িতে থাকবেন, অয়নদা?

—থাকব। কেন রে?

—এই ক্রিকেট ক্যাম্পের ব্যাপারেই একটা ফেভার চাইতে যাব। আর চালাতে পারছি না। যা খরচা।

মনে মনে আর পছন্দ করতে পারছি না কৌশিককে। ক্যাম্প চালাতে না পারলে বন্ধ করে দিক। আমার কাছে ফেভার চাইতে আসবে কেন? অন্য কেউ হলে এড়িয়ে যেতাম। কৌশিক আমার ভাইয়ের মতো। ভাল ছেলে। মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয়, বুবুনের সঙ্গে বোধহয় ওর কোনও সম্পর্ক আছে। বললাম, "আমাকে কী করতে হবে, বল।"

—ভাবছি, টাকা তোলার জন্য একটা সুভেনির পাবলিশ করব। কয়েকটা অ্যাড, জোগাড় করে দিতে হবে। না করবেন না। আপনার সঙ্গে অনেক লোকের জানাশুনা। ইচ্ছে করলে আপনি পারবেন।

—পরে ফর্ম দিয়ে যাস। বলেই হাঁটতে শুরু করলাম। পার্কের পাশেই মাদার ডেয়ারির ডিপো।

চাঁদু লাইনে দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে এগিয়ে এসে বলল, "ছোড়দাবাবু, গেটে তালা দেওয়া আছে। চাবিটা তুমি নিয়ে যাও। বাড়িতে কেউ নেই।"

এমনটা কখনও হয় না। কেউ থাকুক বা না থাকুক, শোভামাসি কখনও বাড়ির

বাইরে যায় না। অন্য সময় হলে, চাঁদুর কাছে জানতে চাইতাম, সবাই কোথায় গেছে। আজ ইচ্ছে করছে না। কাল রাতে মাত্র দু'তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছি। ভোরবেলায় সবিতাকে এয়ার পোর্টে ছেড়ে দিয়ে, এই ফিরছি। খুব ক্লান্ত লাগছে। সবিতা খুব উপকার করে গেল আমার। আজ থেকে নতুন জীবন শুরু। আমাকে মানুষ হতে হবে। দরকার হলে, আর পাঁচজনকে মাড়িয়ে দিয়েও, আমাকে উপরে উঠতে হবে। কাল রাতে আমি কথা দিয়েছি সবিতাকে।

গেটের তালা খুলে সোজা দোতলায় উঠে গেলাম। প্রথম কাজটা প্রথমে। পরমা আর আমার, ল্যামিনেট করা সেই ছবিটা আজই পুড়িয়ে ফেলতে হবে। আমার কাছে পরমার কোনও অস্তিত্বই নেই আর। টু মি, সি ইজ ডেড। আমাদের বাড়িতে কেরোসিনের চল নেই। পেট্রোল আছে। বের করে নিতে হবে বাইক থেকে। ছবিটা নিয়ে তাই ফের নীচে নেমে এলাম। চাঁদু দুধ নিয়ে ফেরার আগেই কাজটা সেরে ফেলতে হবে।

—অয়ন, বুবুনরা কেউ বাড়িতে নেই ?

পাশের বাড়ির দোতলা থেকে কথাটা জিজ্ঞাসা করলেন কৌশিকের মা। ঘাড় নেড়ে বললাম, "নেই।"

—তোমাকে ক'দিন দেখিনি কেন, বাবা ?

রাগ হয়ে গেল। বললাম, "দিল্লি গেছিলাম। অফিসের কাজে।"

বারান্দায় দাঁড়িয়ে কৌশিকের মা। ভদ্রমহিলার কোনও কাজ নেই। কিডনি খারাপ। সারাদিন খোঁজ নিয়ে বেড়ান প্রতিবেশীদের। নীচে দাঁড়িয়ে থাকলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাবেন। বাধ্য হয়ে ভেতরে ঢুকে এলাম। বেঁচে গেল পরমা। পরমার সঙ্গে আমার যোগসূত্রের শেষ চিহ্নটা। বড়বৌদিরা বেলা বারোটার আগে ফিরবে না। হাতে অঢেল সময়। ততক্ষণে ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। এই ভেবে ফের নিজের ঘরে উঠে এলাম।

সকালবেলায় কাগজ দেখা হয়নি। কাগজ দেখার উৎসাহ আর পাচ্ছি না। টেবলের উপর গোটা পাঁচেক কাগজ। সব কাগজেই বড় বড় হেডিং, "সজলের মৃতদেহ উদ্ধার।" নাগেরবাজারের সেই খুনের খবর এখনও চলছে। আগ্রহ নিয়ে পড়তে শুরু করলাম। মাঝে কয়েকটা দিন কাগজ দেখার সুযোগ পাইনি। সজল ছেলেটা খুন হয়েছে পড়ে খুব খারাপ লাগল। ডি ডি-র পুরকায়স্থ তাহলে ঠিকই বলেছিল প্রথম দিন। ছেলেটা কিডন্যাপ হতে পারে। আমাদের কাগজে এই খবরটা করেছে দীপেন। নাম দেয়নি, কিন্তু লেখা পড়েই বুঝতে পারছি। খবরের সঙ্গে একটা ছবিও বেরিয়েছে। বাগুইআটি অঞ্চলের একটা পুকুর থেকে পুলিশ একটা বস্তা তুলে আনছে। ওই বস্তার মধ্যেই পাওয়া গেছে সজলের লাশ। ছবির নীচে ফটোগ্রাফারের নাম। দেখেই চমকে উঠলাম। সুজয় বসু। অন্য কোনও কাগজ কিন্তু ছবিটা পায়নি।

সুজয়ের নাম দেখেই, চিনচিনে রাগটা হতে থাকল। সুজয় বাস্টার্ড তা হলে দীপেনের দিকে ভিড়েছে। এই ছবি পাওয়ার কথা ওর নয়। দীপেন ওকে টিপস না দিলে। সঙ্গে সঙ্গে দুইয়ে দুইয়ে চার—কষে নিলাম। পুরো রিপোর্টে দীপেন আকাশে তুলে দিয়েছে পুরকায়স্থকে। তার মানে, আমার অনুপস্থিতিতে ও বেশ মাখামাখি

করছে পুরকায়স্থের সঙ্গে। সজলের লাশ কখন তোলা হবে, সেই খবরটা সম্ভবত দীপেনই প্রথম পায় পুরকায়স্থের কাছ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ও ডেকে নেয় সুজয়কে। একটা সময় গোপন কোনও খবর পেলে, ছবি তোলার জন্য আমিও ডাকতাম সুজয়কে। সেই সময় দীপেনরা সহ্য করতে পারত না ওকে। সুজয়ের নামটা দেখে, তাই মুখ ছিটকে একটা কথাই বেরিয়ে এল, 'বিট্রেয়ার।' গাছের খাবে, তলারও কুড়োবে, এটা চলতে দেওয়া যায় না।

মাথায় আমার আগুন। কর্ডলেসটা টেনে নিয়ে ফোন করলাম স্টুডিওতে। সুজয়কে এমন ঝাড়ব, জীবনে আমার সামনে এসে আর দাঁড়াবে না। এই দীপেনের নামেই দিনের পর দিন, খারাপ খারাপ কথা, আমার কাছে এসে লাগাত সুজয়। আজ ওর সঙ্গেই পিরিত করছে। হয়তো ভেবে নিয়েছে, দৈনিক প্রভাতে আমার কোনও ভবিষ্যৎ নেই। আমাকে তেল দিয়ে আর লাভ নেই। যারা ক্ষমতায় আছে, তাদের সঙ্গেই ভিড়ে পড়া যাক। বাস্টার্ডটাকে আজ এমন শিক্ষা দেব, জীবনেও ভুলতে পারবে না। বার কয়েক রিঙ হতেই, ও প্রান্তে ফোনটা ধরল মিহির। একটু কড়া গলাতেই জিজ্ঞেস করলাম, "এই, সুজয়কে দে তো।"

মিহির বলল, "ধরুন, দিচ্ছি।"

ফোনটা ধরে রইলাম। ও প্রান্তে মিহিরের গলা, "অয়নদা ফোন করেছে।" পাশ থেকে সুজয় বলল, "বলে দে, নেই।" মিহির আমাকে বলল, "অয়নদা, দাদা বেরিয়ে গেছে। কিছু বলতে হবে?"

অতি কষ্টে রাগটা চেপে বললাম, "আমি বাড়িতেই আছি। এলে একবার ফোন করতে বলিস।"

—বলব।

লাইনটা কেটে, মনে মনে বললাম, "এড়িয়ে যাচ্ছিস। কতক্ষণ এড়াবি?" এই কথা বলে ফের ডায়াল করলাম। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম মিহিরের গলা,

—কাকে চাই?

গলাটা অন্যরকম করে বললাম, "দীপেন সরকার বলছি। সুজয় আছে?"

—ও, দীপেনদা। আপনার আর বৌদির ছবিগুলো পাঠিয়ে দিয়েছি। বোধহয় এতক্ষণে আপনার বাড়িতে পৌঁছেও গেছে। ধরুন, সুজয়দাকে দিচ্ছি।

বাস্টার্ড, আজকাল দীপেনের বাড়িতেও যাতায়াত করছে। রাগের পারদ চড়চড় করে বেড়ে গেল। সুজয় এসে ফোনটা ধরতেই বললাম, "দ্যাখ, দু'টো জিনিস বলার জন্য ফোনটা করলাম। এক, জীবনে আর আমার সামনে আসবি না। দুই, তোর যতটা ক্ষতি করার, আমি করব। জীবনে যাতে তুই দৈনিক প্রভাতে আর না ঢুকতে পারিস, সেটা দেখব।"

—বস, আপনি রেগে গেছেন। আমার কিন্তু দোষ নেই।

—তোর কোনও কথা শুনতে চাই না। ভুল আমারই। তোর মতো ধান্দাবাজ একটা ছেলেকে এতদিন চিনতে পারিনি। বাস্টার্ড কোথাকার।

—বস, গালাগালি দিচ্ছেন।

—তুই ভাল ব্যবহারের যোগ্যই না। দীপেন শালাকেও লাথিটা মারছি। এক সপ্তাহ পরেই সেটা টের পাবি। দেখি, তখন কোন বাবা তোকে বাঁচায়।

মুখ থেকে যাতে আর বাজে কথা না বেরোয়, লাইনটা তাই কেটে দিলাম। সারাটা শরীর দপদপ করছে। নিজেকে সামলাবার জন্য চোখ বুজে শুয়ে রইলাম। সুজয়কে আমি কোনওদিন ক্ষমা করব না। কোনওদিনই না। কেউ ভাল না। এই যে বড়বৌদি, যাকে এতদিন মায়ের মতো দেখেছি, মিটিয়ে দিতে পারত না পরমার সঙ্গে আমার ঝগড়া ? হয়তো আজ দক্ষিণেশ্বর বা আদ্যাপীঠে আদৌ যায়নি। হয়তো পরমাদের বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠান আছে। সবাই মিলে লেক গার্ডেন্সেই গেছে। আমাকে জানাবার প্রয়োজনই মনে করেনি। কথাটা মনে হতেই ছটফট করে উঠলাম।

ঠিক এই সময় ফোন বেজে উঠল।

হাত বাড়িয়ে ফোনটা ধরলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "কাকে চাই।"

—অয়নবাবু আছেন ?

—কে বলছেন।

—আমি বাদশা।

—কে বাদশা ?

—এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন ? আমি সেই বাদশা, যাকে জেল খাটাবার জন্য, আজ থেকে চার বছর আগে, আপনি আদা-জল খেয়ে লেগেছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল বাদশাকে। ওর একটা কী যেন ভাল নামও আছে। এন্টালি এলাকার ছেলে। মাস্তান টাইপের। একটা সময় রাজনৈতিক ছত্রছায়ার ছিল। ওই সময় এন্টালিরই সুমনা নামের একটা মেয়েকে ও রেপ করে। আমাদের কাগজে খবরটা আমি করেছিলাম। রাতের শোয়ে সিনেমা দেখে মেয়েটা বাড়ি ফিরছিল। তখনই বাদশা ওকে টার্গেট করে। খবরটা বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে এন্টালির কিছু লোক আমাদের অফিসে এসে হল্লা করেছিল। সব মাস্তানদেরই এরকম কিছু শাকরেদ থাকে। তারপরই আমার জেদ চেপে যায়, ছেলেটাকে জেল খাটাতে হবে। ওই কেসটার পিছনে আমি লেগে ছিলাম। বাদশার চার বছরের জেল হয়ে যায়। গলায় যত সম্ভব রুক্ষতা এনে বললাম, "ভুলে যাইনি। তুমি ফোন করেছ কোন সাহসে ?"

—অয়নবাবু, এক সপ্তাহ হল, ছাড়া পেয়েছি জেল থেকে। ভাবলাম, খবরটা আপনাকে জানিয়ে দিই। আপনার অফিসে ফোন করলাম। বলল, আপনি নাকি বেশ কয়েকদিন ধরে অ্যাবসেন্ট। ওখান থেকেই বাড়ির নম্বরটা নিলাম। আমার একটা প্রশ্ন ছিল। বিনা অপরাধে, কেন আমাকে জেল খাটালেন ?

—বিনা অপরাধ মানে ? তোমার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠেনি ?

—উঠেছে। কিন্তু অভিযোগ তো যে কেউ যার-তার নামে করতে পারে। অভিযোগটা সত্যি কি না, খোঁজ করে দেখেছেন কোনওদিন ? আপনারা না সত্যান্বেষী ? সৎ সাংবাদিক ?

—বাদশা, তুমি আমাকে সাংবাদিকতা শেখাচ্ছ ?

—মাফ করবেন, সে চেষ্টাও করব না। কিন্তু আপনার একটা ভুল জেদের জন্য আমি তো শেষ হয়ে গেলাম অয়নবাবু। মানবেন কথাটা ?

বাদশা কথা বলছে মার্জিত ভঙ্গিতে। তবুও, আমি একটু অধৈর্য্য হয়ে উঠলাম, "কী

বলতে চাও, বলো।"

—কিচ্ছু না। শুধু আপনাকে সাবধান করে দিতে চাই। সত্যিকারের সাংবাদিকতা করুন। ঘটনার একটা পিঠে দেখে বা শুনে, রঙ চড়াবেন না।

—ভুল করছ। আমি কোনও ব্যাপারে কনভিন্সড না হলে, কখনও রিপোর্ট করি না।

—সরি, মানতে পারলাম না। অন্য ব্যাপারে জানি না। আমার কেসে আপনি কিন্তু খুব একপেশে রিপোর্ট করেছিলেন। যে মেয়েটাকে রেপ করার অভিযোগ আমার নামে, তার মুখ থেকে কি কখনও জানার চেষ্টা করেছিলেন, সে নিজে কোনও অভিযোগ করেছে কি না?

—অভিযোগটা তো করেছিল তার বাবা?

—অভিযোগ করানো হয়েছিল অয়নবাবু। উনি নিজে ইচ্ছে করে অভিযোগ জানাতে যাননি। আপনি পরের মুখে ঝাল খেয়ে রোজ রিপোর্ট করে গেলেন। ছিঃ, অয়নবাবু। কাজটা আপনি ভাল করেননি।

—তুমি যাই বলো বাদশা। আমি মনে করি, আমি কোনও ভুল করিনি। একজন রেপিস্টের শাস্তি হওয়াই উচিত।

কথাটা এমন রূঢ়ভাবে বললাম যে, ও প্রান্তে বাদশা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল। তারপর বলল, "অয়নবাবু, আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করব না। কিন্তু একদিন আমি প্রমাণ করে দেব, আপনার মতো সাংবাদিকরা ভুল লেখেন। আমার হাতে এখন অঢেল সময়। সুযোগ আমি পাবই। আপনি আমার যেটুকু ক্ষতি করেছেন, ঠিক সেটুকু ক্ষতি আমিও আপনার করব। একটু আগে থেকেই কথাটা আমি জানিয়ে রাখলাম।"

বলেই লাইনটা কেটে দিল বাদশা। ওর শেষ কথাটায় বুঝলাম, খুব ভদ্রভাবেই হুমকিটা দিল। লালবাজারে আমি দিনের পর দিন কাটিয়েছি। বহু ক্রিমিনালকে নিজের চোখে ঠাণ্ডা হতে দেখেছি। কেউ কেউ পরে পুলিশের ইনফর্মারও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাদশাকে মনে হল, অন্য রকম। কথাবার্তায় খুবই চোস্ত। একবারও কোনও অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেনি। বরং যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছিল। এ যদি ক্রিমিনাল হয়, তা হলে ভয়ের কারণ আছে।

এন্টালিতে বাদশার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। হাত কাটা নীলু। আমার খুব পরিচিত। পুলিশের হাত থেকে একবার ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম। সেজন্য ও খুবই কৃতজ্ঞ। কোথাও দেখা হলে, খুব বিনীতভাবে প্রতিদান দিতে চায়। হঠাৎই নীলুর কথা মনে হল। বাদশার হুমকিতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সাংবাদিকদের জীবনে এসব নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তবুও কেন জানি না মনে হল, নীলুকে একবার জানিয়ে রাখা দরকার। লোকটা থাকে কোথায়, তা অবশ্য জানি না। তবে ওর এক সাকরেদের বাড়ি চিনি সাদার্ন অ্যাভেনিউতে। নাম মোহনকুমার।

বড়বৌদি আর পরমার কথা ভুলে গেলাম। দ্রুত জামা-প্যান্ট বদলে, নীচে নেমে, বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বারবার মনে হতে লাগল, এই বাদশা ছেলেটা সহজে আমাকে ছাড়বে না। আমার পিছনে লাগবে। ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। সাবধান, অয়ন সাবধান। টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড দিয়ে সাদার্ন অ্যাভেনিউতে পৌঁছে

মোহনকুমারের বাড়ির সামনে যেতেই দেখি, পাশ দিয়ে লোকটার মারুতি বেরিয়ে গেল রাসবিহারীর দিকে। বাইক নিয়ে, একবার ভাবলাম, তাড়া করি। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলাম।

সকাল সাড়ে ন'টা বাজে। আবার বাড়িতে ফেরার ইচ্ছেই হল না। কী ভেবে বাইক ঘোরালাম লেক ক্লাবের দিকে। রোয়ার-রা অনেকেই এখন থাকবে। ইচ্ছে হলে রোয়িংও করা যাবে। একটা সময় আমি ছিলাম লেক ক্লাবের হিরো। তবে এখনকার ছেলেরা অনেকেই হয়তো আমাকে চিনতে পারবে না। আজকাল ছেলেরা ক্রিকেটের দিকে এমন ঝুঁকেছে, কেউ আর রোয়িং করতেই আসছে না। এ নিয়ে মাঝে একদিন দুঃখ করছিল ও। কাগজে পড়েছিলাম, কলকাতায় নাকি এশিয়ান রোয়িং হবে। তারিখটা খেয়াল নেই। লেক ক্লাবের সেক্রেটারি এখন সুদীপ্ত সেন। আমার ব্যাচের। ও নিশ্চয়ই কম্পিটিশনের সময় আমাকে ডাকবে।

লেক ক্লাবের লনে দশ-বারোটা ছাতা বিছানো। দোতলার হল ঘরে বেশ ভিড়। জন্মদিন, বিয়েতে ভাড়া দেওয়া হয় ওই হলঘরটা। বোধহয় কোনও পার্টি আছে। লনে দাঁড়িয়ে পরিচিত মুখ খুঁজছি। হঠাৎ একটা ছাতার তলা থেকে সুদীপ্ত ডাকল, "এই অয়ন, এদিকে আয়।"

সুদীপ্ত এখন একটা সফটওয়ার কোম্পানির ডিরেক্টর। তবু লেক ক্লাব ওর প্রাণ। কাছে যেতেই চোখে পড়ল অনিমেষ আর রিয়াকে। ওদের পাশে আরও দু'জন অপরিচিত লোক। আমাকে দেখে রিয়া বলল, "ব্যাপারটা কী, অয়নদা। আপনার পাত্তা নেই ? কতদিন পরে দেখলাম বলুন তো ?"

—নামী-দামি লোকদের রোজ রোজ দেখা যায় না।

কথাটা শুনে অনিমেষ তেরছা চোখে তাকাল। কলেজে পড়াশুনা নিয়ে ওর সঙ্গে বরাবরই আমার লড়াই ছিল। ওর একটা বদভ্যাস কিছুতেই সহ্য করতে পারতাম না। সেটা হল, ফালতু তর্ক করা।

রিয়া বলল, "অয়নদা, কয়েকদিন আগে কাগজে একটা খবর পড়লাম আপনার। ময়দান এরিয়ায় বেআইনি হোটেল করা নিয়ে। লোকগুলো কারা, তা তো পরিষ্কার করে লেখেননি ?"

আমি উত্তর দেওয়ার আগে অনিমেষ বলে উঠল, "ময়দানে যদি কোনও হোটেল হয়, তোর আপত্তির কী আছে রে অয়ন। তোদের বাড়িতে তো করতে চাইছে না।"

অনিমেষ এখনও বদলায়নি। তর্ক করব না, ঠিক করে বললাম, "নিয়ম নেই রে।"

—নিয়ম তো ভাঙার জন্যই। নিয়মটা বদলালে সমাজের কী এমন ক্ষতি হবে ?"

রিয়া প্রতিবাদ করল, "এটা একটা যুক্তি হল ?"

অনিমেষ হার মানার পাত্র নয়, "শোনো রিয়া, ময়দানে ফাঁকা জায়গাটা যদি না থাকে, তা হলে কলকাতার লোক বেঁচে যাবে। মিটিং মিছিল হবে না। জ্যাম হবে না। লাইফ ডিসরাপ্টেড হবে না। মোর ওভার, আমার তো মনে হয়, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বড় বড় পাঁচতারা হোটেল করতে দেওয়া উচিত। কলকাতায় দু'টোর বেশি ফাইভ স্টার হোটেল নেই। ক্যান ইউ কল ইট আ মেট্রো সিটি ? দিল্লি-বোম্বাই গিয়ে দেখো গে কত হোটেল।"

রিয়া বলল, "এই জন্যই লোকে বলে, বাঙালির একতা বলে কিছু নেই। একটা কিছু হলেই হল, ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন।"

ওদের থামাবার জন্যই বললাম, "ভালই তো। আলোচনা হোক না। এই সুদীপ্ত, বিয়ার আনা। থার্স্ট্রি লাগছে।"

অনিমেষ তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, "তুই আবার করে থেকে বিয়ার খেতে শুরু করলি ? বড়বৌদি আজকাল বকছে না বুঝি।"

এবার আমি একটু তেরছাভাবে তাকালাম ওর দিকে। মনে মনে বললাম, অনিমেষ প্লিজ, আমাকে রাগাস না। আগে রাগলে আমার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোত না। অশালীন কথা তো একেবারেই না। সেই অয়নকেই তোর মনে আছে। আজ রাগলে তোর সম্মান কিন্তু একদম রাখতে পারব না। সামনে দু'জন অপরিচিত লোক বসে আছে। এরা তোর, না সুদীপ্তর গেস্ট, জানি না। তোর উপর আমার দীর্ঘদিনের রাগ। বড়বৌদির কথা তুলে তুই আমাকে তাচ্ছিল্য করলি। তবুও তোকে ক্ষমা করলাম। আর একবার আঘাত করলে, তোকে কিন্তু ছাড়ব না।

মুখে সুদীপ্তকে বললাম, "কী রে, মণি বেয়ারাকে ডাক। রিসেন্টলি ফ্রেঞ্চ টি ভি-র হয়ে বড় একটা কাজ করলাম। আজ আমি তোদের ট্রিট করব। এই দু'জনের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। প্লিজ, করিয়ে দে।"

সুদীপ্ত অবাক হয়ে তাকাল। তাকানোটা স্বাভাবিক। এই সুদীপ্তই এখানে আমাকে বহুদিন বিয়ার খেতে অনুরোধ করেছে এর আগে। আমি স্পর্শ করিনি। আজ নিজেই তাগাদা দিচ্ছি দেখে, ও তো অবাক হবেই। দূরে কাউন্টারে দাঁড়িয়েছিল মণি। সুদীপ্ত হাত নেড়ে ওকে ডাকল। তারপর আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল অন্য দুজনের সঙ্গে।

জীবনে এই প্রথম বিয়ার মুখে ঢাললাম। একটা ঠাণ্ডা স্রোত বুকটা জুড়িয়ে দিল। অনিমেষ কথা শুরু করল অন্যদের সঙ্গে। লেক ক্লাব শুধু রোয়িং ক্লাব নয়। সোস্যাল ক্লাবও। মেম্বাররা তাদের গেস্ট নিয়ে যায়। লেকের ধারে লনে বসে ব্যবসার কথাবার্তাও বলে। লাখ লাখ টাকার লেন-দেন হয়ে যায় লাঞ্চ বা ডিনার টেবলে। দূরে বেঙ্গল রোয়িং ক্লাবের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওদের সঙ্গে একটা সময় আমাদের খুব রেষারেষি ছিল। একবার স্টেট চ্যাম্পিয়ানশিপে মারপিটও হয়েছিল ওদের সঙ্গে। কী সব দিন ছিল তখন। ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল।

বি আর সি-র একটা ছেলে... সুনির্মল, তখন আমাদের খুব চ্যালেঞ্জ জানাত। ও থাকত লেক গার্ডেন্সে। মাঝেমধ্যে ক্লাবে ওর সঙ্গে আসত ওর বোন চান্দ্রেয়ী। খুব সুন্দর দেখতে ছিল মেয়েটা। বেঙ্গল টিমের হয়ে একবার আমি আর সুনির্মল মাদ্রাজে গেছিলাম। হাওড়া স্টেশনে ওর দাদাকে তুলতে গিয়ে চান্দ্রেয়ী যেচেই আলাপ করেছিল আমার সঙ্গে। তারপর থেকে মাঝে মধ্যেই আমাদের ক্লাবে আসত। এ নিয়ে কথাও উঠেছিল দু' ক্লাবে। চান্দ্রেয়ী ডাক্তারি পড়ার জন্য বাঙ্গালোর চলে যায়। আর তার পরই ধামা-চাপা পড়ে যায় সেই বিতর্ক।

বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে অনিমেষদের কথা শুনছি। ব্যবসার কথা হচ্ছে। অপরিচিত দু'জনের মধ্যে একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টট্যান্ট। সুদীপ্তই উদ্যোগ নিয়ে আলাপ করিয়ে দিল অনিমেষের সঙ্গে। ভদ্রলোক এক্সপোর্টের ব্যবসাও করেন। নিম পাতা আর নিম তেল পাঠাবেন বিদেশে। দশ টন ড্রাই লিফ চাই। সে ব্যাপারে কথা

হচ্ছিল। অনিমেষ ওই নিম পাতা সাপ্লাই করবে।

নিমপাতার খুব একটা মূল্য নেই আমাদের দেশে। শুকিয়ে গেলে মাটিতে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। নিম দাঁতন বিক্রি করার জন্য লোকে পাতা ফেলে দেয়। দাঁতন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে কীভাবে নিমপাতা সংগ্রহ করা যায়, সে ব্যাপারেই কথাবার্তা চলছে। শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, লোকে কত ধরনের ব্যবসাই না করে। অনিমেষ পোর্টে আরও কী যেন একটা ব্যবসা করে। এই যে আজ কথাবার্তা হচ্ছে, হয়তো এটাই বিরাট ব্যবসায় দাঁড় করিয়ে ফেলবে। হয়তো লাখ লাখ টাকা কামাবে। আর আমরা... আমি শ্রীযুক্ত অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় লাখ লাখ শব্দ লিখে যাব কোনও কাগজের জন্য। নিজের কিছুই হবে না। কথাটা ভাবতেই নিজের উপর ঘেন্না হল।

মুখ ফিরিয়ে লেকের জলের দিকে তাকালাম। পানায় ভর্তি। সুদীপ্তরা কী করছে। পরিষ্কার করায় না? ক্লাবের ইলেকশনে আমাকে ওরা দাঁড়াতে বলে প্রতিবার। সময়ের অভাবে, দাঁড়াই না। ক্লাবে আসি, এটা পছন্দ করত না পরমা। ওর ভয়ে আমি আরও অনেক কিছু করতে পারতাম না। এখন তো আর সেই ভয় নেই। আমাকে বাধা দেওয়ারও কেউ নেই। আমি এখন যা খুশি, তাই করতে পারি। কুণালদা, জ্যোতি আর দৈনিক প্রভাতের পাছায় লাথি মেরে বলতে পারি, "যা শালা, তোরা ভাগ।" কথাটা ভাবতেই মনে মনে একটু উত্তেজিত হলাম।

আমাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে রিয়া বলল, "অয়নদা, আপনাদের প্রফেশনটা কিন্তু দারুণ।"

পেটে প্রচুর বিয়ার। মুখ দিয়ে সত্যি কথাটা বেরিয়ে এল, "বাইরে থেকে তা মনে হয়। প্রফেশনটা খুব বাজে রিয়া।"

—যাঃ। কী বলছেন?

—ঠিকই বলছি। চারপাশে সব ডিসঅনেস্ট লোকেদের ভিড়।

কথাটা একটু জোরেই বলে ফেলেছিলাম। সবাই ঘুরে তাকাল আমার দিকে। অনিমেষ বলল, "তুই কি সত্যবাদী যুধিষ্ঠির?"

বললাম, "তার মানে?"

—ছাড়, ছাড়। আমরা সব খবরই রাখি।

কথাটা শুনে সেই চিনচিনে রাগটা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। বোতলে বাকি বিয়ারটা এক চুমুকে শেষ করে বললাম, "কী খবর রাখিস, তুই শুনি?" কথাটা বলেই হঠাৎ মনে পড়ল, কুণালদার সঙ্গে অনিমেষের কী একটা আত্মীয়তা আছে। হয়তো আমার নামে কিছু শুনে থাকবে। জেদ করার ভঙ্গিতে ফের বললাম, "বল, বল, তোকে বলতেই হবে।"

সুদীপ্ত বলে উঠল, "এই অয়ন, কী ছেলেমানুষি হচ্ছে।"

—এটা ছেলেমানুষি! কী বলছিস তুই? অনিমেষ আমার সম্পর্কে বাজে একটা হিন্টস দিচ্ছে। সেটা শোনার অধিকার আমার নেই? তুই জানিস, ওর রিলেটিভ কুণাল বোস... আমাদের চিফ রিপোর্টার.... আস্ত একটা চোর। গলফ গার্ডেনে লোকটা একটা ফ্ল্যাট কিনেছে, যার দাম দশ লাখ টাকা। কোত্থেকে পেল? মাইনে তো পায় হাজার দশেক।"

অনিমেষের মুখ-চোখ লাল। তর্কের খাতিরে বলল, "আর যাই করুক, লোকটা

মাল নিয়ে ক্রিমিনাল ছাড়ায় না।"

—ও, সাদা শুয়ারটা... ওকে আমরা আড়ালে সাদা শুয়ার বলে ডাকি ... এই গল্প করেছে বুঝি ? জিজ্ঞেস করিস তো, ইলেকশনের সময় ওর কত কামাই। আমার কাছে প্রুফ আছে।

রিয়া বলল, "অয়নদা, প্লিজ চুপ করুন।"

—কেন চুপ করব রিয়া ? আই অ্যাম নো মোর উইথ দৈনিক প্রভাত। লেট মি স্পিক আউট। লোকে জানুক, সকালে ছাপার অক্ষরে যাদের লেখা পড়ে সব বিশ্বাস করে, আসলে তারা কত ধান্দাবাজ। জানিস সুদীপ্ত, পোর্ট ট্রাস্টে আমি দশ কোটি টাকার চুরি ধরলাম। লিখে কপিটা দিলাম সাদা শুয়ারকে। ও কী করল জানিস, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাকে সব জানিয়ে দিয়ে, আমার কপিটাই হাপিস করে দিল। আমি সেই অফিসারের কাছে বেইজ্জত হয়ে গেলাম। সাদা শুয়ারটা ফয়দা তুলল পরে। ওর এক রিলেটিভকে পোর্টের একটা বড় কন্ট্রাক্ট পাইয়ে দিল। নাম শুনবি সেই বাস্টার্ডটার। এই অনিমেষ রায়চৌধুরী।

রিয়া করুণ চোখে তাকিয়ে রয়েছে। অনিমেষ ফুঁসে উঠে বলল, "অয়ন, তুই কিন্তু লিমিট ছাড়িয়ে যাচ্ছিস।'

সুদীপ্ত উঠে এসে আমাকে বলল, "অয়ন চল, টয়লেটে চল, তুই খুব এক্সাইটেড হয়ে গেছিস। মুখ-চোখে জল দিবি চল।"

—না রে। আমার কিছু হয়নি। আসলে এসব কথা বাইরে কোনওদিন বলিনি। জানিস, গত এক বছরে সতেরোটা এক্সক্লুসিভ স্টোরি করার পরেও, সাদা শুয়ারটা আমাকে প্রমোশন দেয়নি। আমি জানি, অনিমেষ একটু পরেই সব কথা কুণালের কানে ঢালবে। ঢালুক। দৈনিক প্রভাতে চাকরি করতেই হবে, তার কী মানে আছে ? আমার জন্য অনেক দরজা খোলা আছে। আমি ইউনিভার্সিটির গোল্ড মেডালিস্ট। ইউনিভার্সিটির ব্লু। এই ক্রেডেন্সিয়াল কোন শালার আছে, বল।"

সুদীপ্তর দুই গেস্ট এ সময়টায় উঠে দাঁড়াল। একজন বলল, "সুদীপ্তবাবু, আজ উঠি। পরে না হয় একদিন বসে অনিমেষবাবুর সঙ্গে কথা বলা যাবে। অয়নবাবু একটু আপসেট হয়ে পড়েছেন।"

শুনে আমি বললাম, "না, না, আপনারা যাবেন কেন মশাই। আমি যাচ্ছি। আপনারা বিজনেস টক চালিয়ে যান।"

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই, মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। চেয়ারটা ধরে ফেললাম। আশপাশের লোক আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাতে কিৎস্য আসে-যায় না। বাইকটা রেখে এসেছি গেটের বাইরে। অন্তত গেট অবধি আমাকে ঠিক থাকতে হবে। ঠিক আছি, দেখাবার জন্য লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোলাম। সুদীপ্ত হয়তো ক্ষুণ্ণ হয়েছে মনে মনে। অনিমেষ হয়তো আর কোনওদিন আমার মুখ দেখবে না। আই ডোন্ট কেয়ার। পরমাই আমাকে ছেড়ে চলে গেল। ভাল ছেলে হয়ে কী লাভ ?

জীবনে কোনওদিন ড্রিঙ্ক করিনি। আমাদের বাড়িতে মেজদা ছাড়া আর কেউ ড্রিঙ্ক করে না। মেজদা পার্টি-ফার্টি দেয়। ওর দরকার হয়। বড়দা ঘরোয়া টাইপের মানুষ। বড়বৌদি পছন্দ করে না বলে, পার্টিতেও যায় না। সাংবাদিকরা ড্রিঙ্ক করে

শুনে বড়বৌদি একবার খোঁজ করেছিল জ্যোতির কাছে, "হ্যাঁরে, প্রেস কনফারেন্সে কি মদ সার্ভ করে ?"

—হ্যাঁ, করে। তবে সব প্রেস কনফারেন্সে নয়।

—ভয় লাগে, অয়নটা যদি আবার এ সব নেশা ধরে ...।

—উফ্, আর কতদিন ওকে খোকাবাবু করে রাখবেন বৌদি ? এবার বড় হতে দিন। মদ তো সিগারেটের থেকে ভাল।

বড়বৌদি বলেছিল, "কোনও নেশাই ভাল না। অয়ন যদি কোনওদিন এ বাড়িতে ড্রিঙ্ক করে ঢোকে, সেদিন থেকে আর এ বাড়িতে থাকবই না।"

এ সব কথা আমার সামনেই সেদিন হয়েছিল। জীবনে বহু ককটেল পার্টিতে গেছি। কত অনুরোধ। তবু বৌদির ভয়ে আমি ও সব ছুঁইনি। আজ বড়বৌদিকেও পরোয়া করছি না। হঠাৎ মনে হল, বিয়ারটা কি হার্ড ড্রিঙ্ক ? অন্য মদের মতো ? না, তা না। বিয়ার তো চিরতার জল। তা হলে মোটেই আমি ড্রিঙ্ক করিনি। আর করলেই বা কী এসে যায়। এখন কারও কথা শুনতে আমি বাধ্য নই।

বাইকটা নিয়ে গেটের বাইরে আসতেই, গোল আয়নায় চোখ গেল। ইস, কী বিচ্ছিরি লাগছে আমাকে দেখতে। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখের কোণে কালি। চুলটাও এলোমেলো। স্টার্ট দেওয়ার জন্য পা তুলতেই হঠাৎ চোখ গেল বি আর সি-র দিকে। লাল রঙের একটা মারুতির সামনে এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে। খুব চেনা মনে হল। চান্দ্রেয়ী না ? ওর পাশে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। দূর থেকে বুঝলাম, সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে কাউকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে চান্দ্রেয়ী। ও কি ডাক্তার হয়ে গেছে ? ভদ্রলোক কি ওর হ্যাজবেন্ড ? হতে পারে। আজ থেকে দশ বছর আগে, আমি যদি আর একটু এগিয়ে যেতাম, তা হলে আজ ওই ভদ্রলোকের বদলে চান্দ্রেয়ী আমাকেই হয়তো পরিচয় করিয়ে দিত অন্যদের সঙ্গে। ওই সময়টায়, কী কুক্ষণেই না বিয়ে বাড়িতে আলাপ হয়েছিল পরমার সঙ্গে।

চান্দ্রেয়ী মুখ ফেরালেই দেখতে পাবে আমাকে। যাতে দেখতে না পায়, সে জন্য তাড়াতাড়ি স্টার্ট দিলাম বাইকে। মেনকা সিনেমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মনে হল, কী হবে এত তাড়তাড়ি বাড়ি ফিরে ? বেলা এখন একটা। বাড়ির লোকজন নিশ্চয়ই সব ফিরে এসেছে। লাঞ্চের তোড়জোড় চলছে। অথবা ড্রয়িংরুমে বসে, কেউ কেউ টিভি দেখছে। আমাকে দেখলে অস্বস্তি হবে ওদের। বড়দা মুখ গম্ভীর করে থাকবে। বড়বৌদিও কথা বলবে না। বুবুন কি সব জেনে গেছে ? মেয়ে নিয়ে হোটেলে স্ফূর্তি করার কথা ? ও বরাবর বৌদির দিকে। তেমন হলে আমার সামনেই আসবে না। দোতলার ঘরে আমি বন্দী হয়ে থাকব। বাড়ি গিয়ে এখন কী লাভ ? তার চেয়ে লেকে বসে বিশ্রাম নেওয়া যাক। কথাটা মনে হতেই, বাইকটা ঢুকিয়ে দিলাম বাঁ দিকে। আগে এখান থেকে ট্রয় ট্রেন ছাড়ত। ছুটির দিনে, এই সময়টা গমগম করত বাচ্চাদের ভিড়ে। এখন সে সব বন্ধ হয়ে গেছে। লেকের পাশে সাফারি পার্ক হয়েছে একটা। সেখানে যায় বাচ্চারা। মেনকা সিনেমার কাছে এ দিকটা এখন শুনশান। যত অ্যান্টি সোসালদের ভিড়। বিরাট একটা বটগাছের নীচে একটা বেঞ্চ দেখে বাইকটা দাঁড় করালাম। ভাবতেও পারছি না, আমার মতো ব্যস্ত লোক এখন সময় কাটানোর জন্য লেকের বেঞ্চে এসে বসে থাকতে পারে।

খবরের কাগজে চাকরি নেওয়ার আগে, আমি মাস ছয়েক বেকার ছিলাম। তখন অবশ্য সময় কেটে যেত সকালে রোয়িং করে, আর দুপুরে গলফ খেলে। আর ছিল পরমা। কোনও কোনওদিন, ও আর আমি চলে যেতাম কলকাতার সামান্য দূরে। ফলতা, রায়চক, ডায়মন্ডহারবারে। সারাটা দিন কোথা দিয়ে চলে যেত, বুঝতেই পারতাম না। পরমাকে আমি তখন একটু একটু করে চিনছিলাম। টের পাচ্ছিলাম, ও আর পাঁচ জন মেয়ের মতো নয়।

গাছের নীচে হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে। বেঞ্চের ওপর পা দু'টো টানটান করে গা এলিয়ে দিলাম। দশ পনেরো হাত দূরে আরেকটা গাছের নীচে একটা ছেলে আর মেয়ে বসে আছে। মেয়েটার কোলে ছেলেটার মাথা। ছেলেটা খুনসুটি করছে। ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুক চিরে দীর্ঘ শ্বাস বেরিয়ে এল। জানি না, ভবিষ্যতে এই ছেলেটারও আমার মতো অবস্থা হবে কি না। দু'জনকে দেখতে দেখতে হঠাৎই আমার একটা দিনের কথা মনে পড়ে গেল।

ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর, পরমা আর আমি মারুতি নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম রায়চকের গঙ্গার ধারে। ঠিক উল্টোদিকে হলদিয়া। পোর্ট ট্রাস্টের ওই জায়গাটা আসলে পিকনিক স্পট। সেদিন গঙ্গার ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, ক্লান্ত হয়ে আমরা বসে পড়েছিলাম একটা গাছের নীচে। এমনভাবেই হাওয়া বইছিল সেদিন গঙ্গার দিক থেকে। নিজেদের নিয়ে সেদিন এমন মগ্ন ছিলাম, টেরও পাইনি, আশপাশে কেউ নেই। হঠাৎ মস্তান টাইপের দুটো ছেলে এসে দাঁড়িয়েছিল আমাদের সামনে। একজন খুব বিশ্রীভাবে বলে উঠেছিল, "এই যে দাদা, নোংরামি করার আর জায়গা পেলেন না। এখানে এ সব কী হচ্ছে?"

আচমকা ছেলে দু'টোকে দেখে আমার মুখ শুকিয়ে গেছিল। ইচ্ছে করলে ওরা ছিনতাই করতে পারে। পরমাকে অসম্মান করতে পারে। চিৎকার করে ডাকলেও কেউ সাহায্য করতে আসবে না। আমরা দু'জনই এক সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছিল, "নোংরামি মানে? আমরা তো চুপচাপ বসেছিলাম।"

ছেলেটা তড়পে উঠেছিল, "চোপ শালা, মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করতে এসে আবার কথা। পোর্টের গার্ডদের ডাকব?

পরমার দিকে তাকিয়ে দেখি, ওর চোখ-মুখ লাল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট টিপে ধরেছে। ওর এই লক্ষ্মণগুলো আমার চেনা। প্রচণ্ড রেগে গেলে ওর মুখের চেহারা এ রকম হয়ে যায়। অন্য ছেলেটাকে, তুলনায় একটু ভদ্র মনে হয়েছিল। একপাশে সরিয়ে নিয়ে ছেলেটা বলেছিল, "ঝামেলার কী দরকার দাদা। টাকাপয়সা কিছু থাকলে, দিয়ে ওকে ঠাণ্ডা করুন।"

কথাটা পরমা শুনে ফেলেছিল। আমি পকেট থেকে পার্স বের করতেই ও বলে উঠেছিল, "অয়ন, তুমি একটা পয়সাও এদের দেবে না।" তারপর মস্তান ছেলেটার দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা অথচ কঠিন গলায় বলেছিল, "যাও, তুমি গার্ডদের ডেকে আনো।"

—এই যে শুনুন, এখানে প্রেম করতে এলে ট্যাক্সো দিতে হয়।

আমার দিকে তাকিয়ে অন্য ছেলেটা বলেছিল, "এই শালাকে পেটালেই সুড়সুড় করে মাল বেরিয়ে আসবে রে।"

আর ঠিক তখনই, সামনে এগিয়ে এসে পরমা ঠাস করে চড় মেরেছিল ছেলেটার গালে। "এই নাও ট্যাক্সো। রাসকেল, ভিক্ষে করতে পারো না ?"

চড় খেয়ে ছেলেটার মুখ পাংশুটে হয়ে গেছিল। পরমা আমার হাত ধরে টান মেরেছিল, 'চলো, এখুনি রায়চক থানা যাব।" তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিল, "এক পাও যদি এগোও, আমি জুতো-পেটা করব তোমাদের।"

আশ্চর্য, ছেলে দুটো আর কিছু করার সাহসই পায়নি। ফেরার পথে সারাটা রাস্তা প্রচণ্ড গম্ভীর হয়ে ছিল পরমা। ওর ওই রুদ্রমূর্তি আগে কখনও দেখিনি। আড়চোখে ওকে দেখতে দেখতে গাড়ি চালাচ্ছিলাম বাড়ি ফিরে আসা পর্যন্ত পরমা একবারই শুধু বলেছিল, "কাওয়ার্ড কোথাকার।" আমাকে, না ওই ছেলে দুটোকে, সেদিন তা বুঝতে পারিনি।

... লেকে গাছের নীচে ঠাণ্ডা হাওয়ায়, বসে থাকতে থাকতে মনটা শান্ত হয়ে আসছিল। বায়চকের ঘটনা মনে পড়তেই, ফের মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। কলকাতার বাইরে যে ক'দিন ছিলাম, বেশ ভাল ছিলাম। সারাটা মন জুড়ে ছিল কাজ আর সবিতা। এই শহরটাই খারাপ। এত স্মৃতি চারদিকে, হঠাৎই মনে হল, জীবনে কখনও আমি শান্তি পাব না। মনের ভেতর ছটফটানি শুরু হতেই উঠে পড়লাম। বেলা প্রায় আড়াইটা। বাড়ি যেতে মন চাইছে না। তবু যেতে হবে। সবিতার জন্য। প্লেনে ওঠার আগে ও বলেছিল, বাড়ি পৌঁছে আমাকে একবার ফোন করবে। জানি না, ইতিমধ্যেই ফোন করেছে কি না।

বাইকের শব্দ শুনে দরজা খুলে দিল শোভামাসি। অন্য দিন জিজ্ঞেস করে, "ছোড়দাবাবু খেতে দেব ?" আজ কিন্তু জানতে চাইল না। দরজাটা খুলে দিয়ে শোভামাসি আমাকে উপেক্ষা করেই, রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। ড্রয়িংরুমে কেউ নেই। একতলাটাও ফাঁকা। এমন কখনও হয় না। দোতলায় নিজের ঘরে এসে আমি হাঁফ ছাড়লাম। একটু ঘুমোনো দরকার। বাথরুমে ঢুকে, মুখ চোখে জল দিয়ে, শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

চোখে তন্দ্রা। আধো ঘুম, আধো জাগরণের মাঝে হঠাৎ শুনলাম, "ছোটকা, ও ছোটকা।"

টুবলুর গলা। নিশ্চয়ই ফোন। না হলে ও বিরক্ত করত না। ওই তন্দ্রার ঘোরেই, কোনও রকমে তিনটে আঙুল দেখালাম। তার মানে, বলে দে, "অয়ন ব্যানার্জি বাড়ি নেই।"

BOIRBOI.NET

আঙুল দেখিয়েই পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। ঘুমের রাজ্যে ডুবে যাচ্ছি। চোখ খোলার সামর্থও আমার নেই।

—ছোটকা, ও ছোটকা ওঠো।

টুবলু ফের ডাকল। ওর গলাটা এ বার অন্য রকম শোনাচ্ছে। কেমন যেন ভয় পাওয়া সেই ডাক। আকুতি শুনে ; এক ঝটকায় চোখ দুটো খুলে ফেললাম।

টুবলু কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, "ছোটকা, পরমামাসির খুব অসুখ। নীচের ঘরে মা খুব কাঁদছে। আমার ভয় করছে ছোটকা। তুমি একবার নীচে নামবে ?"

॥ নয় ॥

ফোনটা এল রাত ঠিক ন'টার সময়।

লম্বা একটা ঘুম দিয়ে সবে মাত্র উঠেছি। স্নান করে এসে বসে রয়েছি বারান্দায়। কৌশিকদের বাড়িতে কেউ এফ এম চ্যানেল চালিয়েছে। মাঝেমধ্যে গান হচ্ছে। শুনছি। আমাদের এই ব্লকটা এই সময় নিঝুম হয়ে যায়। উত্তরদিকে রেল লাইন। মাঝেমধ্যে ট্রেনের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

কর্ডলেস কানে দিয়ে বললাম, "অয়ন স্পিকিং। কে বলছেন?"

অন্য প্রান্তে মৃদু হাসি, "কে বলছি, সেটা জানা কি খুব জরুরি?"

গলাটা বেশ ভরাট। জানাশুনা কারও বলে মনে হল না। অসময়ে যে-ই এই রসিকতাটা করুক, তাঁকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। এই ভেবে গলাটা যথাসম্ভব রুক্ষ করে বললাম, "ন্যাকামি আমি পছন্দ করি না। কাকে চান বলুন।"

—আপনাকেই। আপনার মতো কাউকে।

—তার মানে?

—হ্যাঁ, আপনার মতো কাউকে, যিনি জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছেন।

—আপনি কে আগে বলুন।

—ধরুন, আপনার একজন ওয়েল উইশার। যে আপনাকে হেল্প করতে চায়।

—কীভাবে?

—অয়নবাবু, আমি জানি আপনি একজন অনেস্ট রিপোর্টার। আপনাকে অন্য কোনও হেল্প করার দরকার নেই। ম্যাক্সিমাম আপনি কী চাইতে পারেন? খবর, স্রেফ খবর। সেনশেসনাল খবর। সেটাই আপনাকে দিতে চাই।

—কী খবর দিতে চান?

—করবেন? মাঝেরহাট ব্রিজের নীচে অজন্তা ম্যানসন বলে একটা ফ্ল্যাটবাড়ি আছে। সেই বাড়ির একটা ফ্ল্যাটে সুবীর মুখার্জি নামে এক ভদ্রলোক, এই আধ ঘণ্টা আগে খুন হয়েছে। ফ্ল্যাটের নম্বর ফোর সি। লোকে জানবে, আত্মহত্যা। পুলিশও সে কথা বলবে। আসলে খুন। আপনি এখখুনি ওই ফ্ল্যাটে চলে যান। এখনও কোনও রিপোর্টার খবরটা পায়নি।

—আপনি কী করে জানলেন, ওটা খুন?

—কেন না, খুনটা আমিই করেছি। না না, চমকে উঠবেন না। ওখানে গিয়ে খোঁজখবর করুন। যথাসময়ে আমার পরিচয় পাবেন। একটা কথা, ভুলেও কিন্তু পুলিশকে জানাবেন না এ সব। এখুনি যান। বিরাট সেনশেসনাল একটা খবর পেয়ে যাবেন। ডেফিনিট ফ্রন্ট পেজ।

—কে এই সুবীর মুখার্জি?

—আপনি তো একজন ক্রাইম রিপোর্টার। বের করুন।

—দেখুন মশাই, পাগলের প্রলাপ শোনার সময় আমার নেই। এসব গুল গাপ্পা অন্য জায়গায় দেবেন।

বলেই লাইনটা কেটে দিলাম। এ রকম উড়ো ফোন মাঝেমধ্যেই আমাদের কাছে আসে। কেউ নিশ্চয়ই লেগ পুল করছে। সুধীনের এই স্বভাবটা আছে। অপরের

পিছনে লাগা। রাতের দিকে, মাঝেমধ্যে ফোন ঘুরিয়ে, গলার স্বর বদলে, ও বদমাইসি করে, অন্যদের সঙ্গে। টেলিগ্রাফের তপন ঘোষকে একবার রাত দশটায় ফোন করে খবর দিয়েছিল, "কাশীপুরের লক গেটে তিনটে লাশ পড়ে আছে। আমি একজন স্থানীয় লোক বলছি। শিগ্গীর আসুন।" এ সব ক্ষেত্রে পাল্টা চেক করার নিয়ম। স্থানীয় থানা বা পরিচিত কারও বাড়িতে। তা না করে, তপন সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে যায়। রাত একটা অবধি লক গেটে ঘুরেও ও কোনও লাশ দেখতে পায়নি। পরে এ নিয়ে খুব হাসাহাসি হয়েছিল।

ফোনটা চেয়ারের হাতলে রাখতেই আবার বেজে উঠল। বোধহয়, ওই লোকটারই ফোন। যদি করে, তা হলে কপালে দুঃখ আছে। সুইচ টিপে কর্ডলেস কানে লাগাতেই বুঝতে পারলাম, নীচেও কেউ রিসিভার তুলেছে। না, সেই লোকটা নয়। মেজবৌদির ফোন। গলায় উদ্বেগ। এ প্রান্তে রিসিভারটা তুলেছে বুবুন। মেজবৌদি জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁরে, রমার কী হয়েছে?"

বুবুন বলল, "তুমি কার কাছ থেকে শুনলে?"

—সোমনাথ। বড়দা বোধহয় ওকে ফোন করেছিল। আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না।

সোমনাথ মেজবৌদির ভাই। তার মানে মেজবৌদি এখন বাপের বাড়িতে। বুবুন কী বলে সেটা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলাম। বিকেলে টুবলু এসে একবার বলেছিল বটে, পরমামাসির অসুখ। কিন্তু শুনেও আমি শুনিনি। তখন ঘুমের রাজ্যে ডুবে যাচ্ছি। পরমার অসুখ, তাতে আমার কী? আমার সঙ্গে ওর তো কোনও সম্পর্ক নেই। যাদের আছে, মাথা ঘামাক। পাশ ফিরে তাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

মেজবৌদির সঙ্গে কথা হয়ে যাচ্ছে বুবুনের। এক রাশ বিস্ময় নিয়ে মেজবৌদি হঠাৎ বলল, "কী বলছিস তুই বুবুন?"

—হ্যাঁ বৌদি, রমাদি সুইসাইড করতে চেয়েছিল। গোটা পনেরো স্লিপিং পিল খেয়ে ফেলেছিল। ভাগ্যিস, মাসিমা শোয়ার আগে একবার ওর ঘরে ঢুকেছিল। রাত্তির কেটে গেলে বোধহয় আর বাঁচানোই যেত না। খবর পেয়ে রাতেই বড়দা দৌড়ে গেল। আমরা গেলাম ভোরে।

—মাই গড। কী এমন হল রমার যে, সুইসাইড করতে গেল?

—জানি না।

কানের মধ্যে কে যেন একটা বোমা ফাটিয়েছে। আমি শুধু চি-ই-চি-ই শব্দ শুনছি। মাথাটা হঠাৎ বোঁ করে ঘুরে উঠল। সারা শরীর ঝিমঝিম করছে খবরটা শুনে। পরমা, পরমা সুইসাইড করতে চেয়েছিল? কেন? কালই তো তাজ বেঙ্গলে প্রিয় দিদি-জামাইবাবু আর হবু স্বামীর সঙ্গে ডিনার খেতে বসেছিল। ধাক্কাটা সামলে শুনলাম বুবুন বলছে, "ছোড়দাটা এমন অমানুষ হয়ে গেছে বৌদি, ভাবা যায় না। বিকেলে টুবলু গিয়ে বলা সত্ত্বেও, জানো, বাড়ি থেকে নড়ল না। একটু আগে দেখলাম, ঘুমিয়ে আছে। রমাদির যদি খারাপ কিছু হয়, তা হলে দেখো, সারা জীবন আমি ছোড়দার সঙ্গে কথাই বলব না।"

—ছোড়দা তো এমন ছিল না রে বুবুন।

—ছোড়দার ব্যবহারে বড়বৌদি এত কষ্ট পেয়েছে, সন্ধেবেলায় কাঁদতে কাঁদতে

নার্সিংহোমে গেল। রমাদির কোনও দোষ নেই। সব দোষ ছোড়দার। কম আঘাত দিয়েছে ?

—তুই যা-ই বল, রমাও কিন্তু বাড়াবাড়ি করত। এত জেদি হলে চলে ? আমি তো ভাবতেই পারছি না এ সব। একদিন বাড়ি নেই। এর মধ্যে এত কাণ্ড ঘটে গেল ? ওর যে বিয়ের কথা হচ্ছিল, তার কী হল ?

—জানো না ? সে তো নিজেই ভেঙে দিল। কাল তাজ বেঙ্গলে রাহুলদাকে ডাকল। ছোড়দার কথা খুলে বলে, জানিয়ে দিল, অন্য কাউকে বিয়ে করা সম্ভব নয়।

—ইস্। মেয়েটাকে আরও ভালবাসতে ইচ্ছে করছে রে বুবুন। কেমন আছে এখন ? কোন নার্সিংহোমে আছে ? আমার এখনই যেতে ইচ্ছে করছে।

—ভাল না বৌদি। বড়দা নিয়ে গেছে মেডিকো-তে। দেশপ্রিয় পার্কের কাছে। ওই নার্সিংহোমটা বড়দার এক বন্ধুর। তুমি আসছ কবে ?

—কাল সকালেই। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ছাড়ি তা হলে। দিদি ফিরলে, আমাকে একবার ফোন করিস।"

—ঠিক আছে। বলেই রিসিভারটা নামিয়ে রাখল বুবুন।

আর সিদ্ধান্তটা তখনই আমি নিয়ে ফেললাম, নার্সিংহোমে যাব। অন্যায় করেছি। খুবই অন্যায় করেছি আমি। বাইরে খবর জোগাড় করতে আমি এত ব্যস্ত থেকেছি ; এতদিন সময়ই পাইনি বাড়ির ভিতরের খবর নেওয়ার। নিজের উপর ঘেন্না হচ্ছে। বুবুন একটু আগে বলল, ছোড়দাটা অমানুষ। সত্যি আমি অমানুষ। দিনের পর দিন পরমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি। এ বাড়িতে ও টেলিফোন করলে, অন্যের হাতে দিয়ে দিয়েছি। এ বাড়িতে ও এলে, না চেনার ভান করে সরে গেছি। একটা মেয়ের পক্ষে কতটা সহ্য করা সম্ভব ? কাল রাতে তাজ বেঙ্গলের ঘরে আমি যখন সবিতার শরীর থেকে সুখ আদায় করছি, তখন নীচের রেস্তোরাঁয় বসে হয়তো পরমা আমাদের ভালবাসার গল্প শোনাচ্ছিল জার্মানির সেই ছেলেটাকে। আমার পরমা একটু বদলায়নি। আমিই খারাপ হয়ে গেছি।

প্রবল একটা টান অনুভব করলাম। রাজেন্দ্রানীর মতো ওর চেহারাটা হঠাৎই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। মাঝে মাঝে মেজদা বলত, "রমার মতো একটা আউটস্ট্যান্ডিং মেয়ে অয়নের মধ্যে যে কী দেখল, ভগবানই জানেন। ওর কপালে আরও ভাল ছেলে জুটত।" এখন বুঝতে পারছি, মেজদাই ঠিক। কোনও দিক থেকেই, আমি ওর যোগ্য নই। কী মুখ নিয়ে ওর সামনে গিয়ে আমি দাঁড়াব ? বুবুন জানে না। বড়দা জানে। বড় বৌদিও জানে। কাল রাতে তাজ বেঙ্গলে কী হয়েছিল। সবিতার সঙ্গে আমাকে দেখে পরমা বোধহয় তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল, খারাপ কিছু করার। কথা কাটাকাটি হলে, মাঝেমধ্যেই ও হুমকি দিত। চরম কিছু করে ফেলবে। প্রথমে ভয়ে আমি গুটিয়ে যেতাম। পরের দিকে অগ্রাহ্য করেছি। আমি ভাল করিনি। মোটেই ভাল করিনি। আজ ওর যদি কিছু হয়, তা হলে ও বাড়িতে তো বটেই ; এ বাড়িতেও কেউ আমাকে ক্ষমা করবে না। একটু আগে মেজবৌদি বলল, "মেয়েটাকে আরও ভালবাসতে ইচ্ছে করছে রে বুবুন।" কথাটা মনে পড়তেই উঠে দাঁড়ালাম। যে যা-ই ভাবুক, পরমার সামনে গিয়ে আমাকে দাঁড়াতেই হবে। এখনই। যত রাত্রি হোক।

নীচে নেমে গ্যারেজ থেকে বাইকটা বের করেই, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম রাসবিহারীর দিকে। দেশপ্রিয় পার্কের ঠিক কোন দিকটায় নার্সিংহোম, জানি না। তাতে কোনও অসুবিধা নেই। বের করে নেওয়া যাবে। পরমাকে আমি এখনই দেখতে চাই। একবার দুর্গাপুর ব্রিজে ওঠার মুখে, আর একবার লেক মার্কেটের কাছে অ্যাক্সিডেন্ট করতে করতে বেঁচে গেলাম। মারুতি থেকে মুখ বাড়িয়ে একজন বলেও গেল, "কী হে ছোকরা, মরার শখ হয়েছে?" অন্য সময় হলে ওই মারুতিটাকে আমি তাড়া করতাম। এখন আমার হাতে সময় নেই।

খোঁজাখুজি করে, কারমেল স্কুলের কাছে ওই নার্সিংহোমে যখন পৌঁছলাম, রাত তখন দশটা। একটা সময় এই কারমেল স্কুলেই পড়ত পরমা। খুব গর্ব ওর, স্কুল নিয়ে। কথায় কথায় আমাকে শোনাত, "তাপ্পি মেরো না। জানো, আমি কারমেলের মেয়ে?" স্কুলের কাছে চারতলা নার্সিংহোমের কোনও একটা ঘরে ও এখন আচ্ছন্নের মতো শুয়ে আছে। বোধহয় সেটা জানেও না।

গ্রাউন্ড ফ্লোরের এক পাশে রিসেপশন। অন্য পাশে ভিজিটরদের বসার জায়গা। দু'জায়গাতেই বেশ কয়েকটা সোফা সাজানো রয়েছে। অত রাতেও অপেক্ষা করছেন আট-দশজন লোক। নিশ্চয়ই রোগীদের কেউ। রিসেপশনে বসে আছে একটা অল্প বয়সী মেয়ে। জিজ্ঞেস করলাম, "আমার একজন পেশেন্ট আছেন এখানে। নাম পরমা চ্যাটার্জি। কত নম্বর রুমে, বলতে পারেন?

—আজই ভর্তি হয়েছেন?

—না, কাল অনেক রাতে।

সামনেই কম্পিউটার। কী বোর্ডে আঙুল চালিয়ে মেয়েটা বলল, "আই সি ইউ ওয়ানে আছেন।"

—একটু দেখা করা যাবে?

—না। ভিজিটিং আওয়ার্সে আসবেন। বিকেল পাঁচটা থেকে সাতটা।

—দেখুন, আমি একজন রিপোর্টার। রাতের ডিউটিতে যে ডাক্তার আছেন, তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

কাগজের লোক শুনে মুখের রঙ বদলে গেল মেয়েটার। সম্ভ্রম দেখিয়ে বলল, "এসটু দাঁড়ান। কথা বলিয়ে দিচ্ছি।"

রিসেপশনের মধ্যেই একটা পেডেস্ট্রিয়াল ফ্যান দেখে, সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। গায়ের জামাটা ঘামে জবজব করছে। ফ্যানের সামনে দাঁড়িয়ে উপরের দু'তিনটে বোতাম খুলে দিলাম। পরমাকে না দেখে, আজ রাতে এখান থেকে আমি নড়ছি না। ডাক্তারের সঙ্গে ঝামেলা হয়, হোক, খবর জোগাড় করতে গিয়ে এ সব ঝামেলা, অনেক পুইয়েছি।

—আপনি কি পরমার কাছে এসেছেন?

প্রশ্নটা শুনে, মুখ তুলে তাকাতেই ছেলেটাকে চিনতে পারলাম। কাল গায়ে ছিল সিল্কের রঙচঙা শার্ট। আজ পরা অ্যাডিডাসের টি শার্ট। আমার কাঁধ সমান লম্বা। টিপিক্যাল সাউথ ক্যালকাটার ছেলে। বললাম, "হ্যাঁ। আপনি?"

—আমি রাহুল মুখার্জি। আমার বাড়ি এই কাছেই, বিপিন পাল রোডে। আপনিই কি অয়নদা?

—হ্যাঁ।

—পরমার কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি। আমি থাকি স্টুটগার্টে। এক মাসের ছুটি নিয়ে এসেছি। ঘটনাচক্রে তখনই পরমার সঙ্গে আলাপ অয়নদা, আপনি এত দেরিতে এলেন ?

ছেলেটার মুখে পরমার নাম শুনেই চিনচিনে রাগ হতে শুরু করল। তা দমিয়ে রেখে বললাম, "ফ্রেঞ্চ টিভি-র একটা কাজে আমি সুন্দরবনে গেছিলাম। একটু আগে ফিরেছি। আমাদের আর কেউ নেই ?"

—আছেন। পরমার বাবা আর আপনার দাদা। ওরা একটু আগে, হাজরার মোড়ে একটা ওষুধ কিনতে গেছেন।

এই সময় রিসেপশনের মেয়েটা ডাকল, "এক্সকিউজ মি, এ দিকে একবার আসবেন। ডক্টর জানতে চাইছেন, আপনি কোন কাগজের ?

—বলুন, দৈনিক প্রভাত। অয়ন ব্যানার্জি।

মেয়েটা ফোনে বলতেই, ও পাশ থেকে কিছু শুনে আমাকে বলল, "আপনি বসুন। ডক্টর আসছেন।"

রাহুল ছেলেটা আমার পাশেই দাঁড়িয়ে। ছেলেটাকে আমি সহ্য করতে পারছি না। এই বাস্টার্ডটার জন্য একটা সপ্তাহ মনে মনে দগ্ধ হয়েছি। বুবুনের কথা যদি সত্যি হয়, বিয়েটা পরমা নিজেই ভেঙে না দিলে হয়তো, এই ছেলেটা পরমাকে নিয়ে এতদিনে স্টুটগার্টে চলে যেত। ইচ্ছে করেই ওর সামনে ফ্রেঞ্চ টিভি-র কথা তুললাম। বাস্টার্ডটা যাতে আমাকে ফালতু না ভাবে। ইচ্ছে করলে এই অয়ন ব্যানার্জিও এখন আমেরিকায় থাকতে পারত। যায়নি। বড় রিপোর্টার হওয়ার নেশায় এদ্দিন মশগুল ছিল। নেশাটা কেটে গেছে। খুব বিচ্ছিরিভাবে কেটে গেছে। এ বার অয়ন ব্যানার্জি মানুষ হবে। পরমা যা চাইবে, তা হওয়ার চেষ্টা করবে।

—আরে, অয়নদা তুমি ? নামটা শুনেই আমার সন্দেহ হয়েছিল।

তাকিয়ে দেখি, চান্দ্রেয়ী। মুখটা খুশিতে ঝকঝক করছে। পরনে সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ি। তার উপর সাদা হাউস কোট। কাঁধে একটা স্টেথিসকোপ। হাসিমুখেই সামনে এসে দাঁড়াল ও। আজ সকালেই বি আর সি-র গেটে ওকে দেখেছি, দাঁড়িয়ে একজনের সঙ্গে কথা বলতে।

—আই সি ইউ ওয়ানে আমাকে নিয়ে যাবে চান্দ্রেয়ী ?

—চলো। পেশেন্ট তো মিস চ্যাটার্জি। কে হয় ?

কঠিন প্রশ্ন। রাহুলের সামনে উত্তরটা দেব না বলেই লিফটের দিকে পা বাড়ালাম। তারপর বললাম, "রিলেটিভ। কেমন আছে ?"

—এই মাত্র দেখে এলাম। জ্বরটা নেই। তবে রেস্টলেস ছিল। সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়েছি।

দু'জনে মিলে লিফটে ঢুকলাম। গলায় গলিয়ে চান্দ্রেয়ী দু'হাতে ধরে আছে স্টেথিসকোপ। মুখটা একটু কাত করে আমার দিকে তাকিয়ে। ওর পিঠ ঠেকে আছে লিফটের দেয়ালে। ওর এই মুখ ভঙ্গিটা বদলায়নি। আজ থেকে দশ বছর আগেও লেক ক্লাবে এসে ও এভাবেই কথা বলত আমার সঙ্গে।

—কেমন আছে একজ্যাক্টলি, বলো তো পরমা ?

—কে পরমা ?

—পেশেন্ট। মিস চ্যাটার্জি।

—ও। হাইপারটেনশন। অনেক দিন ধরে বোধহয় ডিপ্রেসড। ডাঃ মিত্র বলছিলেন, স্লিপিং পিল খেয়ে সুইসাইড অ্যাটেম্পট করেছিলেন।

—মাই গড।

—সারপ্রাইজিং। তোমার রিলেটিভ, অথচ তুমি জানো না।

নিজেকে সামলে বললাম, "আমি কিছুদিন বাইরে ছিলাম চান্দ্রেয়ী। অফিসের কাজে। একটু আগে ফিরেছি।"

—আই অ্যাম সরি অয়নদা। মেয়েটার কেস হিস্ট্রি যা শুনলাম, তাতে তো এই অসুখ করা উচিত না। হঠাৎ কোনও মেন্টাল শক পেলেও অবশ্য হতে পারে। ইনভেস্টিগেশন পর্যায়ে তা জানা যাবে।

মনে মনে বললাম, ইনভেস্টিগেশনের কোনও দরকার নেই চান্দ্রেয়ী। কালপ্রিট তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে। সব বলব। দয়া করে আমার পরমাকে তোমরা সারিয়ে দাও। আমি জানি, একটা সময়, তুমি আকৃষ্ট হয়েছিলে আমার প্রতি। সেই আকর্ষণ যদি বিন্দুমাত্রও থেকে থাকে, তাহলে সুস্থ করে তোলো পরমাকে।

লিফট এসে দাঁড়াল চারতলায়। চান্দ্রেয়ী ডাকল, "এসো। নর্মালি আমরা পেশেন্টের সঙ্গে কাউকে থাকতে দিই না। তবে ইচ্ছে করলে, আজ রাতে তোমরা কেউ থাকতে পারো।"

আই সি ইউ ওয়ানে ঢুকে আমি থমকে দাঁড়ালাম। এ কী চেহারা হয়েছে পরমার! ধবধবে সাদা বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। মুখটা এক পাশে কাত করা। চুল অবিন্যস্ত। চোখের কোণে পুরু কালি। ঠোঁটটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। পরনে একটা দামি ম্যাক্সি, প্রায় হাঁটু অবধি উঠে আছে। একটা হাত ঝুলে আছে খাটের কিনারায়। দৃশ্যটা দেখেই মন খারাপ হয়ে গেল। রিপোর্টার হলেও, আমরা তো মানুষ। ম্যাক্সিটা টেনে পা পর্যন্ত নামিয়ে দিলাম। হাতটা তুলে দিলাম বিছানায়। দেড় বছর পর পরমাকে আমি ছুঁলাম।

যা বোঝার, চান্দ্রেয়ী বুঝে নিল। মাথার কাছে গিয়ে পরমার কপালে হাত ছুঁইয়ে ও বলল, "জ্বরটা আর নেই। ভাল সিম্পটন।"

—চান্দ্রেয়ী, পরমা সুস্থ হয়ে উঠবে তো ?

—ডাঃ মিত্র ভাল বলতে পারবেন। এ সব কেস, যে কোনও দিকে টার্ন নিতে পারে। দু-একদিন অবজারভেশনে রাখতে হবে।

কথা বলতে বলতেই হাতঘড়ির দিকে তাকাল চান্দ্রেয়ী। তারপর বলল, "অয়নদা, তুমি বসো। আমি একটা রাউন্ড মেরে আসি।"

ঘরে একটাই চেয়ার। টেনে বসে পড়লাম। পরমার শরীরে কোনও স্পন্দন টের পাওয়া যাচ্ছে না। গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে। খুব অসহায় দেখাচ্ছে ওকে। একটা প্রাণচঞ্চল, উচ্ছল মেয়ের এমন অবস্থা, ভাবতেও পারছি না। নার্সিংহোম, হাসপাতালে আমি আসতে চাই না। স্যালাইন, নিডল, ব্লাড—এ সব শুনলেই শরীরে আমার অস্বস্তি হতে শুরু করে। বাইরে পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকালাম। আই সি ইউ ওয়ানের দরজা খোলা। সেদিকে তাকিয়ে, পাশের ঘরে ঝোলানো স্যালাইনের একটা

বোতল দেখতে পেলাম। পেশেন্টকে দেখা যাচ্ছে না। একজন অল্পবয়সী নার্স সেই ঘরে ঢুকে গেল দ্রুত পায়ে।

এয়ার কন্ডিশন মেশিন থেকে মৃদু একটা শব্দ আসছে। সেটা কোন ঘরে চলছে, বুঝতে পারলাম না। পরমার দিকে তাকালাম। বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। একবার ইচ্ছে হল, ঘুম থেকে ডেকে তুলে ওকে বাড়ি নিয়ে যাই। অথবা চলে যাই, এমন কোনও জায়গায়, যেখানে কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না। চান্দ্রেয়ী বলল, ও মেন্টালি ডিপ্রেসড। এই অসুস্থতা মানসিক অবসাদের জন্য। চান্দ্রেয়ী কিন্তু বলল না, পরমা ভাল হয়ে যাবে। ভয়ের কিছু নেই। চুপচাপ বসে ভাবতে লাগলাম পুরনো কথা।

পরমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা খারাপ হতে শুরু করে আমি দৈনিক প্রভাতে ঢোকার পর থেকে। দায়ী আমিই। কাজের নেশায় ওকে সময় দিতে পারতাম না। ও ছটফট করত। আমি কথা দিয়ে কথা রাখতে পারতাম না। ও অসন্তুষ্ট হত। মনে আছে, একদিন দুপুরে হঠাৎ ফোন করে পরমা বলেছিল, "এই, আজ একবার আমাদের বাড়িতে আসবে?"

একটা প্রেস কনফারেন্সে যাওয়ার জন্য তখন বেরোচ্ছিলাম। তাড়াহুড়ো ছিল। বলেছিলাম, "কী ব্যাপার বলো তো?"

—আমার বাবার এক বন্ধু সস্ত্রীক আসবেন সন্ধের দিকে। আমেরিকায় থাকেন। ওরা তোমাকে দেখতে চান।"

—যদি আটটা-সাড়ে আটটায় যাই?

—ওদের আটকে রাখব। প্লিজ, তুমি কিন্তু ফেল করো না।

—না। যাব।

সেদিন সন্ধে সাতটায় অফিস থেকে বেরোবার সময়, হঠাৎই খবর এল, বেহালায় ভেজাল তেল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন কিছু লোক। রিপোর্ট করতে যেতে হবে। বাধ্য হয়ে সেখানে ছুটলাম। সেই খবর করতে করতে রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা হয়ে গেল। বাড়িতে ফিরলাম রাত বারোটায়। ফিরেই হঠাৎ মনে পড়েছিল পরমার কথা। খুব আফসোস হয়েছিল কথা রাখতে না পারার জন্য।

রাত সাড়ে বারোটায় ফোন করেছিল পরমা, "কী হল, এলে না যে?"

ওর গলায় ঝাঁঝ। বললাম, "অফিসে আটকে গিয়েছিলাম।"

—একটা ফোন করতে পারলে না?

—সময় পাইনি রমা।

—অয়ন, প্লিজ তুমি এই চাকরিটা ছাড়ো। তোমার সঙ্গে কতদিন ভাল করে কথা বলতে পারিনি, বলো তো? তোমার বাড়ির লোকেরাও আজকাল তোমাকে দেখতে পায় না।

—রমা, দ্যাখো, প্রত্যেক মানুষের জীবনেই একটা ইচ্ছে লুকিয়ে থাকে। কেন তুমি বুঝছ না?

—আমার ইচ্ছের কোনও দাম নেই তোমার কাছে?

—কেন থাকবে না?

—তাহলে তুমি তা কেন বুঝছ না। তোমার জন্য দিব্যেন্দু আঙ্কলকে দশটা অবধি

বসিয়ে রাখলাম। যাওয়ার সময় কী বলে গেল জানো ? ...আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ তুমি রাখতে পারলে না ?

—আই অ্যাম সরি রমা। তোমার আঙ্কলকে বোলো, অন্য একদিন নিজে গিয়ে দেখা করে আসব।

—মাই ফুট। তোমার এই ফালতু কথায়, আমি অন্তত ভুলছি না।

—প্লিজ, তুমি রাগ কোরো না।

—আমাকে তুমি ভালবাসো কি না, আগে বলো।

—তোমার কি তাতে সন্দেহ আছে, রমা ?

—"আছে। এখন হচ্ছে।" কান্নায় ভিজে এসেছিল পরমার গলা, "আমি তোমার জন্য কী করিনি, বলো ? এই তার প্রতিদান দিচ্ছ। আমি তোমার কোনও কথা শুনব না। তুমি কাগজের চাকরি ছেড়ে দেবে। কালই পাঠাবে রেজিগনেশন লেটার।"

—তা সম্ভব নয় রমা।

—ঠিক আছে, দেখি তুমি চাকরি ছাড়ো কি না। বলেই ফোনটা সেদিন ছেড়ে দিয়েছিল পরমা।

তিক্ততার সেই শুরু। একটা সময় এল, খবরের কাগজ, না, রমা—কাকে ছাড়ব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। একবার ভাবতাম, পরমার প্রতি আমি অন্যায় করছি। অন্যদিকে, একেক সময় মন বিদ্রোহ করে উঠত। একটা মেয়ের কথা শুনে পেশায় পিছিয়ে পড়ব ? রিপোর্টার হিসাবে এতটা আবেগপ্রবণ হওয়া আমার উচিত না। পেশায় আরও মন দেওয়া উচিত। না হলে কম্পিটিশনে টিকতে পারব না।

এই দোটানার মাঝে, বড়বৌদি একদিন বলল, "অয়ন, রমা রেস্টলেস হয়ে যাচ্ছে। পারলে ওকে একটু সময় দাও।"

আমি অসহায়ের মতো বলেছিলাম, "কী করে দেব, বলো। তুমি তো দেখছ, জ্যোতি চড়চড় করে কতটা উঠে গেল। আমার কিছুই হল না। রমা কেন বুঝছে না ?"

—জানোই তো ও কেমন জেদি মেয়ে। ভয় লাগছে, কোনওদিন খারাপ কিছু না আবার করে বসে।"

—তুমি একটু বোঝাও না বৌদি। আমাকে একটা বছর সময় দিক। একটু দাঁড়াই।

—আমার কথা ও শুনবে ? বলতে গেলে হয়তো, আমার সঙ্গেই কথা বন্ধ করে দেবে। আসলে তোমাকে ঘিরেই ওর সব কিছু। ওর কথা একটু ভাবো, অয়ন।

সেদিন সারারাত ভাবলাম। পরদিন সকালেই ফোন করলাম লেক গার্ডেন্সে। রমা ধরতেই বললাম, "আজ একটু বেরোবে আমার সঙ্গে ?"

—হঠাৎ ?

—তোমাকে চাইনিজ খাওয়াব। ট্যাংরায় চিনে পট্টিতে নিয়ে গিয়ে।

—আজ তোমার দৈনিক প্রভাত নেই ? ভেজাল তেল খেয়ে আজ কেউ অসুস্থ হয়নি ?

ওর রাগ দেখে হো হো করে হেসে উঠেছিলাম, "না হয়নি। তোমাকে কখন তুলে নেব, বলো।"

BOIRBOI.NET

—আমি ব্যস্ত। আজ না।

—তুমিও কি রিপোর্টারি শুরু করেছ?

—না। আমার স্ট্যাটাস তাতে বিন্দুমাত্র বাড়বে না।

—আচ্ছা বাবা, আর ঝগড়া না। আজ সারাদিন ফ্রি। মন খুলে গল্প, আড্ডা, প্রেম।

—সম্ভব না।

—রমা, সেদিনের জন্য মাফ চাইছি। ভুলে যাও ব্যাপারটা।

—তুমি ভুললেও, আমি ভুলতে পারব না। আন্টি আমাকে সেদিন একটা কথা বলে গেছে। হয়তো সেটাই ঠিক।

—কী বলে গেছেন, তোমার আন্টি?

—এই ছেলেকে বিয়ে করে, জীবনে তুই সুখী হবি না।

—তোমার আন্টি কি বিয়েতে ডক্টরেট?

—ঠাট্টা কোরো না।

—কখন আসব, তাহলে বলো?

—কবে রেজিগনেশন দেবে, আগে তুমি বলো।

—রমা, তুমি কিন্তু জেদ করছ।

—তুমি জানো না, আমি কতটা জেদি?

—ঠিক আছে, তুমি তাহলে তোমার জেদ নিয়ে থাকো।

ডাইনিং টেবিলে বসে সব কথা সেদিন শুনছিল বড়বৌদি। আমাকে ফোন রেখে দিতে দেখে বলল, "কী হল অয়ন, রমা যেতে চাইছে না?"

—না বৌদি। আমি কী করব, বুঝতে পারছি না।

—বোকা ছেলে। এখুনি ওদের বাড়ি যাও। তোমাকে সামনাসামনি দেখলে ও না করতে পারবে না। ছেলেরা এত অধৈর্য হলে চলে?

বেলা এগারোটায়, ওদের বাড়ি পৌঁছতেই বুঝলাম, বড়বৌদি যা বলেছিল, ঠিক। আমাকে দেখেই খুশিতে ঝলমল করে উঠেছিল রমা। দোতলার বারান্দা থেকে দৌড়ে নেমে এল নীচে। সেই সময় ডিপ চকোলেট কালারের একটা প্যান্ট ছিল আমার। রমাই সেই প্যান্টের পিস কিনে দিয়েছিল এয়ার কন্ডিশন্ড মার্কেট থেকে, কোনও একটা অনুষ্ঠান উপলক্ষে। ওকে খুশি করার জন্যই সেদিন সেই চকোলেট কালারের প্যান্টের সঙ্গে পরে গেছিলাম, আকাশ-নীল একটা টি শার্ট। লন্ডন থেকে লা-কস্তের সেই টি শার্ট একবার আমার জন্য নিয়ে এসেছিলেন ওর বাবা।

আমাকে দেখেই রমা বলে উঠেছিল, "এ সব কী পরে এসেছ তুমি? খোলো এখখুনি টি শার্টটা খুলে ফেলবে।"

ড্রয়িংরুমে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন ওর বাবা। বলে উঠেছিলেন, "আঃ, আগে ওকে বসতে দে।"

রমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল, "তুমি চুপ করো তো বাবা। কী টেস্ট! এই জন্যই ওর সঙ্গে আমার কোথাও বেরোতে ইচ্ছে করে না।"

—কেন, অয়নকে তো বেশ হ্যান্ডসাম দেখাচ্ছে।

—দেখাক। এই ড্রেস পরে সেদিন ও টিভি প্রোগ্রাম করেছে, বাড়িতে এত শার্ট।

অন্য কিছু পরে আসতে পারল না ?

পরমার মা বেরিয়ে এসেছিলেন রান্নাঘর থেকে। "আজ আর তোমরা কোথাও বেরিও না বাবা। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে এখানেই গল্পগুজব করো।"

ওর বাবাও বললেন, "সেই ভাল।"

সারা বাড়িতে খুশির হাওয়া বয়ে গেছিল সেদিন। প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াচ্ছিল সেদিন পরমা। এক ফাঁকে দোতলায় ওর ঘরে ডেকে নিয়ে গেছিল। তারপর ঘরের দরজা বন্ধ করে বলেছিল, "টি শার্টটা খোলো।" বলেই টি শার্ট ধরে টানতে শুরু করেছিল।

টি শার্ট খুলে আমি বলেছিলাম, "আর কিছু খুলতে হবে রমা ?"

—অসভ্য কোথাকার।

নিজের ওয়ারড্রোব খুলে ময়ূরপঙ্খী রঙের একটা জামা বের করে পরমা বলেছিল, "এটা পরো। তোমার জন্য কিনে রেখেছিলাম।"

—কবে কিনলে রমা ?

—যবেই হোক, তোমার জানার দরকার কী।

জামা পরে ড্রেসিং টেবলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই, পিছনে দাঁড়িয়ে পরমা বলে উঠেছিল, "যাক, তবু ভদ্রলোকের মতো লাগছে।"

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। তারপর পাঁজাকোলা করে তুলে বিছানায় শুইয়ে, বলেছিলাম, "এবার একটু ভদ্রলোককে আদর করতে দাও।"

—এই, না। মা কিন্তু এখখুনি উপরে উঠে আসবে।

—আসুক। বলেই ওকে আদর করতে শুরু করেছিলাম। আমার কোলে মাথা রেখে পরমা চোখ বন্ধ করে ছিল।

—এই আজ ব্যান্ডেল চার্চে যাবে ?

—হঠাৎ ওখানে ?

—তুমি রাগাবে না বলো। তাহলে একটা কথা বলব।

—না রাগাব না।

—ক্লাস ইলেভেনে পড়ার সময়, স্কুল থেকে একবার আমাদের ব্যান্ডেল চার্চে নিয়ে গেছিল। ওখানে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, পরেরবার যখন আসব তখন অয়নকে নিয়ে আসব। যাবে ওখানে ?

BOIRBOI.NET

—চলো।

লাফিয়ে উঠেছিল রমা, "তুমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াবে ? যাও না। চট করে শাড়িটা পালটে নেব।"

—রমা, আমি চোখ বুজে থাকলে হবে ?

—না মশাই, হবে না।

বাধ্য হয়েই সেদিন আমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

দ্রুত লাঞ্চ সেরে আমরা সেদিন বেরিয়ে পড়েছিলাম বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ। গাড়ি ছুটিয়ে দিয়েছিলাম ব্যান্ডেলের দিকে। আকাশে পেঁজা তুলো মেঘ। রমা একবার বলে উঠেছিল, "আজ বৃষ্টি হলে ভাল হয়।"

পিছনে লাগার জন্য বলেছিলাম, "তুমি এম এ পাশ করেছিলে ?"

—তার মানে ?

—সার্টিফিকেটটা দেখিও তো। আমার সন্দেহ আছে।

—কারণ ?

—পেঁজা তুলো মেঘে কোনওদিন বৃষ্টি হয় ? বুদ্ধু কোথাকার।

—তাই তো। সরি।

অসম্ভব খুশি খুশি লাগছিল সেদিন পরমাকে। এক হাত স্টিয়ারিং-এ রেখে অন্য হাতে ওকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। কথায় কথায় তখনই ও আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল, ঝড়-জল-বৃষ্টি যাই হোক না কেন, সপ্তাহে একটা দিন আমরা অবশ্যই আউটিংয়ে বেরোব। মনে আছে, সেদিনই প্রথম রমা আমাকে চুমু খেয়েছিল। কানের লতি কামড়ে ধরে ফিসফিস করে বলেছিল, "গুড বয়।"

ব্যান্ডেল চার্চে গিয়ে আমি সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম। দুজনে মিলে ঘণ্টাখানেক ঘুরে, সব দেখে ক্লান্ত হয়ে বসলাম একটা জায়গায়। হঠাৎ দেখি, এক জাপানি মহিলাকে ঘিরে ছোট্ট ভিড়। হয়তো কোনও ট্যুরিস্ট। প্রথমে অতটা খেয়াল করিনি। তারপরই দেখি, অরুণাভ নামে একজন ফ্রিল্যান্স ফোটোগ্রাফার ছবি তুলছে। ছেলেটাকে মাঝেমধ্যেই আমাদের অফিসে দেখতাম। থাকত বাঁশবেড়িয়া, না কোথায়। পরমাকে একটু বসতে বলে, কৌতূহলী হয়ে উঠে গেলাম ওর কাছে।

—ভদ্রমহিলা কে, অরুণাভ ?

—বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর মেয়ে। এই প্রথম ইন্ডিয়াতে এসেছেন। অয়নদা, খবরটা আপনি পেলেন কীভাবে ?

—আরে, আমি এখানে বেড়াতে এসেছিলাম।

—কোনও কাগজ জানে না অয়নদা, আপনার দারুণ একটা এক্সক্লুসিভ হয়ে যাবে। ছবি নেবেন ?

—অফ কোর্স। ভদ্রমহিলা উঠেছেন কোথায় ? কলকাতায় ?

—না। রাসবিহারীবাবুর পৈতৃক বাড়ি চন্দননগরে। ভদ্রমহিলা এই প্রথম পৈতৃক ভিটেয় এলেন। কাউকে জানাননি। শুধুমাত্র বাড়ির লোকেরা জানেন।

—তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে ?

—ভীষণ। সকাল থেকেই ওনার পিছনে লেগে রয়েছি। আমিই এখানে নিয়ে এলাম। চার্চের ব্যাকগ্রাউন্ডে ছবি তুলব বলে।

—চলো। ওনার সঙ্গে গিয়ে কথা বলি।

সাংবাদিকতা সত্ত্বাটা এমন চাড়া দিয়ে উঠল যে, ভুলে গেলাম রমাও সঙ্গে রয়েছে। রাসবিহারী বসু স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় জাপানে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বিয়ে করেন এক জাপানি মহিলাকে। স্বাধীনতার পঞ্চাশতম বছরে তাঁদের মেয়ে ভারতের মাটিতে, এই খবর পেলে কাগজ ফ্রন্ট পেজ করবেই। অরুণাভর সঙ্গে গিয়ে ভদ্রমহিলাকে ধরলাম। কথা বলতেই বাবার সম্পর্কে নানা ঘটনা বলতে শুরু করলেন উনি। বললেন, বাবাকে নিয়ে একটা বই লিখছেন। সেই কারণেই, চান না পাবলিসিটি হোক। চুপচাপ কাজ করে তিনি ফিরে যেতে চান জাপান।

ইন্টারভিউ নিয়ে অরুণাভকে বলেছিলাম, "ছবি তৈরি করে রাত আটটার মধ্যে তুমি আমাদের অফিসে আসবে। আর কেউ যেন না জানে।"

—নিশ্চিন্ত থাকুন, অয়নদা, কেউ জানবে না।

বাগানে ফিরে দেখি, রমা নেই। বুকটা ধক করে উঠেছিল। গাড়িটা পার্ক করা ছিল বাইরে। তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে দেখি, রমা চুপ করে বসে আছে। ড্রাইভারের সিটে বসে, গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বলেছিলাম, "এই, এখুনি ফিরে যেতে হবে।"

রমা বলে উঠেছিল, "এখানে এসেও তোমাকে রিপোর্টারি করতে হবে? কী এমন খবর? কাল লিখো।"

—তা হয় না রমা। খবরের কাগজে কাল বলে কিছু নেই।

কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেছিল। শেষে বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম, "তুমি যদি না যাও, আমি একাই চলে যাব।"

কথাটা শুনে রমা গুম হয়ে গেছিল। কলকাতায় ফিরে এলাম সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়। সারা রাস্তায় কোনও কথা বলেনি, বাড়িতে নেমে যাওয়ার সময় রমা বলেছিল, "জার্নালিজম আর আমার মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হবে অয়ন। এভাবে চলতে পারে না।"

আমার মাথায় তখন রাসবিহারী বসু এবং তাঁর মেয়ে। রিপোর্টটা কীভাবে সাজাব তাই ভাবছি। অন্যমনস্কভাবে বলেছিলাম, "রমা, আমাকে ঘণ্টা দুই টাইম দাও। ঘুরে আসছি। তারপর তোমার কথার জবাব দেব।"

—জবাব আমি পেয়ে গেছি। তুমি যাও। আর কোনওদিন এসো না।

বলে প্রায় দৌড়েই ও বাড়ির ভেতর ঢুকে গেছিল।

সেদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরেছিলাম রাত এগারোটায়। ডাইনিং টেবিলে আমাকে চুপচাপ খেতে দেখে বড়বৌদি জিজ্ঞাসা করেছিল, "আবার বোধহয় কোনও গণ্ডগোল করেছ, অয়ন?"

—রমা আমাকে ভুল বুঝছে বৌদি।

—কী হয়েছে, খুলে আমাকে সব বলো তো ভাই।

সারাদিনের সব কথা আমি বলেছিলাম বড়বৌদিকে। পরমার শেষ কথাটাও। শুনে বড়বৌদি হেসে বলেছিল, "এখখুনি তুমি একবার ফোন করবে। না ধরলে আবার করবে। ওর প্রতি আগ্রহ না দেখালে, ও তো ভুল বুঝবেই।"

খাওয়া শেষ করে, উপরে গিয়ে ফোন করেছিলাম লেক গার্ডেন্সে। ফোনটা ধরেছিলেন পরমার মা। "মাসিমা, রমাকে একটু দেবেন?"

—তোমাকেই ফোন করতে যাচ্ছিলাম বাবা। রমার সঙ্গে কি তোমার আজ ঝগড়া হয়েছে?

—না তো।

—ফিরে এসে ও যে সেই ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছে, খেতেও নামল না। তুমি একটু কথা বলো তো বাবা।

—দিন।

একটু পরেই গলা শুনতে পেলাম পরমার, "কেন তুমি ফোন করেছ? তোমার লজ্জা করে না?"

—না করে না। খাওনি কেন?

—তাতে তোমার কী?

—তার মানে ? আমার উপর রাগ করে তুমি মাসিমা-মেসোমশাইকে কষ্ট দেবে ?

—বেশ করব দেব। আমি কষ্ট পেলে, সবাইকে আমি কষ্ট দেব।

—ইটস নট ফেয়ার রমা। তোমাকে সবাই আমরা ভালবাসি। সেই সুযোগটা তুমি নিচ্ছ।

—ঘোড়ার ডিম ভালবাসো। ভালবাসলে, আমাকে ইগনোর করতে না।

—কে তোমাকে ইগনোর করেছে ? আমি ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি। কেন তুমি আমাকে ফেলে ওই ভদ্রমহিলাকে ইন্টারভিউ করতে চলে গেলে ? জানো, আমাকে একা বসে থাকতে দেখে, দুটো ছেলে বিচ্ছিরি টিজ করছিল।

—আমাকে বললে না কেন ?

—কী করতে তুমি ? মারপিট করতে ? আমি কত কী ভেবে ওখানে গেলাম। তুমি সব নষ্ট করে দিলে।

—আই অ্যাম সরি রমা। আবার একদিন যাব।

—না, তোমাকে যেতে হবে না। তুমি লেখা নিয়েই থাকো। আমি কে ? শর্মিলা না কে তোমার গুণগ্রাহী, তার সঙ্গে যেও।

—কী ফালতু কথা বলছ ?

—আমি সব জানি। আমাকে লুকিও না অয়ন।

—কে তোমার মাথায় এসব ঢুকিয়েছে রমা ?

—কেউ না। তোমার কথা শেষ হয়েছে ? আমার ভীষণ মাথা-যন্ত্রণা করছে। একদিন চরম কিছু করে বসব, সেদিন বুঝবে।

—রমা, লক্ষ্মীটি, আমাকে তুমি ভুল বুঝো না প্লিজ।

কথাটা শোনার আগেই সেদিন লাইন কেটে দিয়েছিল রমা। সেদিনই আমার জীবন থেকে সরে গেছিল। প্রথম প্রথম আমি ফোন করতাম। ধরত না। তারপর বাড়িতে গেছি। উপর থেকে নামত না। একদিন মা-বাবার সামনেই বলে দিয়েছিল, "তোমাকে আমি সহ্য করতে পারছি না।" তারও পর একদিন কী একটা অনুষ্ঠানে আমাদের বাড়িতে এসে কথাই বলল না আমার সঙ্গে। লজ্জায়, রাগে আমি ঠিক করলাম, ওর সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখব না। সেই রাগটা একটা সময় গোয়ার্তুমির পর্যায়ে পৌঁছে গেছিল।

এখন আমার সামনে অসহায়ের মতো শুয়ে আছে পরমা। ওর দিকে তাকালেই বুকের ভেতর একটা মোচড় দিয়ে উঠছে। ও বোধহয় জানেও না, সাংবাদিকতা করার শখ আমার মিটে গেছে। দৈনিক প্রভাত অফিসে আমি আর যাচ্ছি না। মনে মনে বললাম, "রমা তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো। আর কোনওদিন তোমার অবাধ্য হব না।" কথাটা শুনল কি পরমা ? হঠাৎ নড়ে উঠল। তারপর পাশ ফিরে শুল। উত্তেজনায় আমি উঠে দাঁড়ালাম।

—এনি প্রবলেম অয়নদা ?

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি চান্দ্রেয়ী। ওর হাতে একটা বই। নিঃশব্দে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

বললাম, "রমার বোধহয় সেন্স আসছে।"

একবার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে চান্দ্রেয়ী বলল, "এক্সপেক্টেড। এতক্ষণ কী করছিলেন অয়নদা ? ঘুম পায়নি ? রাত কিন্তু তিনটে।"

বললাম, "পুরনো দিনের কথা ভাবছিলাম। তুমি ঘুমোওনি ?"

—না। তোমাদের নিয়েই লেখা একটা বই পড়ছিলাম। দ্য ফোর্থ এস্টেট। ধরে আর ছাড়তে পারছি না। অয়নদা, তোমরা কেন এ রকম লেখার চেষ্টা করছ না ?

—লিখব। এখন না।

দুজনের গলার স্বরেই বোধহয় ঘুম ভেঙে গেল পরমার। আস্তে আস্তে চোখ খুলল। উল্টোদিকে বসেও আমি দেখতে পেলাম ; ও অবাক হয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চান্দ্রেয়ী ঘুরে গিয়ে ওর সামনে দাঁড়াল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "মিস চ্যাটার্জি, এখন কেমন লাগছে ?"

পরমা ক্ষীণ গলায় বলল, "মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।"

—আর একটু ঘুমোন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

—আমাকে একটু জল দেবেন। উঠে বসার চেষ্টা করল পরমা। চান্দ্রেয়ী ধরে ওকে বসিয়ে দিল। তারপর পাশে টেবলে রাখা ফ্লাস্ক থেকে জল ঢেলে, গ্লাসটা এগিয়ে দিল ওর দিকে।

জল খাওয়ার পরই আমাকে দেখতে পেল পরমা। আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ঠোঁট দুটো কাঁপছে। চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এল। তারপর দু হাতে মুখ ঢেকে, হঠাৎই পরমা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠল। নরম গলায় বললাম, "কেমন আছ রমা ?"

—তুমি কেন এসেছ ? তুমি যাও। তুমি এখখুনি এখান থেকে যাবে। চিৎকার করে উঠল পরমা। নার্সিংহোম কাঁপিয়ে দিয়ে।

॥ দশ ॥

সকাল থেকে অনবরত ফোন আসছে। প্রথম ফোনটা এল ঠিক নটার সময়। ও প্রান্তে জ্যোতির গলা, "অয়ন, তুই নাকি দৈনিক প্রভাত ছেড়ে দিচ্ছিস। কথাটা কি সত্যি ?

জ্যোতির গলা শুনেই মনটা শক্ত করে নিলাম, "হ্যাঁরে। ছেড়ে দিচ্ছি। তুই কার কাছে শুনলি ?

BOIRBOI.NET

ও প্রান্ত থেকে প্রায় আধ মিনিট কোনও কথা নেই। তারপর জ্যোতি বলল, "অনিমেষের বাড়িতে আড্ডা মারতে গেছিলাম। ও-ই বলল। তুই নাকি লেক ক্লাবে মাল খেয়ে ওর নামে যা তা বলেছিস।"

—ঠিক শুনেছিস।

—তুই জানিস, অনিমেষ সব কথা বলে দিয়েছে কুণাল শালাকে।

—জানি। তাতে কিছু আসে যায় না।

—তুই ভেবেছিসটা কী ? কুণালটাকে চটিয়ে টিকতে পারবি ?

—কে রে কুণাল, যে ওকে ভয় পেতে হবে ?

—তোর হলটা কী অয়ন, এমন তো ছিলি না ?

—তোরাই আমাকে এমন করেছিস।

—আমরা ? কী সব ফালতু কথা বলছিস। অত ভাল একটা চাকরি তুই ছেড়ে দিবি ?

—এর থেকেও ভাল চাকরি আমার জন্য আছে। পেলে কেন ছাড়ব না ?

—কোথায় যাচ্ছিস, আনন্দবাজার ?

—না। খবরের কাগজে আর না। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় যাচ্ছি। পার এনাম পাঁচ লাখ। প্লাস সারাক্ষণের জন্য 'গাড়ি'। দৈনিক প্রভাত আমায় কী দিচ্ছে, বল ?

—ঢপ মারছিস অয়ন। কোন টিভি কোম্পানি তোকে অত টাকা দেবে ?

—জানি, তুই বিশ্বাস করবি না। আমাকে কিন্তু বাড়ি বয়ে অফার দিয়ে গেছে। সেই সময় দাদা-বৌদি সবাই ছিল। সবাইকেই তুই চিনিস। জিজ্ঞেস করতে পারিস। অবশ্য সেটা তোর ইচ্ছে।

—টাকাটাই তোর কাছে বড় হল ?

—ঠিক তা নয়। কথা হচ্ছে, মার্কেট ভ্যালু। সেটাই যাচাই করতে চাই।

—ও সব ছাড়। আজ অফিসে আয়। নিউজ এডিটরকে বলে, তোর প্রমোশনের ব্যবস্থা করছি।

হো হো করে হেসে উঠলাম। তারপর বললাম, "এন ই আমায় প্রোমোশন দেবে ? কী ক্ষমতা আছে ওর ? প্রোমোশন যে দেবে, তাকে আর কদিন পরই দেখতে পাবি। নিউজ এডিটরকে লাথি মেরে তাড়াবে সে। কটা দিন ধৈর্য ধর।

—কী বলছিস তুই ?

—জ্যোতি, তুই জানিস, আমিও জানি, খবরের কাগজে কে কী ভাবে প্রোমোশন পায়। নিউজ এডিটরের বাড়িতে গিয়ে, রোজ রোজ তেল দিয়ে, তুই আজ স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট হয়েছিস। সবাই তা জানে অফিসে।

—অয়ন, তুই কিন্তু পার্সোনাল অ্যাটাক করছিস।

—মাই ফুট, আই অ্যাম টেলিং ইউ দ্য ট্রুথ।

জ্যোতির মুখটা দেখতে পাচ্ছি না। দেখতে ইচ্ছে করছে খুব। মনে মনে বললাম, তোদের কাউকে আমি ছাড়ব না। ও প্রান্ত থেকে আহত গলায় জ্যোতি বলল, "তোর কী হল রে অয়ন ? হঠাৎ এত বদলে গেলি ?"

আরও কঠিন হয়ে বললাম, 'পার্সোনাল কথা ছাড়। কী জন্য ফোনটা করলি। সেটা কিন্তু বলিসনি।"

BOIRBOI.NET

—তুই কি সত্যিই রেজিগনেশন দিচ্ছিস ?

—ইচ্ছে আছে। শোন, অফিসকে আমি কন্ডিশন দেব। যদি মানে, থাকব। না হলে গুড বাই।

—কন্ডিশনটা কী জানতে পারি ?

—জেনে তোর লাভ ? কিছু করতে পারবি ? যেখানে জানানোর, সেখানে জানাব।

—অয়ন, তুই খুব রুথলেস হয়ে গেছিস।

—হওয়াটা স্বাভাবিক। ইটস আ প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ড। তুই আর কিছু বলবি ? আমার একটু তাড়া আছে।

জ্যোতি হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "না রে। আর কিছু বলার নেই।"

ফোনটা ছেড়ে দিয়ে মনে মনে হাসলাম। মনটা হাল্কা হয়ে গেল। জ্যোতির সঙ্গে কোনওদিন আমি খারাপ ব্যবহার করিনি। একটা কড়া কথাও বলিনি। আজ নিশ্চয়ই অবাক হয়েছে। ওকে একটা শক দেওয়া দরকার ছিল। ডাইনিং টেবলে পড়ে আছে কয়েকটা কাগজ। দু তিন দিনের পুরনো। একটা তুলে নিলাম। চমৎকার লে আউট, আনন্দবাজার। খবরগুলো খুব 'প্রফেশনালি হ্যান্ডেল' করে এই কাগজটা। অনেক কিছু শেখার আছে। কুণালদারা অবশ্য একেবারেই পছন্দ করে না আনন্দবাজারকে। ওদের কাছে কোনও কিছুই ভাল না, এই কাগজটার। দু-একবার প্রশংসা করে, ঝাড় খেয়েছি। শেষের দিকে আর কিছু বলতাম না।

অলস চোখে ছুঁয়ে যাচ্ছি হেডিংগুলো। হঠাৎই চোখে পড়ল খবরটা। পাঁচের পাতায় নীচের দিকে। চব্বিশ পয়েন্টের হেডিংয়ে দশ-বারো সি এম লেখা। অজন্তা ম্যানসনে সুবীর মুখার্জি নামে এক প্রোমোটারের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। ইদানীং তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন, ব্যবসায় প্রচুর লোকসান করে। পুলিশের সন্দেহ, এটা আত্মহত্যা। মোদ্দা খবরটা এই। খুব গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়নি। বোঝাই যাচ্ছে, নাইট রিপোর্টার রাতের দিকে পেয়েছে খবরটা। সম্ভবত ও সি কন্ট্রোলের কাছ থেকে। পুলিশ যতটুকু বলেছে, ততটুকুই লিখেছে।

সঙ্গে সঙ্গে, টেলিফোনের সেই রহস্যময় লোকটার কথা মনে পড়ে গেল। কাল রাতে ফোন করে লোকটা তো এই খবরটাই দিয়েছিল! বলেছিল, আত্মহত্যা নয়, খুন। নাকি নিজেই করেছে। আশ্চর্য! লোকটা কি আশপাশে কোথাও থাকে? হতে পারে। একবার বলেছিল, আমার শুভানুধ্যায়ী। মনে হয়, আমায় বেশ ভাল করে চেনে। কিন্তু আমি যে হতাশ হয়ে পড়েছি, সেটা ওই লোকটা কী করে জানল? ভেবে একটু অবাকই হলাম।

অজন্তা ম্যানসনটা একবালপুর থানায়। ওখানকার ওসি মনোজ ধর একটা সময় ডিডি-তে ছিলেন। তখন থেকেই আমার সঙ্গে আলাপ। ওর মেয়ে মাধ্যমিকে চারটে লেটার নিয়ে পাশ করেও, গোখেল কলেজে ভর্তি হতে পারছিল না। সেই সময়, ভর্তি হতে আমি একটু সাহায্য করেছিলাম। মনোজবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তাই একটু অন্যরকম। সুবীর মুখার্জির কেসটা নিয়ে নিশ্চয়ই উনি কিছু বলতে পারবেন। এই কথা ভেবে ওনাকে ফোন করলাম। আর কিছু নয়, নিছক কৌতূহলের বশেই। প্রশ্নটা করতে উনি বললেন, "কেসটা সুইসাইডের। একটা নোটও পাওয়া গেছে। তবে আমার আই ও বলছে, অন্য কথা। কুল ব্লাডেড মার্ডারও হতে পারে। সম্ভবত কেউ মারার আগে, সুইসাইডাল নোট লিখিয়ে নিয়েছে।"

—বাড়ির লোকজন কী বলছে?

—কেউ ছিলেন না তখন। ভদ্রলোকের একটাই ছেলে। রাফিয়ান টাইপের। স্ত্রী অবশ্য খুব কান্নাকাটি করছেন। একবার নাকি বলেও ফেলেন, এমন ঘটনা ঘটবে তিনি জানতেন।

—আপনারা কি সিরিয়াসলি ইনভেস্টিগেট করবেন?

—আসলে কী জানেন, ডি সি নিজে কেসটা দেখছেন।

—পুলক দাশগুপ্ত?

—হ্যাঁ। অয়নবাবু, আপনি এত ইন্টারেস্টেড কেন ?

—না, মানে আনন্দবাজারে খবরটা চোখে পড়ল বলে জিজ্ঞেস করলাম। যাক গে, আপনার মেয়ে কেমন আছে ?

—ভাল। এবার উচ্চমাধ্যমিক দেবে। একদিন আসুন। এই তো আপনার বাড়ির কয়েক পা দূরেই আছি এখন। থানার লাগোয়া কোয়ার্টারে।

—আসব একদিন। ও কে।

ফোনটা নামিয়ে রাখতেই বেজে উঠল, "অয়ন ব্যানার্জি আছেন ?"

—কে বলছেন ?

—বলুন, আমি রাজকুমার কেডিয়া।

মনে পড়ল, এই সেই ভদ্রলোক যিনি টিভির অফারটা দিয়ে গেছিলেন। ভদ্রলোক যোগাযোগ করবেন বলেছিলেন। নিজের সমস্যা নিয়ে আমি এত ব্যস্ত ছিলাম, ওদের অফারটা নিয়ে ভাবতেও পারিনি। বললাম, "অয়ন বলছি।"

—মিঃ ব্যানার্জি, আপনি শর্মিলা ভট্টাচারিয়া বলে কাউকে চেনেন ?

—চিনি। কেন, ওকেও কি আপনারা নিচ্ছেন ?

—ভাবছি। কেমন উনি ?

—খুব ভাল।

—আমাদের কাছেও সেরকম খবর আছে। নিউজ রিডিং-এর জন্য ওকে আমরা পছন্দ করেছি। আপনি ও শর্মিলা ভট্টাচারিয়া—খুব ভাল পার্টনার হবেন। আমাদের অফারটা কি ভেবে দেখেছেন ?

—আমাকে একটু সময় দিন।

—কোনও অসুবিধা নেই। আপনার কনট্রাক্ট তৈরি করাই আছে। যে কোনওদিন এসে নিয়ে যেতে পারেন।

—ঠিক আছে।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দোতলার দিকে পা বাড়াতেই আবার ফোন। বিরক্ত হয়ে রিসিভারটা ফের তুললাম। "অয়নবাবু, চিনতে পারছেন ?"

সেই রহস্যময় গলা। বললাম, "কারও গলা একবার শুনলে আমি ভুলি না।"

—ভাল একটা খবর দিলাম। সেটা চেজই করলেন না। করলে কিন্তু সুনামই পেতেন।

BOIRBOI.NET

—দেখুন মশাই,খবরের কাগজের চাকরি আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আর কোনও ইন্টারেস্ট নেই আমার সুনাম পাওয়ার।

—ফালতু কথা বলছেন। আপনি ছাড়ার কথা ভাবলেও, কাগজ কিন্তু আপনাকে ছাড়বে না।

—দেখুন, সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমাকে কেন বিরক্ত করছেন ? বাজারে তো অভাব নেই রিপোর্টারের।

লোকটা হাসল। তারপর বলল, "অয়নবাবু, আমারও একটা স্বার্থ আছে। তবে এখনই সেটা বলা যাবে না। প্রথমে আপনি আমার সাহায্য নিন। পরে আমি আপনার সাহায্য নেব।

একটু কড়া গলাতেই বললাম, "আপনাকে আমি জানি না, চিনি না। আপনার

সাহায্য আমি কেন নিতে যাব ?"

—ঠিক আছে। অ্যাট লিস্ট সত্যের খাতিরেও, সুবীর মুখার্জির কেসটা নিয়ে খোঁজ খবর করুন। পুলিশ আত্মহত্যা বলে চালাচ্ছে। আসলে তা নয়। অজন্তায় গিয়ে একটু দেখুনই না। খুনটা কেন করলাম। ভাল মেটেরিয়াল পাবেন। আপনার বাড়ির তো কাছেই।

—আমার কোনও আগ্রহ নেই যাওয়ার। প্লিজ, আমাকে আর বিরক্ত করবেন না।

—অয়নবাবু, আমাকে বিশ্বাস করে দেখুন। ঠকবেন না।

উত্তর না দিয়ে লাইনটা কেটে দিলাম। সকালের চতুর্থ ফোনটা এল দিল্লি থেকে। সবিতার। কলকাতা ছাড়ার পর, চারদিনের মাথায় এই প্রথম ও ফোন করল, "অয়ন, একটা সুখবর আছে।"

ওর গলা শুনে পুরো শরীরটা একবার চনমন করে উঠল। বললাম, "সুজয়ের ক্যাসেটটা কি অ্যাপ্রুভড হয়েছে ?"

—হ্যাঁ। সেকেন্ডলি, যে চারটে সাজেশন দিয়েছিলাম, সব কটা ও কে।

—ফাইন। কবে শুরু করছ ?

—মাস দুয়েকের মধ্যে। তিনজনের একটা টিম আসছে প্যারিস থেকে। তোমার কিন্তু সাহায্য চাই।

—অফ কোর্স।

—আর খবর বলো। তোমাকে খুব মিস করছি। পারলে চলে এসো না এদিকে। তোমাকে একটা অ্যাপ্লিকেশন পাঠাতে বললাম, কী হল ?

—পাঠিয়ে দেব।

—দিন দশেকের মধ্যে আমার অরুণাচল যাওয়ার কথা আছে। একটা ডকুমেন্টারি করার জন্য। কলকাতা থেকে একটা কাগজ বেরোয়, এনভায়রন। সেখানে একটা আর্টিকেল পড়লাম। অরুণাচলের একটা জায়গায় নাকি এখনও একটা ট্রাইব, গাছের উপর বসবাস করে। ওদের নিয়ে আধঘণ্টার একটা ফিল্ম করার ইচ্ছে আছে। যাবে তুমি আমার সঙ্গে ?

—বললে যাব। আমি তো এখন ফ্রি।

—তোমার চেকটা পাঠিয়ে দিয়েছি। দু-একদিনের মধ্যে পেয়ে যাবে। পেলে একবার ফোন করবে, প্লিজ।

—নিশ্চয়ই।

—সুজয়কে বোলো, ওর মেসেজটা আমি পেয়েছি। ওর চেক আসবে প্যারিস থেকে। টেলিকাস্ট হওয়ার পর।

সুজয়ের নাম শুনেই বিরক্ত হলাম। তবুও বললাম, "ঠিক আছে, বলে দেব।"

—তাহলে ছাড়ি ?

—কেন তুমি কি খুব ব্যস্ত।

—বিন্দুমাত্র না। এই মাত্র অফিসে এলাম। এসেই ভাবলাম, তোমাকে ধরি। একবার রিমাইন্ডার দিই। সত্যি অয়ন, খুব সুন্দর কাটল এ বারের ট্রিপটা। ইন ইভরি সেন্স। তুমি অন্তত আমাকে ডিসাপয়েন্ট করোনি। দু-একদিন পরে আবার তোমাকে ফোন করছি। ঠিক এই সময়। ও কে, বাই।

BOIRBOI.NET

ফোনটা ছেড়েই ঠিক করলাম, এবার যে-ই করুক, ধরব না। দোতলায় উঠে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। এখন আমার অখণ্ড অবসর। অফিস যেতে হচ্ছে না। অফিসের কথাও ভাবতে হচ্ছে না। গত দু তিনটে দিন, নার্সিংহোম আর বাড়িতেই কাটিয়ে দিয়েছি। পরমা এখন সুস্থ। আজ বা কালের মধ্যেই বাড়ি ফিরে আসবে। চান্দ্রেয়ীর সঙ্গে ওর খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। বলতে গেলে, চান্দ্রেয়ীই ওকে ভাল করে তুলেছে। আমার উপর এখনও অবশ্য ওর রাগ পড়েনি। সেদিন রাত্তিরে সেই চিৎকার করে ওঠার পর থেকে এখনও একটা কথাও আমার সঙ্গে ও বলেনি।

গতকাল রবার্ট লুডলামের একটা বই পড়তে দিয়েছিল চান্দ্রেয়ী। সেটা মনে হতেই উঠে বসলাম। হাতে সময় আছে। পড়ে ফেলি। টেবিলের দিকে হাত বাড়াতেই দেখি, টুবলু। পরমা মাসির অসুখের জন্য বাড়িতে সবাই ব্যস্ত। ওর দিকে কারও নজর নেই। বেচারা দু তিনদিন স্কুলও যেতে পারেনি। টুবলুর তাতে কোনও বিকার নেই।

—ছোটকা, একটা কুইজ জিজ্ঞেস করব ?

ওর মুখটা দেখে মায়া হল। বললাম, "খুব কঠিন যেন না হয়।"

—উইজার্ড অব হ্যারিকেন, কে বলো তো ?

মাই গড। উইজার্ড অব হকি কে, জানি। ধ্যানচাঁদ। উইজার্ড অব হ্যারিকেন কে, তা তো কোনওদিন শুনিনি। বললাম, "একটা ক্লু দে তো!"

টুবলুর মুখে হাসি। অনেকদিন পর ছোটকাকে ও জব্দ করতে পেরেছে। ওর মুখে হাসি তো ফুটবেই। ভাবতে লাগলাম। নিশ্চয়ই কোনও খেলোয়াড়ের নাম। কী খেলা হতে পারে ? হ্যারিকেন যখন, অবশ্যই কোনও দ্রুতগতির খেলা। ক্রিকেট ? অসম্ভব না। ক্রিকেটার হলে নিশ্চয়ই পেস বোলার। আর পেস বোলার মানে হয় অস্ট্রেলিয়ান, না হয় ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান। এই সব নামগুলো আগে খুব দিতেন সাংবাদিকরা। পাঁচ বা ছয়ের দশকে। এই সময়কার পেস বোলারদের নামগুলো ভাবতে লাগলাম। গিলক্রিস্ট... ওয়েস হল... চার্লি গ্রিফিথ... কী জানি বাবা, মনে পড়ছে না।

আমাকে দেখে বোধহয় করুণা হল টুবলুর। বলল, "একটু কঠিন হয়ে গেছে, না ?

ঠিক আছে, এবার তাহলে একটা সহজ কুইজ ধরি। বলো তো, একটা রোগা আর একটা মোটা লোকের মধ্যে কে আগে সাঁতার শিখে যাবে ?"

চট করে বলে দিলাম, "মোটা লোক।"

—কারেক্ট। আচ্ছা, আর একটা বলো। একটা টর্চ লাইট আর এক বাক্স দেশলাই নিয়ে তুমি যদি চাঁদে যাও, তা হলে কোনটা তোমার কাজে লাগবে না ?

—দেশলাই বাক্সটা। চাঁদে অক্সিজেন নেই। তাই দেশলাই কাঠি জ্বলার প্রশ্নও নেই।

টুবলু হতাশ হয়ে বলে উঠল, "উফ, ছোটকা তুমি এই উত্তরটাও জানো!"

ওর কথা শুনে মনে মনে আমি হাসলাম। ঠিক সেই সময় একহাতে কর্ডলেস ফোন, আর অন্য হাতে দুধের গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকল বড়বৌদি। আমাকে কর্ডলেস এগিয়ে দিয়ে বড়বৌদি বলল, "অয়ন, নার্সিংহোমে একবার ঘুরে আসবে ? তোমার দাদা অফিসে গেছে। সকালের দিকে, এ বাড়ি থেকে কারও যাওয়া হল না।"

—তুমি বললে, যাব বৌদি। বলেই ফোনটা কানে লাগালাম। ও প্রান্তে মনোজ ধর। খুবই উত্তেজিত।

"ওই সুবীর মুখার্জি কেসটা... একটা ইন্টারেস্টিং ডেভেলপমেন্ট আছে অয়নবাবু।"

—কী বলুন তো।

—এই মাত্র খবর পেলাম, আমার এস আইকে ট্রান্সফার করা হয়েছে বড়তলা থানায়।

—কোন এস আই ?

—আরে, যিনি সুবীর মুখার্জির কেসটাকে মার্ডার সাসপেক্ট করেছেন। ডাল মে কুছ কালা হ্যায় অয়নবাবু। ডি সি-র কাছে আপনি একটু খোঁজখবর নিন।

—ঠিক আছে।

—উনি কী বললেন, আমাকে একটু জানাবেন। ছাড়ি তাহলে।

—ও কে।

ফোনটা টেবলে রেখে উঠে দাঁড়ালাম। স্নান করে জামাটা বদলে নিতে হবে। একবার বেরিয়ে গেলে দুপুরে আর বাড়ি ফিরব না। প্রেস ক্লাবে আজ দুপুরে ইন্দ্রনীলের গান আছে। শুনে বাড়ি ফিরব রাত আটটা-সাড়ে আটটা নাগাদ। বাথরুমে ঢুকে চট করে স্নান সেরে নিলাম। তারপর সিল্কের একটা পঞ্জাবি আর পাজামা পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। সব মিলিয়ে আধ ঘণ্টার বেশি লাগল না। মনে মনে নিজেকেই একবার তারিফ করলাম। চট করে নিজেকে তৈরি কার ব্যাপারে আমার একটা থিওরি আছে। স্নান করা। পোশাক পরা থেকে জুতোর ফিতে বাঁধা পর্যন্ত—একটা কেজো রিপোর্টারের কখনও আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগা উচিত নয়। এইজন্যই আমি কখনও ফিতেওয়ালা শু পরি না। ফিতে লাগাবার এক মিনিটের মধ্যেই হয়তো কোনও বড় খবর মিস হয়ে যেতে পারে।

একটা ট্যাক্সি করে নার্সিংহোমে পৌঁছলাম বেলা একটা নাগাদ। কেবিনে ঢুকে দেখি, বিছানায় পরমা আধশোয়া। চেয়ারে বসে ওর মা। আর দাঁড়িয়ে চান্দ্রেয়ী। পরমা হাসিমুখে কথা বলছিল। আমাকে দেখেই মুখ-চোখ শক্ত করে ফেলল। কেউ বোধহয় চুল বেঁধে দিয়েছে। দু বেণী দু পাশ দিয়ে নেমে এসেছে বুকের উপর। পরনে সাদা তাঁতের শাড়ি। রোগ-পাণ্ডুর মুখ। তবুও খুব সুন্দর লাগছে ওকে দেখতে।

পরমা ভ্রুক্ষেপই করছে না আমাকে। পাশ দিয়ে কথা বলছে চান্দ্রেয়ীর সঙ্গে। দুজনের মধ্যে কথা হচ্ছে তুই-তোকারি করে। পারেও বটে মেয়েরা। যত তাড়াতাড়ি ঘনিষ্ঠ হয়, তত তাড়াতাড়িই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দোলের সময় প্রতি বছর বড়দা হাজারিবাগ যায়। সপ্তাহখানেক ছুটি কাটিয়ে আসে। কয়েকবার পরমাকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে। সেই প্রসঙ্গেই কথা চলছে দুজনের মধ্যে। চান্দ্রেয়ী বলল, "তুই গেলে, এবার আমায় বলিস। আমিও যাব। চয়নদাকে আমিও একবার বলে রাখব। অয়নদা, তুমি কখনও যাওনি ?"

চয়নদা মানে আমার বড়দা। চান্দ্রেয়ীকে বললাম, "দু-একবার গেছি। তারপর একবার একজনের কান্না দেখে, যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।"

—কী ব্যাপার ?

BOIRBOI.NET

—বড়দা ওখানে শিকার করতে যায়। একবার প্রচুর পাখি মেরেছিল। সেই রক্ত দেখে একজন খুব কান্নাকাটি করেছিল।

—কে সে, অয়নদা ?

চোখের ইশারায় আমি দেখালাম পরমাকে। চান্দ্রেয়ী খুব হাসতে লাগল। কেবিনের পর্দা সরিয়ে এই প্রথম ঢুকল একজন নার্স। হাতে প্রেসক্রিপশন। নার্সটা বলল, "ডঃ মিত্র এই ওষুধগুলো আনিয়ে নিতে বলেছেন।" হাত বাড়িয়ে প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে বললাম, "দিন, আমি আনছি।"

পা বাড়াব, এমন সময় পরমা বলল, "মা, ওকে বারণ করো। ও আনলে সব ওষুধ কিন্তু আমি ফেলে দেব।" এমন অসহিষ্ণু হয়ে কথাটা বলল, তা শুনে নার্স মেয়েটা অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে।

অস্বস্তিতে উঠে দাঁড়ালেন পরমার মা। "দাও, অয়ন, আমাকে দাও। নীচে ওর বাবা ওয়েট করছেন। আনিয়ে দিচ্ছি।"

—মা, তোমরা কি চলে যাচ্ছ ?

—যাই ? বিকেল পাঁচটায় ডাঃ মিত্র একবার তোকে দেখে যাবেন। যদি ছাড়েন, আজই নিয়ে যাব তাহলে।

—আর আমার ভাল লাগছে না মা। চান্দ্রেয়ী না থাকলে আমি বোধহয় পাগল হয়ে যেতাম। আজই বাড়ি নিয়ে চলো।

—আর তো কয়েক ঘণ্টা, অয়নের সঙ্গে গল্প কর। আমরা ফের আসছি বেলা তিনটেয়।

পরমা বাচ্চা মেয়ের মতো মুখভঙ্গি করে বলল, "বয়ে গেছে আমার ফালতু লোকের সঙ্গে গল্প করতে।"

পরমার কথা গায়েই মাখলাম না। ফাঁকা চেয়ারে গিয়ে বসলাম। চান্দ্রেয়ী মিটিমিটি হাসছে। পরমা আর আমার সব ঘটনা ও জানে। যেদিন রাতে আমাকে দেখে ও রাগে ফেটে পড়েছিল, সেদিনই ওকে সব কথা খুলে বলেছিলাম। ও পরামর্শ দিয়েছিল, পরমা যতই খারাপ ব্যবহার করুক, আমি যেন ওকে উপেক্ষা না করি। তাহলে উল্টো প্রতিক্রিয়া হবে। গত তিনদিনে পরমা আমাকে সবার সামনে অনেক তাচ্ছিল্য করেছে। তা সত্ত্বেও আমি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থেকেছি। যে বুবুন আমাকে অমানুষ বলেছিল, সে-ই বাড়ি ফিরে বড়বৌদিকে একবার বলেছে, "ছোড়দার অসম্ভব সহ্যশক্তি। অন্য কেউ হলে, আর নার্সিংহোমেই যেত না।"

শুধুই কি চান্দ্রেয়ীর অনুরোধে, সব সহ্য করেছি ? তা নয়। পরমা নার্সিংহোমে ভর্তি হওয়ার পরদিনই, ওকে দেখতে এসেছিলেন, ওর সেই আঙ্কল দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি। নার্সিংহোমের রিসেপশনে ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন পরমার বাবা। দিব্যেন্দু চ্যাটার্জিকে দেখে আমি একটু অবাকই হয়ে গেছিলাম। আমার থেকে বছর দশেকের বড়। আমেরিকায় থাকেন। সিস্টেম অ্যানালিস্ট। সেই সঙ্গে বিরাট ব্যবসা চালাচ্ছেন। পরমার বাবা আমাকে অবাক করে দিয়েই বলেছিলেন, "অয়ন, তোমাদের দৈনিক প্রভাত কাগজটা বিক্রি হয়ে গেল। সিক্সটি পার্সেন্ট শেয়ার কিনেছে দিব্যেন্দু। খুব শীগগির টেক ওভার করবে।"

ভদ্রলোকের দিকে একবার তাকিয়ে আমি বলেছিলাম, "তাই নাকি ? আমরা তো

কিছু শুনিনি !"

—শোনা সম্ভবও না। বছর দেড়েক আগে দিব্যেন্দু একবার কলকাতায় এসেছিল। তখনই তোমাদের মালিকরা ওকে অ্যাপ্রোচ করেন। কাগজটা ওরা চালাতে পারছিলেন না। সেই সময় দিব্যেন্দু একবার আমার বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে আসে। তোমাকেও বলেছিলাম। ইচ্ছে ছিল, সেদিনই তোমার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দেব। কিন্তু সেদিন তুমি আসতে পারলে না।

রিসেপশনে বসে দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি সেদিন অনেকক্ষণ কথা বলেছিলেন কাগজ সম্পর্কে। কী করলে আনন্দবাজারের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যাবে, তাও জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কথায় কথায় একবার বললেন, আরও বড় দায়িত্ব পেলে আমি পালন করতে পারব কি না। রিপোর্টিংয়ে স্ট্রেংথ বাড়ানোর জন্য কী করা যেতে পারে। কল্যাণদা, কুণালদারা কতটা এফিসিয়েন্ট। ওনার সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছিল, আমাকে নিয়ে অনেক কিছু ভাবছেন। সেদিন থেকেই মনে মনে তৈরি হচ্ছি, বদলা নেব। কুণাল, জ্যোতি, দীপেনদের মাড়িয়ে আমি উপরে উঠব।

মনের ভেতর অদ্ভুত একটা আত্মবিশ্বাস জন্মে গেছে। একটা কথা বুঝে গেছি, খবরের কাগজে কুণালদাদের মতো চাকুরেরা, কেউ না। আসলে এরা সব কাঠপুতলি। পিছন থেকে সুতো ধরে এক বা একাধিক লোক এঁদের নাড়ায়। যতদিন সুতোটা ধরে থাকে, ততদিনই এরা লাফায়-ঝাঁপায়। নিজেদের বিরাট কিছু ভাবে। কিন্তু কটা আর দিন ? একদিন না একদিন সেই সুতোটা কেটে যায়। আর তখনই কুণালদারা মুখ থুবড়ে পড়ে। কাগজের অফিসে যদি থাকতেই হয়, তাহলেই এই কাঠপুতলিদের খুশি করে লাভটা কী। খুশি করতে হলে, সেই লোকগুলিকেই না হয় করব যাদের হাতে থাকে সেই সুতোটা !

সত্যি বলতে কী, কাগজের অফিসে আর চাকরি করব কি না, তা নিয়ে সিদ্ধান্তটা নিতে আমার একটু সময় লাগল। মাঝে একদিন পাতাল রেলে দেখা হয়েছিল শিতার সঙ্গে। কথায় কথায় ও বলেছিল, "আপনার নামে তো যা তা বলে বেড়াচ্ছে দীপেনদারা।"

শোনার ইচ্ছে ছিল না। তবুও জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কী বলছে ?"

—দৈনিক প্রভাত নাকি আপনাকে স্যাক করেছে। ইনএফিসিয়েন্সির জন্য।

—ভাল। এই কথা বলে যদি ওরা খুশি হয়, হোক।

—আপনি ছেড়ে দিচ্ছেন কেন অয়নদা ?

—কে বলল ছেড়েছি। রেস্ট নিচ্ছি। সময় হলেই আসব।

পাতাল রেল থেকে উপরে উঠে আসার পরই প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল দীপেনদের উপর। আমাকে ইনএফিসিয়েন্টে বলছে। মনে মনে বললাম, দাঁড়া, দিব্যেন্দু চ্যাটার্জিকে আগে টেক ওভার করতে দে। তারপর বোঝাব, ইনএফিসিয়েন্ট কে ? তারও আগে, পরমাকে ফের আমার কাছে আনা দরকার। ওর সঙ্গে সেই আগের সম্পর্ক ফিরিয়ে আনা দরকার। তেমন হলে প্রেম প্রেম খেলেও। ভেতরকার রাগ, অভিমান সব তুলে রেখেছি। পরমা আমাকে যতই তাচ্ছিল্য করুক, আমি কিছুই মনে করব না। পরমা খুশি, মানে ওর আঙ্কল খুশি। আর দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি খুশি থাকা মানেই, দৈনিক প্রভাতের ছড়িটা আমার হাতে।

BOIRBOI.NET

চান্দ্রেয়ীর সঙ্গে গল্প করছে পরমা। ঘরে আমিও একটা লোক বলে, ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। কী একটা কথায়, আমাকে ঠেস দিয়ে পরমা হঠাৎ চান্দ্রেয়ীকে বলল, "কিছু লোক আছে জানিস, দেখলেই এখন আমার মাথায় খুন চেপে যাচ্ছে।"

শুনে চান্দ্রেয়ীকে আমি বললাম, "কিছু লোক আছে জানো, রাগলে তাদের অসাধারণ দেখায়। কারণে-অকারণে হঠাৎ হঠাৎ তারা রেগে ওঠে।"

প্রতিবাদ করল চান্দ্রেয়ী। "এটা কিন্তু ঠিক বললে না অয়নদা। অকারণে কেউ রাগে নাকি ?"

—রাগে। আমার হাতের সামনেই একজাম্পল আছে। রাগের একটাই ওষুধ। তৎক্ষণাৎ নিজের মুখটা আয়নায় দেখা। দেখবে, তখনই রাগটা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে। তোমাদের এই নার্সিংহোমে কোনও আয়না নেই চান্দ্রেয়ী ?'

হাসতে হাসতে চান্দ্রেয়ী বলল, "আগে তো তুমি এত কথা বলতে না অয়নদা। লেক ক্লাবে যখন তোমাকে দেখতাম, তখন তো খুব মুখচোরা ছিলে। জানিস পরমা, একবার ক্লাবে অয়নদার পাশে গিয়ে বসেছিলাম। এমন লাজুক ছিল, ছুতো করে তখনই উঠে গেছিল চেয়ার ছেড়ে।"

আমি অবাক হওয়ার ভান করে বললাম, "কবে বলো তো ? তখন কি আমার বড়দার বিয়ে হয়ে গেছিল ?"

—তার মানে ?

—মানে, দাদার বিয়ের পর থেকেই আমি খুব রেসপন্সেবল প্রেমিক। তখন আমার এক প্রেমিকা ছিল। সে চাইত না, কোনও মেয়ের সঙ্গে আমি কথা পর্যন্ত বলি। পাশে বসা তো দূরের কথা।

পরমা আর থাকতে না পেরে বলে উঠল, "বিশ্বাস করিস না রে চান্দ্রেয়ী। মিথ্যে কথা।" তারপর সরাসরি আমাকেই বলল, "লজ্জা করে না, বানিয়ে বানিয়ে সব মিথ্যে কথা বলছ ?"

মনে মনে এটাই আমি চাইছিলাম। পরমা মুখ খুলুক। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, —মোটেই আমি মিথ্যে কথা বলছি না। প্রমাণ দেব ? এই চান্দ্রেয়ীই একবার বাঙ্গালোর থেকে আমাকে নিউ ইয়ার্স কার্ড পাঠিয়েছিল। কী অবস্থা তুমি করেছিলে সেই কার্ডটার ?

পরমা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তখন আমি ওকে চিনতাম ?"

—সেটা কোশ্চেন না। কোশ্চেন হচ্ছে বিনা কারণে তোমার জেদ, রাগ। জানো চান্দ্রেয়ী, ফ্রেঞ্চ টিভি-র একটা কাজ রিসেন্টলি আমি করেছিলাম। ওদের একটা মেয়ে, চেক দেওয়ার জন্য আমাকে তাজ বেঙ্গলে ডাকে। সেই মেয়েটার সঙ্গে আমাকে দেখেই, রমা এই অসুখটা বাধিয়ে বসল। আমাকে জিজ্ঞেসও তো করতে পারত ফোন করে, মেয়েটা কে ? ওদের মেয়েরা কি আমাদের মাতা ? ওরা খুব প্রফেশনাল। কাজ ছাড়া কোনও রিলেশন রাখে না।

চান্দ্রেয়ী বলল, "সেটা অবশ্য ঠিক।"

পরমা বলল, "ফোন করলে তুমি ধরতে ? কতদিন তোমাদের বাড়িতে ফোন করেছি। তুমি ধরেও কথা বলোনি। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়ে দিয়েছ সুপ্রিয়াদিকে।"

চান্দ্রেয়ী বলল, "এটা কিন্তু তুমি ঠিক করোনি অয়নদা।"

—আমার সঙ্গে সম্পর্কটা তখন কী, তুমি জানো ? দেড়টা বছর তখন আমি এত ডিস্টার্বড যে, হঠাৎ অদ্ভুত সব খেয়াল হত। একবার শুনলাম, রমার বিয়ে। দশটা স্লিপিং পিল কিনে আনলাম, সুইসাইড করব বলে। জ্যোতি জানতে পেরে, সেগুলো কেড়ে নিল। আর একবার মনে হল, দূরে কোথাও চলে যাই, কাউকে কিছু না জানিয়ে। কী দিন গেছে সে সব, ভাবতেও পারবে না।

এমনভাবে এই সব কথা বললাম, পরমা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। নিজের পারফরম্যান্সে নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। গলগল করে সব মিথ্যা কথা বেরিয়ে আসছে। প্রেমে আর রণে—কোনও কিছু অন্যায় নয়। দেখলাম, বেশ কাজ হচ্ছে। পরমার চোখ-মুখে আর সেই রাগ-রাগ ভাব নেই। ক্রমেই নরম হয়ে আসছে সেই আগের মতো।

কী যেন বলতে যাচ্ছিল পরমা, হঠাৎ নার্স এসে খবর দিল, পাঁচ নম্বর পেশেন্ট-এর ব্রিদিং ট্রাবল হচ্ছে। শুনেই চান্দ্রেয়ী বেরিয়ে গেল। কেবিনে শুধু আমরা দুজন। চেয়ার ছেড়ে উঠে বসলাম বিছানায়। এই সেই সুযোগ।

দৈনিক প্রভাতে আমার উন্নতির বীজ পুঁততে হবে আমাকে, আর কয়েক মিনিটের মধ্যে। পরমার হাত দু'টো ধরে বললাম, "পুরনো কথা সব তোলা থাক, রমা। প্লিজ, সব ভুলে যাও। এসো, আবার সব নতুন করে শুরু করি।"

পরমা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আর কোনওদিন আমার অবাধ্য হবে না, আগে বলো।"

—প্রমিস। কোনওদিন না।

দু'হাতে ওর মুখটা তুলে ধরলাম। সঙ্গে সঙ্গে সবিতার মুখ মনে পড়ল। সারা শরীরে হঠাৎ তাপ অনুভব করলাম। ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াতেই, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল পরমা। তারপর বলল, "না, এখন না।"

সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ঠাণ্ডা করে নিলাম। চালে আর কোনও ভুল করব না। এখন থেকে সব ব্যাপারে আমাকে মেপে চলতে হবে। এই পরমা আমার সিঁড়ি। যা বেয়ে আমাকে উঠতে হবে। ওর সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম। যেমন করতাম, আগে কোথাও বেড়াতে গিয়ে। আমি সুনীল গাঙ্গুলির ভক্ত, ও শীর্ষেন্দু মুখার্জির। আমি পেলের ফ্যান, ও মারাদোনার। মান্না দে-র গান আমি খুব ভালবাসি, ও ইন্দ্রনীলের। ইন্দ্রনীলের কথা উঠতেই আমি বললাম, "জানো রমা, আজই ইন্দ্রনীলের প্রোগ্রাম আছে প্রেস ক্লাবে। ভেবেছিলাম, গিয়ে শুনব। বোধহয় হবে না।"

লাফিয়ে উঠল পরমা, "এই, যাবে ?"

—মাথা খারাপ ? কী করে যাবে ?

—'কেন, স্ট্রেট বেরিয়ে যাব তোমার সঙ্গে। কে ধরবে ?

পরমার কোনও ব্যাপারে না করা নেই। বললাম, "চলো তা হলে। দারুণ মজা হবে।"

বিছানা থেকে নেমেই পরমা, বাথরুমে গিয়ে চট করে শাড়ি বদলে এল। হালকা প্রসাধন সেরে বলল, "তোমার সান গ্লাসটা সঙ্গে আছে ? দাও। রিশেপসনে তা হলে চিনতে পারবে না।"

লাঞ্চ টাইম। নার্সিংহোমে এই সময়টায় সবাই বিশ্রাম নিচ্ছে। দু'জনে মিলে

বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। কাছেই একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। উঠে পড়লাম। মজা লাগছে। নার্সিংহোমে ঢোকার আগেও আজ ভাবতে পারিনি, পরমাকে ফের এত কাছে পাওয়া যাবে। দু'জনে মিলে শেষ বেরিয়েছিলাম, ব্যান্ডেল চার্চে। সেদিনকার আমি আর আজকের আমি— অনেক তফাত। অয়ন ব্যানার্জি এখন অনেক বদলে গেছে।

জানলা দিয়ে গরম হাওয়া আসছে। বোধহয় হাওয়াটা সহ্য হচ্ছে না। বাঁ দিকের জানলার কাচটা তুলে দিল পরমা। তারপর আমার বাঁ হাতটা জড়িয়ে, কাঁধে মাথা দিল। ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়াল রাসবিহারীর মুখে, ট্র্যাফিক সিগন্যালে। একটা মোটর বাইক এসে হাঁফাতে লাগল ট্যাক্সির ডান পাশে। যে ছেলেটা চালাচ্ছে, তার পিঠ আলতো করে ছুঁয়ে আছে ব্যাকসিটে বসা একটা মেয়ে। দু'জনেই ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। মেয়েটা হঠাৎ বলল, "এই দেখো, ট্যাক্সির মেয়েটা একেবারে দিব্যা ভারতীর মতো দেখতে।" মন্তব্যটা পরমার কানেও গেল। ও আমার বাঁ হাতে একটা চিমটি কাটল।

ময়দান দিয়ে প্রেস ক্লাবে পৌঁছতে লাগল প্রায় পঁচিশ মিনিট। দুপুরের দিকে এই সময়টায় খুব একটা ভিড় থাকে না প্রেস ক্লাবে। যদি না কোনও প্রেস কনফারেন্স এবং তার সঙ্গে ঢালাও মদ্যপানসহ লাঞ্চ থাকে। প্রেস ক্লাবে ভিড় হয় সন্ধের দিকে। কম খরচায় মদ্যপান করা যায়। সফল সাংবাদিকরা প্রায়ই আসে। আমাদের মতো সাংবাদিকদের রোজ আসা সম্ভব হয় না। আজ অবশ্য প্রচুর লোক। ইন্দ্রনীলের গান শুনতে এসেছে। এই সব ফাংশানে অনেকে ফ্যামিলির লোকজন নিয়ে আসে। হলঘরের মধ্যেই ছোট্ট স্টেজ। ফুল দিয়ে সাজানো। প্রচুর চেয়ার। একটাও খালি নেই।

প্রেস ক্লাবের দরজার সামনে দেখলাম, দাঁড়িয়ে সবাইকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন প্রভাতদা। আনন্দবাজারের প্রভাত মিশ্র। উত্তর কলকাতার বনেদি পরিবারের লোক। পরনে গরদের পাঞ্জাবি আর ধুতি। দারুণ দেখাচ্ছে প্রভাতদাকে। আমাকে দেখেই বললেন, "এসো অয়ন। বৌমাকে ভেতরে বসিয়ে দাও কোথাও।"

পরমার হাতটা ধরে ছিলাম। শুনে একটা চিমটি কাটলাম। তারপর বললাম, "ইন্দ্রনীল কখন শুরু করবে, প্রভাতদা?"

—প্রথম ইন্দ্রানী সেন। তারপর ইন্দ্রনীল। ধরো, ঘণ্টা খানেক পর তো বটেই। দু'জনেই এসে গেছে।

BOIRBOI.NET

শুনে পরমার হাত ধরে টানলাম। সকালে ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছি। খিদেটা বেশ চাগাড় দিয়ে উঠেছে। প্রেস ক্লাবে এখন ভাল চাইনিজ পাওয়া যায়। অনেকদিন খাওয়া হয়নি। হলঘরের পিছনে আলাদা একটা এয়ারকন্ডিশনড ঘর আছে। সেখানে বসে খাওয়া-দাওয়া করলে মেম্বারদের দিতে হয় দশ টাকা করে। সঙ্গে কোনও গেস্ট থাকলে বাড়তি কুড়ি টাকা। এর আগে মাত্র একবারই প্রেস ক্লাবে নিয়ে এসেছিলাম পরমাকে। তখন সদ্য প্রফেশনে এসেছি। সেদিন ফাংশান ছিল উষা উত্থুপের। সন্ধের দিকে। স্টেজটা করা হয়েছিল বাইরের লনে। পরমা ছাড়াও সঙ্গে ছিল বড়বৌদি আর বুবুন। মেম্বারদের মদ্যপানের বহর দেখে, পরমা ঘাবড়ে গিয়েছিল।

এয়ারকন্ডিশনড ঘরে ঢুকেই বললাম, "বৌমা, আপনি কিছু খাবেন?"

পরমা খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর বলল, "তুমি যা খাবে, তাই খাবো।

নার্সিংহোমে আমার খাবারটা ঢাকাই পড়ে রইল।"

—এতক্ষণে বোধহয় খোঁজাখুজি শুরু হয়ে গেছে।

—হোক। নার্সিংহোমটা খুব বাজে জায়গা। আর কোনওদিন যেন যেতে না হয়।

—যেও না। বিয়ের পর, তুমি মা হবে, বাড়িতেই ডেলিভারির ব্যবস্থা করব।

—কী অসভ্য হয়ে গেছ, তুমি। গত দেড় বছরে অনেক উন্নতি হয়েছে তোমার।

—বয়সটা বেড়ে গেছে, না। স্বাভাবিক।

—এই, বাড়িতে একটা ফোন করা যাবে। মা-রা কিন্তু চিন্তা করবে।

—কিচ্ছু চিন্তা করবে না। বুঝতেই পারবে, তোমাকে কে কিডন্যাপ করেছে।

—সেই সাহস তোমার আছে ?

—দেখবে।

—থাক, আর বীরপুরুষি করতে হবে না।

এয়ারকন্ডিশনড ঘরে আরও কয়েকজন বসে। হঠাৎ নজরে পড়ল, কুণালদা। আরও দু'জনের সঙ্গে বসে বিয়ার খাচ্ছে। দেখেই আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। সাদা শূয়ারটা জানে না, আর ক'দিন পরে লাথি খাবে। আর প্রথম লাথিটা মারব আমি। দৈনিক প্রভাতে ছড়ি ঘোরানো তখন বন্ধ হয়ে যাবে। আমি পাত্তা দিতে না চাইলে কী হবে, কুণালদা উঠে এল গ্লাস হাতে। সঙ্গে পরমাকে দেখেই বোধহয়। মনে মনে তখনই ঠিক করে নিলাম, পরমার সামনে যদি বস-গিরি ফলায়, তা হলে ওর কপালে দুঃখ আছে।

—এই অয়ন, শুনলাম, তুমি বাইরে গিয়েছিলে ?

—ঠিক শুনেছেন।

—কোথায় গেছিলে।

—নর্থ বেঙ্গলের দিকে। ডুয়ার্সে।

খচ্চর, সব জানে। তবুও জিজ্ঞেস করল, "লেখালেখির ব্যাপারে ?"

—ওই রকমই। পুজো সংখ্যায়। এডিটর পাঠিয়েছিলেন।

টোটকাটা কাজে লাগল। এডিটরের নাম শুনে রঙ চলকে উঠল কুণালদার মুখে। দৈনিক প্রভাতে আমার যা পজিশন, তাতে এডিটর পর্যন্ত যাওয়ার কথা নয়। লেখালেখির কোনও ব্যাপার থাকলে, ফরমাইশটা আসে নিউজ এডিটরের মারফত। নিউজ এডিটর থেকে চিফ রিপোর্টার। তারপর পৌঁছয় আমাদের কাছে। খবরের কাগজে এটাই নিয়ম। তবে ব্যতিক্রমও আছে। আছে বলেই, গুল-টা মারলাম। সাদা শূয়ারটা একটু চমকেছে। ঠোঁটটা সামান্য বেঁকে গেছে। দেখে খুব তৃপ্তি পাচ্ছিলাম। এক চুমুকে গ্লাসটা খালি করে ফেলল লোকটা।

এত সহজে ছাড়া ঠিক হবে না। তাই জিজ্ঞেস করলাম, "লালবাজার বিট এখন কে করছে, কুণালদা ?

—দীপেন।

—এত মিস করছে কেন খবর ? ফিরে এসে পুরনো সব কাগজ ওল্টাচ্ছিলাম। ক'দিন আগে আনন্দবাজার দারুণ একটা খবর করল...এম এল এ হস্টেলে ওই মার্ডারটা নিয়ে। কই, দৈনিক প্রভাতে তো সেদিন খবরটা দেখলাম না ?

—সে দিন অফ ছিল দীপেনের।

—আরও অনেক খবর দেখলাম, আপনারা দিনের দিন করতে পারেননি কুণালদা। খিদিরপুরে বোম্ব ব্লাস্ট, গড়িয়াহাটে সোনার দোকানে ছ'লাখ টাকার ওই ডাকাতিটা। তারপর মানিকতলায়...ওই যে এক ভদ্রমহিলাকে রেপ করে, কয়েকজন অ্যান্টিসোস্যাল...উলঙ্গ করে দিনের বেলায় হাঁটিয়েছিল, সেটাও দেখলাম, আপনার কাগজ পরদিন ফলো আপ করেছে। কী হচ্ছে, কুণালদা? কাগজটা লোকে তো পয়সা দিয়ে কেনে, তাই না?

প্রশ্নটার মধ্যে জবাব চাওয়ার একটা সুর এসে গেল। সেটা বুঝে, নিজেই আমি অবাক হয়ে গেলাম। জবাব চাওয়ার কথা আমার নয়। দৈনিক প্রভাতে কোনওদিন আমি, কোনও প্রশ্নও তুলিনি। জবাব চাওয়া তো দূরের কথা। রিপোর্টারদের মিটিংয়ে রোজ টুকরো-টাকরা আমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তা নিয়েই আমি সন্তুষ্ট থেকেছি। ভেবেছিলাম, প্রশ্নটা শুনে কুণালটা চটে উঠবে। কিন্তু দেখলাম, ডিফেন্সিভ, "হ্যাঁরে, পরপর কয়েকদিন বিশ্রী ঝাড় হয়ে গেছে।"

"একটা কথা বলব কুণালদা, দীপেনকে দিয়ে চলবে না। একদম ধান্দাবাজ হয়ে গেছে। বরং নতুন কোনও ছেলেকে দিয়ে ট্রাই করুন। মৈনাক, কিংশুক—এরা সব খাটিয়ে ছেলে। কেউ না কেউ দাঁড়িয়ে যাবে।"

স্বচ্ছন্দে জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছি। পরমা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। কুণালদা বিব্রত। প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দেওয়ায় আমতা আমতা করে বলল, "তুমি কি ইন্দ্রনীলের গান শুনে অফিস যাবে? যেও কিন্তু একবার। বলতে একদম ভুলে গেছি। আজ এডিটোরিয়াল মিটিংয়ের পর এডিটর একবার তোমাকে খুঁজেছিলেন। তখন বুঝিনি। বোধহয় লেখাটার জন্য।"

এ বার চমকে ওঠার পালা আমার। ভেবেই বুঝে উঠতে পারলাম না, আমার মতো নগণ্য এক রিপোর্টারকে এডিটর কী কারণে ডাকতে পারেন। সাদা শুয়ারটা, আবার পাল্টা গুল ঝাড়ল না তো?

খবরের কাগজে সবই সম্ভব।

BOIRBOI.NET

॥ এগারো ॥

দৈনিক প্রভাতের এডিটর কুমারেশ মজুমদার আমাকে চেনেন বলে মনে হয় না। রিপোর্টিং বিভাগে উনি কদাচিৎ আসেন। বছরে খুব জোর আট-দশদিন। বছরে দু'তিন মাস তিনি বিদেশে থাকেন। নানা সেমিনার, কনফারেন্সে যান। রিপোর্টিংয়ে এডিটরকে আমরা দেখতে পাই বাজেটের দু'দিন। রাজ্য আর কেন্দ্রীয় বাজেটের দিন। এ ছাড়া বিরাট কোনও খবর হলে নিজেই চলে আসেন। কথা বলেন নিউজ এডিটর আর চিফ রিপোর্টারের সঙ্গে। এডিটরকে শেষ দেখি, দেবগৌড়া সরকারের পতনের দিন। অনেক রাত অবধি তিনি অফিসে ছিলেন। মাঝেমধ্যে লিফটে ওঠা-নামার সময় একতলা বা তিনতলায় দেখা হয়ে যায়। হয়তো লিফটে উঠতে দ্বিধা করছি। উনি ডেকে নিয়েছেন।

এই রকম একটা বড় মানুষের নামে গুল মেরে যাচ্ছি। খবরের কাগজের অফিসে অবশ্য এটাই দস্তুর। এডিটর বা মালিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে জানলে, অনেকেই চমকায়। কুণালদার সামনে অবাক হওয়া চলবে না। তাই জোর দিয়ে বললাম, "এডিটর খুঁজছেন, অথচ এতক্ষণ বলেননি ? কী ব্যাপার কুণালদা ? আজ সকালেই তো উনি আমার বাড়িতে ফোন করে অনেকক্ষণ কথা বললেন।"

কথাটা শুনে কুণালদার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এই ধরনের লোকগুলো কখনও চায় না, নতুনদের সঙ্গে ওপরের তলার যোগাযোগ থাকুক। শুকনো গলায় বলল, "কী জানি ভাই। বড় লেভেলের ব্যাপার। আমার দায়িত্ব তোমাকে বলার, বলে দিলাম।"

বলতে গেলে, কুণালদা পালিয়ে বাঁচল। পরমা অবাক হয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। হঠাৎ বলল, "এই লোকটাই কুণালদা ? বাপরে, তুমি তো রাইট অ্যান্ড লেফট গুল মেরে গেলে। তোমাদের প্রফেশনে এত মিথ্যে কথা বলতে হয় !" বলেই ও হাসতে লাগল।

বললাম, "না বললে তুমি নীচেই পড়ে থাকবে রমা। অন্যরা তোমাকে মাড়িয়ে যাবে। এদ্দিন আমার যা অবস্থা হয়েছিল।"

—এডিটর কি সত্যি সত্যিই তোমাকে ডেকেছেন নাকি ?

—হতে পারে। নাও হতে পারে। হয়তো আমার নামে কেউ কান ভাঙিয়েছে। তবে সুবিধে হবে না। দাঁড়াও তো, অফিসে একবার ফোন করে দেখি।

আসলাম বলে একটা ছেলে খাবারের অর্ডার নিতে এল। তাকে অর্ডারটা দিয়ে, সেক্রেটারির ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ঘরে আড্ডা মারছে ভোর কাগজের দেবাংশু এবং আরও দু'তিনটে নতুন ছেলে। দেবাংশু জ্ঞান দিচ্ছিল, আমাকে দেখে চুপ করে গেল। ওর হাতের কাছে ফোন। গিয়ে রিসিভার তুললাম। দেবাংশু একটু ঠেস মেরে জিজ্ঞেস করল, "অয়ন, তোর নাকি কী প্রবলেম হয়েছে অফিসে ?"

—ঠিক শুনেছিস।

—দৈনিক প্রভাত নাকি তোকে রাখছে না ?

—মনে হয়।

—কী করবি এখন ?

—বেটার একটা অফার পেয়েছি ইন্ডিয়া টুডে থেকে। বাংলা কাগজের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। ইংরেজি কাগজে অনেক সুবিধে। একটা ধরব, একটা ছাড়ব।

দেবাংশুর মুখ শুকিয়ে গেল। শুধু বলল, "বাঃ, ভালই তো।" বলেই অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। প্রফেশনে কেউ কারও ভাল খবর সহ্য করতে পারে না। ডায়াল করলাম অফিসে। দেবাংশুকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললাম, "সান্ড্রা, দিস ইজ অয়ন। পুট মি থ্রু টু এডিটরস রুম প্লিজ। টেল মাই নেম।"

আড়চোখে তাকালাম দেবাংশুর দিকে। না শোনার ভান করছে। অন্যদিকে তাকিয়েও সব কথা ও শুনবে, আমি জানি। একটু পরেই ও ফোন করবে আমাদের অফিসে দীপেনকে। সব ঢালবে। অথবা একটু পরে দীপেন মাল খেতে আসবে প্রেস ক্লাবে। দু'জনে মিলে বিয়ার গিলতে গিলতে শ্রাদ্ধ করবে আমার। ফোনে ও প্রান্ত থেকে গম্ভীর একটা গলা, "ইয়েস।"

এডিটরের সঙ্গে আগে কখনও কথা বলিনি। স্যার বলব, না কুমারেশবাবু, ঠিক

BOIRBOI.NET

করতে পারলাম না। পরক্ষণেই মনে হল, কী আসে যায়। অত খাতির করার কিছু নেই। বললাম, "আমি অয়ন ব্যানার্জি বলছি। রিপোর্টিংয়ে আছি। আপনি কি আমাকে খুঁজছিলেন ?"

—ও হ্যাঁ। আপনি কি ভাই একবার আসতে পারবেন ?

—এখনই ?

—না। একটা মিটিং করছি। সে, আফটার হাফ অ্যান আওয়ার।

—আসছি।

ফোনটা ছেড়ে দিলাম। দেবাংশু হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ও যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না, কুমারেশ মজুমদারের সঙ্গে এই মাত্র আমি কথা বললাম। টেলিফোনের পাশে রাখা বাক্সে কয়েন ফেলে দেবাংশুকে বললাম, "এডিটর রিকোয়েস্ট করছেন ইন্ডিয়া টুডে-তে না যেতে। কী করি বল তো। বুঝতে পারছি না।"

দেবাংশু বলল, "আমি হলে ভাই এত বড় অফারটা ছাড়তাম না।"

মনে মনে বললাম, "শালা খচ্চর, তুই জীবনেও এ সব অফার পাবি না। আমি দিল্লির ম্যাগাজিনে চলে গেলে, তোরই সুবিধে। লালবাজারে একা রাজত্ব করবি তা হলে। দাঁড়া, আমারও সময় আসছে। আর ক'টা দিন। লালবাজারে তোর পেছনে তিনটে লোক আমি লাগিয়ে রাখব। তোর দাদাগিরি আমি বের করব। দৈনিক প্রভাতের কন্ট্রোলটা একবার দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি নিক। তারপর আমার আসল চেহারাটা দেখবি।"

হলঘরে ইন্দ্রানীর গান শুরু হয়ে গেছে। বার পেরিয়ে কোনাকুনি ঢুকলাম ফের এয়ারকন্ডিশনড হল-এ। পরমা চুপ করে বসে আছে। আমাকে দেখেই বলে উঠল, 'এইমাত্র জ্যোতি তোমার খোঁজ করে গেল। সত্যি সত্যিই এডিটর তোমাকে ডেকেছেন।"

বললাম, "জানি। জ্যোতি আর কী বলল ?"

—তুমি নাকি সকালে বলেছ, জার্নালিজম ছেড়ে দিচ্ছ।

—হ্যাঁ।

—কেন ?

"তুমিও তো তাই চাও।" আমি ফের সাংবাদিক অয়ন হয়ে গেলাম, "সেদিন রাতে নার্সিংহোমে, তোমাকে বিছানায় মিশে থাকতে দেখে, প্রতিজ্ঞা করেছি, যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনও মূল্য নেই। তুমি যা চাইবে, তাই করব। সামান্য সাংবাদিকতার জন্য, আমি আমার সব থেকে প্রিয়জনকে হারাতে পারব না।"

এক নিঃশ্বাসে এ সব কথা বলেই, তারিফ করলাম নিজেকে। বাহ্ অয়ন, চালিয়ে যাও। তোমার উন্নতি অবধারিত। পরমা নরম, খুবই নরম দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, "অয়ন, তোমার সঙ্গে এ ক'টা দিন খুব খারাপ ব্যবহার করেছি, তাই না ?"

—আমার বোধহয় পাওনা ছিল সেটা। রমা, তুমিই বলো, আমিও কি ঠিক ব্যবহার করেছি তোমার সঙ্গে ?

—না।

পরমা আরও কী সব বলে যাচ্ছে। আমি শুনতেও পাচ্ছি না। আমি হাওয়ায়

উড়ছি। ইচ্ছেমতো শূন্যে, ঘুরে বেড়াচ্ছি। মনে হল, উন্নতির প্রথম সোপানে আমি পা রাখলাম। আমাকে আর কেউ টেনে নামাতে পারবে না।

আসলাম খাবার নিয়ে এল। পরমা চাইনিজ খাবার খুব পছন্দ করে। কলকাতার কোন রেস্তোরাঁয় কোন খাবার ভাল বানায়, তা ওর মুখস্ত। খাবারের এত নাম আমি মুখস্ত রাখতে পারি না। ও পারে। আগে যখন ওদের বাড়ি যেতাম, তখন ও মাঝেমধ্যে রান্না করে খাওয়াত। প্রথম প্রথম মনে হত ওর মায়ের বানানো। পরে অবশ্য মায়ের অনুপস্থিতিতেই ও রান্না করে খাইয়েছে। প্রেস ক্লাবের খাবার মুখে দিয়ে ও বলল, "সত্যিই প্রিপারেশনটা ভাল।"

খেতে খেতে পরমা একবার বলল, "এই, বাড়িতে একবার খবর দাও না। বলে দাও, আমি তোমার সঙ্গে আছি।"

—বাড়িতে কেউ আছেন এখন ? হয়তো নার্সিংহোমে গেছেন।

—তা হলে নার্সিংহোমেই বলে দাও। চান্দ্রেয়ীকে।

—ঠিক বলেছ। বলেই আমি এ দিক-ও দিক তাকালাম। আজকাল অনেকেই মোবাইল ফোন নিয়ে প্রেস ক্লাবে আসে। কোণের দিকে দেখলাম, একজনের কাছে আছেও। কাছে গিয়ে দেখি, সুধাংশুদা। আনন্দবাজারের নিউজ এডিটর। বড়দার বন্ধু। আনন্দবাজার টপ পোস্টের কয়েকজনকে মোবাইল ফোন দিয়েছে, কার মুখে যেন মাঝে একদিন শুনেছিলাম। এই জন্যই ওরা বড় কাগজ। একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন সুধাংশুদা। আমাকে দেখেই বললেন, "কী রে অয়ন ? কিছু বলবি ?"

—নার্সিংহোমে একটা ফোন করতে হবে। সুধাংশুদা, আপনার মোবাইলটা একবার ব্যবহার করতে দেবেন ?

—নিয়ে যা। তোরা আছিস কেমন ? চয়ন আর সুপ্রিয়া ?

—সবাই ভাল। অনেকদিন ও দিকে আপনি যান না। বড়বৌদি আপনার কথা এই ক'দিন আগেই বলছিল। রাজ্য-রাজনীতি নিয়ে আপনার একটা লেখা বেরিয়েছিল। সেটা পড়ে বৌদি বলছিল, অয়ন তোমরা কেন এ রকম বোল্ডলি লিখতে পারো না ?

আমার ভেতরের সাংবাদিক অয়ন আবার বেরিয়ে এল। আদৌ বৌদি প্রশংসা করেনি। তবু মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। শুনে খুশি হলেন সুধাংশুদা। বললেন, "শর্মিলা আর প্রসূনের মুখে প্রায়ই তোর কথা শুনি। একদিন আয় না অফিসে আমার কাছে ?"

BOIRBOI.NET

হেসে বললাম, "সুধাংশুদা, আমাদের অফিসে আমার বদনাম আছে, আমি নাকি আনন্দবাজারের লোক। আনন্দবাজারের যা দেখি, সব ভাল। এমনিতে অফিসে কোণঠাসা। তার উপর যদি আপনাদের ওখানে কেউ দেখে ফেলে, তা হলে হয়তো চাকরিটাই চলে যাবে।"

—তুই কি আনন্দবাজারে আসতে ইন্টারেস্টেড ?

—ছোটবেলা থেকে আমার একটাই স্বপ্ন সুধাংশুদা। প্রফেশনে তো এসেছি, আপনাকে দেখেই।

—ঠিক আছে। জানা রইল। তোর সঙ্গে মেয়েটা পরমা না ? কত ছোট ওকে দেখেছি।

—হ্যাঁ, সুধাংশুদা।

—যা, বেচারি একা খেতে পারছে না। ফোনটা পরে দিয়ে যাস।

ফোনটা নিয়ে এসে বসলাম পরমার কাছে। প্রথমদিন গিয়েই নার্সিংহোমের নম্বরটা টুকে রেখেছিলাম টেলিফোন ডিরেক্টরিতে। সেটা বের করে নম্বর টিপলাম। চান্দ্রেয়ীকে পাওয়া গেল পি বি এক্স মারফত। খুব বিরক্তির সঙ্গে ও বলল, "কী ছেলেমানুষি করেছ তোমরা? মাসিমা-মেসোমশাইয়ের কী অবস্থা জানো? ওদেরই এখন নার্সিংহোমে ভর্তি করতে হবে।"

—প্লিজ চান্দ্রেয়ী, ম্যানেজ করে দাও।

ফোনটা কেড়ে নিল পরমা। ফিসফিস করে কী সব বলল। একটু পরে বুঝলাম ও মা-বাবার সঙ্গেও কথা বলছে। তারপর সুইচ অফ করে বলে উঠল, "যাক বাবা, নিশ্চিন্ত। আমাকে তুমি লেক গার্ডেন্সে পৌঁছে দিয়ে আসবে। রাতে খেয়ে দেয়ে বাড়ি যাবে।"

—মাথা খারাপ?

—মা কিন্তু রাগ করবে।

—করুক। এখন ঘনঘন খাওয়া-দাওয়া করলে পরে আর শ্বশুরবাড়িতে দর পাব না।

—তোমার দর আমাদের বাড়িতে কখনও কমবে না অয়ন। জানো মাঝে বাবা আর মা খুব মনমরা হয়ে গেছিল। সুপ্রিয়াদির কাছে মা ছুটে ছুটে যেত। তোমার খোঁজ খবর নিত। বাবা পর্যন্ত একদিন বলল, "মা, অয়নের আশা তুই ছেড়ে দে।" কিন্তু আমি জেদ ধরে ছিলাম।

কথা বলতে বলতে খাওয়া হয়ে গেল। বিল চুকিয়ে বললাম, "রমা, তুমি বসে ইন্দ্রনীলের গান শোনো। আমি চট করে ঘুরে আসি অফিস থেকে।"

—না। আমি তোমার সঙ্গে যাব। তোমাদের অফিস দেখব।

—সে কী, ইন্দ্রনীল?

—দেখো, ও একদিন আমাদের বাড়িতে এসেই গান গেয়ে যাবে।

—মাই গড, আজকাল জ্যোতিষীও করছ নাকি?

—ঠাট্টা কোরো না।

—প্রেস ক্লাব থেকে যখন বেরিয়ে আসছি। তখনও ইন্দ্রানী গান গেয়ে যাচ্ছেন। আমাদের অফিস খুব সামনেই। মেট্রো গলির পাশে। খিদিরপুর ক্লাবের মাঠ কোনাকুনি পেরিয়ে কোয়ালিটি ইন-এর কাছে এলাম। বিকেলের ধর্মতলা। খুবই ব্যস্ত। ভিড় এড়িয়ে দু'জনে যখন দৈনিক প্রভাত অফিসে পৌঁছলাম, তখন বিকেল সাড়ে চারটে বাজে। রিসেপশনের পাশেই ক্যাজুয়াল বিজ্ঞাপনের দফতর। সেখানে কিছু লোক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে। সোফায় বসার জায়গা পর্যন্ত নেই। রিসেপশনিস্ট অঞ্জলি আমার সঙ্গে পরমাকে দেখে মুখ টিপে হাসল। ওকে বললাম, "এই ভদ্রমহিলা নীচে একটু ওয়েট করবেন। আমি চট করে ওপর থেকে ঘুরে আসছি।"

লিফটে করে তিন তলায় উঠেই দেখতে পেলাম, ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন কুমারেশ মজুমদার। চোখাচোখি হতেই বললেন, "অয়ন?"

ঘাড় নাড়লাম। সত্যি বলতে কী, আমি একটু অবাক। এডিটর আমাকে চেনেন,

ধারণা ছিল না।

—আসুন, ভেতরে আসুন। বলেই উনি আবার ভেতরে ঢুকলেন। পিছন পিছন ঘরে ঢুকে আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম। এডিটরের ঘরটা এত সাজানো-গোছানো যে, চোখটা ধাঁধিয়ে গেল। মনে হল, বড় কোনও কর্পোরেট হাউসের কোনও ডিরেক্টরের ঘরে ঢুকেছি। পাইপ ধরিয়ে কুমারেশ মজুমদার বললেন, "আপনি শুভঙ্কর চ্যাটার্জিকে চেনেন ?"

—চিনি। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল পরমার কাকাকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বড় অফিসার। দিল্লিতে থাকেন। আমাকে খুবই ভালবাসেন। কলকাতায় এলেই খোঁজ করেন আমার।

—আপনার কেউ হন ?

—আমার বান্ধবীর কাকা হন।

জবাবটা শুনে এডিটর মুচকি হেসে বললেন, "কাগজের জন্য শুভঙ্করবাবুকে একটা রিকোয়েস্ট করতে পারবেন ?"

—নিশ্চয়ই।

—আমরা একটা মেশিন আনছি জার্মানি থেকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্লিয়ারেন্স দরকার। মেশিনটা এলে আমরা ইভনিং এডিশন বের করতে পারব। প্লাস রাতে বাড়তি এক লাখ কাগজ। শুভঙ্করবাবুকে নিয়ে কাজটা আপনাকে করিয়ে দিতে হবে।

—কিন্তু উনি তো এখন দিল্লিতে।

—জানি। আপনি ফোনে কথা বলতে পারেন। অথবা কাল বিকেলের ফ্লাইটে দিল্লিও চলে যেতে পারেন। আপনার ইচ্ছে। জি এম সমীরণবাবু সব কাগজপত্র আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন।

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?

—হ্যাঁ, বলুন।

—শুভঙ্কর চ্যাটার্জি যে আমাকে চেনেন সেটা আপনি জানলেন কী করে ?

পাইপে আগুন ধরিয়ে এডিটর বললেন, "ব্যাপারটা কী জানেন, জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে একজনকে আমরা পাঠিয়েছিলাম দিল্লিতে। তার কাছেই উনি আপনার খুব প্রশংসা করেন। আচ্ছা, আপনি কি ভাই ইউনিভার্সিটিতে গোল্ড মেডাল পেয়েছিলেন ?

BOIRBOI.NET

—হ্যাঁ। পলিটিক্যাল সায়েন্সে।

—আই সি। এখানে আপনি কী ?

—ছয় বছর ধরে কাজ করছি রিপোর্টিংয়ে। এখনও কোনও প্রেমোশন পাইনি।

কালো মোটা ফ্রেমের চশমার ফাঁক দিয়ে এডিটর আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর কী ভেবে বললেন, "ঠিক আছে। শুভঙ্করবাবুর সঙ্গে পারলে আজই ফোনে কথা বলে নিন।"

—আপনাকে কি আজই জানাতে হবে ?

—জানালে ভাল হয়। আমি কনফারেন্স রুমে আছি। খবরটা আমার পিএ-কে দিয়ে যাবেন।

বলেই উঠে পড়লেন এডিটর। দু'জনে ঘর থেকে বেরিয়ে করিডোরে এলাম।

ডান দিকেই লিফট। দেখি, কুণালদার সঙ্গে দীপেন আর সুধীন বেরিয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি ওরা বাঁ দিকে টয়লেটে ঢুকে পড়ল। মনে মনে হাসলাম। তিনজনই কয়েক পেগ টেনে এসেছে। এডিটরের সামনাসামনি হতে চাইল না।

নীচে নামতেই পরমা জিজ্ঞাসা করল, "কী হল ? এনিথিং রঙ ?"

—না। সামথিং ভেরি ভেরি পজেটিভ। এই তোমার শুভকাকার ফোন নম্বর মনে আছে ? দিল্লির অফিস বা বাড়ির ফোন নম্বর ?

—এখনই দরকার ? তা হলে বাড়ি থেকে জেনে নিচ্ছি।

—একবার জেনে নাও তো। এখন হয়তো অফিসেও পাওয়া যেতে পারে। এখনও ছ'টা বাজেনি।

রিসেপশনিস্ট অঞ্জলির ডেস্কের সামনে টেলিফোন। সেখান থেকে ডায়াল করলাম লেক গার্ডেন্সে। চার পাঁচটা ফোন নম্বর নিয়ে ফের উপরে উঠে এলাম। এবার সঙ্গে পরমা। রিপোর্টিংয়ে মাত্র একটাই এস টি ডি ফোন। চিফ রিপোর্টারের ঘরে। সাদা শুয়ারের ঘরে ঢুকব না। মনে পড়ল, স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টেও একটা ডাইরেক্ট লাইন আছে। ফোনে ওরা সব দেশ-বিদেশের খবর করে। ওদের জন্য তাই আলাদা ব্যবস্থা। স্পোর্টস এডিটর রূপায়ণ ছেলেটা খুব ডায়নামিক। আমার থেকে দু'-এক বছরের ছোট। খুব নাম করেছে। পরমাকে নিয়ে ওদের ঘরেই ঢুকলাম। রূপায়ণ বলল, "কী ব্যাপার অনয়দা ? ফিলিপস লিগের টিকিট, না রোয়িংয়ের খবর ? কোনটা চাই ?"

—কোনওটাই না। এ হচ্ছে পরমা। আমার হবু স্ত্রী। তোদের এখানে ঢুকলাম দিল্লিতে একটা এস টি ডি করার জন্য। অফিসেরই দরকারে।

—করো। কৌশিক, ভাই, পরমাদিকে একটু বসতে দাও তো।

স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টে সবাই হাজির। কোনও চেয়ার খালি নেই। কৌশিক বলে ছেলেটা উঠে নিজের চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "রূপায়ণদা, তা হলে আমি ক্যান্টিন থেকে একটু ঘুরে আসছি।"

—যা, দু'টো সফট ড্রিঙ্কস পাঠিয়ে দিতে বলিস। কুইক।

ফোনটা টেনে দিল্লিতে ডায়াল করতে লাগলাম। এনগেজড। এক ফাঁকে বললাম, "তোদের ঘরটা আরও বড় হওয়া উচিত, তাই না ?"

রূপায়ণ বলল, "বহুবার বলেছি। কুণালদারা শোনেই না। একটা প্লেয়ার দেখ করতে এলে বসতে দিতে পারি না। ঘরে একটা টিভি নেই। রাতের দিকে কোনও খেলা থাকলে, মুসকিল হয়ে যায়। অন্য কাগজগুলো টিভি দেখে খবরটা দিয়ে দেয়। আর আমাদের অপেক্ষা করতে হয় এজেন্সি রিপোর্টের জন্য। ফার্স্ট এডিশনে ক্রিকেটের কোনও খবর পুরোটা দিতে পারি না। লোকে আমায় গালাগাল করছে।"

রূপায়ণ যা বলছে, ঠিক। সামান্য ব্যাপার। একটু নজর দিলেই সমাধান করা যায় এ সব সমস্যার। কিন্তু করবে কে ? লোকে এখন খবরের কাগজের প্রথম পাতাটা চোখ বুলিয়েই, বারোর পাতায় চলে যায়। খেলা এতটাই বড় আকর্ষণ। মনে মনে বললাম, ক্ষমতা যদি হাতে পাই, তা হলে রূপায়ণ, তোকেও আমি সঙ্গে নেব।

দিল্লির লাইন ঘোরাতে ঘোরাতে, একটা সময় পেয়ে গেলাম। কাকাবাবু অফিসেই। ফোন তুলে বললেন, "জানতাম, তুমি আমাকে ফোন করবে। তোমাদে

অফিসের সেই মেশিনের ব্যাপারটা তো ?"

—কাকাবাবু, আজ এডিটর নিজে আমাকে ডেকে, আপনাকে রিকোয়েস্ট করার জন্য বললেন। কাজটা কী করে দেওয়া যাবে ?

—যাবে। কিন্তু তাতে তোমার কী সুবিধা হবে ?

—এখান থেকে বলা যাবে না।

—তোমার যদি কোনও সুবিধা হয়, করে দেব।

—কবে নাগাদ ক্লিয়ারেন্সটা পাওয়া যাবে ?

—আজই পাঠিয়ে দিতে পারি। কিন্তু দু'দিন সময় নিচ্ছি। পারলে এর মধ্যে নিজের কাজটা গুছিয়ে নাও। অয়ন, পরমা এখন কেমন আছে ? শুনলাম, ও নাকি নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছে ?

—তেমন কিছু না। আজই ওকে নার্সিংহোম থেকে কিডন্যাপ করে এনেছি। আমার পাশেই আছে। কথা বলবেন ?

—দাও।

পরমা উঠে এসে কথা বলতে লাগল কাকাবাবুর সঙ্গে। রূপায়ণ চাপা গলায় আমাকে বলল, "অয়নদা, লেক ক্লাবে এশিয়ান রোয়িং শুরু হচ্ছে ক্লাব থেকে। মিসম্যানেজমেন্টের চূড়ান্ত। রতন গিয়েছিল লেক ক্লাবে। আমাদের রিপোর্টটা কিন্তু একটু কড়া হচ্ছে। সুদীপ্ত সেন তোমার কাছে কমপ্লেন করতে পারে। শুনলাম, তোমরা একই সঙ্গে রোয়িং করতে।"

—আমার কাছে কমপ্লেন করে সুবিধা হবে না। তোরা যা ভাল বুঝবি, লিখবি। খবরের জন্য কারও সঙ্গে কোনওদিন কম্প্রোমাইজ করবি না।

—তবুও, তোমাকে জানিয়ে রাখলাম। সে দিন সব্যসাচী ক্রিকেটের একটা খবর করল। কোন কর্তা এসে লাগাল কুণালদাকে। না বুঝে, কুণালদা বাধ্য করল আমাকে কনট্রাডিকশন ছাপাতে। পরে শুনলাম, ইডেনে খেলা হলেই নাকি চিফ রিপোর্টারের বাড়িতে সাত-আটটা করে ক্লাব হাউসের টিকিট যায়। এ সব ধান্ধাবাজি চললে তো, আমাদের পক্ষে কাজ করা মুসকিল।

বললাম, "একটু ধৈর্য ধরে থাক। শিগ্গির খবর পাবি, জমানা বদলাচ্ছে।"

পরমাকে সঙ্গে নিয়ে একটু পরেই বেরিয়ে এলাম। রিপোর্টিংয়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, সবার নজর আমাদের দিকে। ঈশিতা, স্নিগ্ধা, পারমিতা সবাই ডে ডিউটি করছে। আমার দিকে তাকিয়ে ঈশিতা মুখ টিপে হাসল। স্নিগ্ধার মুখেও রহস্যময় হাসি। মনে হল পরমাকে ও চেনে অথবা আগে কখনও দেখেছে। টেলিপ্রিন্টার মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সিদ্ধার্থ বলে নতুন একটা ছেলে। শুনেছি, এ বার আই এ এস পরীক্ষা দিয়েছে। পোস্টিং পেলেই চাকরি ছেড়ে দেবে। সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলল, "এই অয়নদা, গুড নিউজ। আপনি টাইমস-এর রুরাল রিপোর্টিংয়ের অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছেন। এই যে টেলিপ্রিন্টারে এখন খবরটা আসছে।"

নিউজ ডেস্কের দু'-তিনজন হই হই করে উঠে গেল টেলিপ্রিন্টার মেশিনের কাছে। ঝুঁকে পড়ে খবরটা দেখতে লাগল। চিফ সাব এডিটরের চেয়ারে বসে রয়েছে ভাস্কর। কে একজন, প্রিন্টার থেকে কাগজটা ছিঁড়ে ওকে দিল। খবরটা পড়েই ভাস্কর ওখান থেকে বলল, 'ফার্স্ট প্রাইজ। দশ হাজার টাকা। অয়নদা, কবে

খাওয়াবেন, বলুন।"

পরমা আর আমি, রিপোর্টিয়ের ঠিক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। অন্তত, সাত-আটজন রিপোর্টার তখন বসে লিখছে। কেউ উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে কনগ্রাচুলেশনস জানাল না। সবার মুখ গম্ভীর। ইচ্ছে করেই বললাম, "ভাস্কর, দ্যাখ তো, সেকেন্ড প্রাইজটা কে পেয়েছে?"

—বোম্বে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার কে এক গুরগণ। থার্ড প্রাইজ কোচিনের মালয়ালাম মনোরমার অ্যান্ড্রু ফিলিপস।

সবাইকে শুনিয়েই হাসতে হাসতে বললাম, "রিপোর্টার হিসাবে আমি তা হলে খুব একটা খারাপ নই। কী বল? এই খবরটা কি কাল দৈনিক প্রভাতে বেরোবে? না বেরোলেও ক্ষতি নেই। ভারতের অন্য সব কাগজ কিন্তু ছাপবে।"

পুরো রিপোর্টিং বিভাগে শ্মশানের নীরবতা। রিপোর্টিং থেকে কিংশুক আর সৌমিত্র উঠে আমাদের পাশ দিয়েই টয়লেটের দিকে গেল। আমি হাসিমুখে একবার সবার মুখের দিকে তাকালাম। মনে মনে বললাম, "তোমাদের এই দম্ভ আমি ভেঙে চুরমার করে দেব।"

পরমার হাত ধরে টানলাম। করিডোর দিয়ে হেঁটে লিফটের সামনে এসে দাঁড়াতেই দেখি কিংশুক আর সৌমিত্র। হাত বাড়িয়ে বলল, 'কনগ্রাচুলেশনস অয়নদা। আপনাকে ওখানেই জানাতে পারতাম। ভয়ে পারিনি। ওরা তা হলে, পরে আমাদের ছিঁড়ে খেত।"

—থ্যাঙ্কস। মন দিয়ে কাজ কর। একদিন তোরাও অ্যাওয়ার্ড পাবি।

—অয়নদা, আপনার মতো ধৈর্য কিন্তু আমাদের নেই।

স্পষ্ট দেখলাম, পরমা চমকে ওদের দিকে তাকাল। লিফট এসে তিনতলায় দাঁড়াতেই ভেতরে ঢুকলাম। সারাটা দিন আজ স্বপ্নের মতো কাটছে। দুপুরে পরমার সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাওয়া, বিকেলে এই অ্যাওয়ার্ড পাওয়া— মনে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। পরমার দিকে তাকালাম। ওর চোখ-মুখে চাপা গর্ব। অসাধারণ লাগছে ওকে দেখতে। দু'জন তাকিয়ে রইলাম দু'জনের দিকে। লিফট গ্রাউন্ড ফ্লোরে এসে থামতেই পরমা হাত বাড়িয়ে বলল, "কনগ্রাটস, মিঃ অয়ন ব্যানার্জি।"

হাসতে হাসতে হাতে হাত ধরে বেরিয়ে এলাম দু'জনে। চিফ ফটোগ্রাফার শ্যামল চন্দ রিসেপশনে দাঁড়িয়ে। ওর কাঁধে ক্যামেরার ব্যাগ। হাতে স্ট্যান্ড ও অবাক হয়ে একবার তাকাল পরমার দিকে। অসভ্যের মতো তাকিয়েই রইল। শ্যামলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব খারাপ। সুজয়কে দিয়ে ভাল কিছু ছবি তোলানোর জন্য, বেশ কিছুদিন ধরেই ও চটে আছে আমার উপর। দেখা হলেও কথা বলে না। মাস দু'য়েক আগে নিউজ এডিটরের কাছে ও আমার নামে অভিযোগ করেছিল।

বাংলাদেশ বর্ডার দিয়ে চোরা চালান নিয়ে একটা ফিচার লিখতে গেছিলাম বনগাঁ। অফিসেরই গাড়ি করে। ছবি তোলার জন্য শ্যামলও যায় আমার সঙ্গে। ওখানে খিটিমিটি বাঁধে সামান্য কারণে। সেদিন হাজার দু'য়েক গরু বেআইনিভাবে পাচার হচ্ছিল। ও দারুণ একটা ছবি পেয়ে যায়। বেলা তিনটে থেকেই শ্যামল বলতে থাকে, "চল, ফিরে যাই। না হলে আজ ছবি ধরাতে পারব না।" তখনও আমার অনেক কাজ বাকি। বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম, "তুই চলে যা। গাড়ি আমি ছাড়তে

পারব না।" শ্যামল রাগ করে ফিরে আসে ট্রেনে। পরদিন অফিসে ওর সঙ্গে প্রচণ্ড কথা কাটাকাটিও হয় আমার। ঝগড়ার সময় ও বলেছিল, 'সুজয়টা শালা মাগীদের দালাল। ওর কাছ থেকে তুই কাট মানি খাস।" এই কথা শোনার পর আমি নিজেই ওর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিই।

শ্যামল খুব প্রফেশনাল। তবে বদরাগী। ওর সঙ্গে অফিসের কারও সদভাব নেই। পেশাদার লোকেরা একটু স্বার্থপর হয়। শ্যামলও দৃষ্টিকটুভাবে স্বার্থপর। সত্যি বলতে কী, ওর ওই পেশাদার মনোভাবের জন্য মনে মনে আমি ওকে সম্মানও করি। পরমাকে নিয়ে গেটের বাইরে আসতেই দেখি, পিছু পিছু শ্যামলও এসে দাঁড়িয়েছে। আমাকে পাত্তা না দিয়ে, পরমাকে ও বলল, "ম্যাডাম, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড ; আপনার একটা ছবি তুলতে পারি ?"

পরমা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। শ্যামলকে ও চেনে না। ওর অবাক হওয়াই স্বাভাবিক। আমি কিন্তু বুঝলাম, শ্যামলের দরকার এবং তা এখনই। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কী জন্য তুলবি রে ?"

—কাগজের জন্য। দোলের দিন একটা সাপ্লি বেরোবার কথা হচ্ছে। আট পাতার। সাপ্লি-টা দেখে মৈনাক ভদ্র। সেদিন আমার কাছে একটা ফ্রেশ মুখ চাইল। কালারে ইজ করতে চায়। মনের মতো সেই মুখ পাচ্ছি না।

মৈনাক ভদ্র অ্যাসিস্টান্ট এডিটর। সাপ্লিমেন্টারি পাতা হলে, উনি তা দেখেন। অ্যাড ডিপার্টমেন্ট মাঝেমধ্যে বাড়তি কিছু বিজ্ঞাপন আনে। কোনও ইস্যু ধরে তখনই সাপ্লি পাতা হয়। এ ছাড়াও, বছরে কয়েকটা দিন আছে, যে দিনগুলোতে প্রত্যেকটা কাগজই সাপ্লি করে। যেমন পয়লা বৈশাখ, জামাইষষ্ঠী, রথযাত্রা, বিজয়া দশমী, ভাই ফোঁটা, বড়দিন, দোলযাত্রা।

শ্যামলকে বললাম, "ছবিটা কাল তুললে চলবে ?"

—ম্যাডাম কখন আসতে পারবেন ?

—বিকেলের দিকে।

—তা হলে আমার কাছে নিয়ে আসিস। ডোবাস না কিন্তু।

—আরে, না না।

শ্যামল চলে যাওয়ার পরই পরমা বলল, "কাগজের অফিসটা অদ্ভুত জায়গা। তুমি উঠে যাওয়ার পর, নীচে বসে, সব লক্ষ করছিলাম। আচ্ছা, সুধীন বলে কোনও রিপোর্টার আছে ?"

BOIRBOI.NET

—আছে। কেন বলো তো ?

—আজকের কাগজে আনন্দমার্গীদের সম্পর্কে কী যেন লিখেছে। ওরা সব দল বেঁধে প্রোটেস্ট করতে এসেছিল।

—ও তো রোজকার ঘটনা।

মেট্রো গলি দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম আমরা। বাঁ দিকে আনারকলি রেস্তোরাঁর ভিড় ঠেলে বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। সন্ধেবেলায় ধর্মতলা থেকে ট্যাক্সি পাওয়া খুব কঠিন। কাছেই একটা সাবওয়ে তৈরি হয়েছে। সেই সময় রাস্তা খোঁড়া হয়েছিল। রাস্তাটা ছোট হয়ে গেছিল। এখনও তা সারানো হয়নি। এই জায়গাটাই কলকাতার সেরা জায়গা। এখানে একটা আইল্যান্ড করলে দেখতে সুন্দর লাগবে। কেন যে

কর্পোরেশনের মাথায় ঢোকে না, কে জানে ?

মেট্রোর কাছে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি খুঁজছি, এমন সময় দেখা অনন্তদার সঙ্গে। বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছেন। অনন্ত মাইতি সিনিয়র প্রুফ রিডার। বয়স পঞ্চাশের মাঝামাঝি। চোখে পুরু চশমা। ব্যবসার পাতায় প্রুফ দেখেন। অফিসে একটু বদনাম আছে অনন্তদার। সাতটা-সাড়ে সাতটার মধ্যেই নাকি পাতার কাজ উনি শেষ করে ফেলেন। তারপর বড় রাস্তায় এসে পায়চারি করেন ধর্মতলার মোড় থেকে মিউজিয়াম পর্যন্ত। ওই সময়টায় ওই অঞ্চলে বাজে মেয়েদের ভিড় থাকে। অনন্তদা নাকি লোলুপ দৃষ্টিতে ওই সব মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন। অফিসের অনেকেই নাকি দেখেছে, মাঝেমধ্যে অনন্তদা দরদস্তুরও করেন।

—অয়ন, বাড়ি ফিরছিস ? মেয়েটা কে ?

—হবু স্ত্রী অনন্তদা।

—বিয়ে করছিস। গুড, গুড। তোরা, আজকালকার ছেলে-ছোকরারা খুব চালক। আমরা তো তোদের বয়সে এমন ব্যস্ত রইলুম, বিয়ে করারই সময় পেলুম না। এখনও ব্যাচেলার রয়ে গেলুম।

—ব্যাচেলার, না আনম্যারেড অনন্তদা ?

হা হা করে হাসলেন উনি। তারপর বললেন, "যা বলিস। তোদের মতো যদি আমি ইংরেজি জানতুম, তা হলে কল্যাণ আর নিউজ এডিটর হতে পারত না। ম্যাট্রিক পাশ করে ঢুকে পড়লুম এই কাগজে। নলিনীবাবু তখন চিফ রিপোর্টার। প্রথম দিনেই সাবধান করে দিল, "কাগজের চাকরিতে ঢুকেছ, বাবাজীবন বিয়ে-থার স্বপ্ন দেখো না। জীবনে সুখী হবে না। এ খুব বেয়াড়া চাকুরি।" চিফ রিপোর্টারকে আমরা খুব মানতুম তখন। ব্যস, বিয়েই করলুম না।"

পরমা খুব হাসছিল, অদ্ভুত এই কারণটা শুনে। হাসিমুখেই জিজ্ঞেস করল, "আপনি না হয়, বিয়ে করতে চাননি। আপনাকে কেউ বিয়ে করতে চায়নি তখন ?"

—চেয়েছিল। শোনো না, শোভা মাইতির নাম শুনেছ ? কংগ্রেস লিডার। তখন আমি রাইটার্স বিট করতাম। একদিন আমাকে ডেকে বলল, "শোন অনন্ত, ভাল একটা মেয়ে আছে বিয়ে করবি ? পার্টির মেয়ে। ওর তোকে খুব পছন্দ।" আমি বললুম, নলিনীদাকে জিজ্ঞেস করি। তারপর বলব। নলিনীদাকে জিজ্ঞেস করতেই, খাপ্পা। এই মারে তো সেই মারে। ব্যস, বিয়ে কেচে গেল।

অনন্তদা আগে রিপোর্টিংয়ে ছিলেন, জানতাম না। অবাক হয়ে বললাম, "আপনি প্রুফ রিডিংয়ে এলেন কী করে অনন্তদা ?"

—কল্যাণটার জন্য। আমার পেছনে লাগল। একটা স্টোরি করেছিলুম। তখন রিফুজিদের নিয়ে। সেন্ট্রাল গাভমেন্টের পাঠানো ত্রাণ সামগ্রী মিসইউজ করা হচ্ছে। এ নিয়ে রানাঘাটের রিফুজি ক্যাম্পে একদিন গণ্ডগোল হল। স্টেট গাভমেন্টের দু'জন অফিসার মার খেল। চিফ মিনিস্টারকে কল্যাণ বলে দিল, স্টোরিটা অনন্তর। চিফ মিনিস্টার কী কমপ্লেন করল নলিনীদার কাছে। আরও বলল, আমাকে না সরালে সরকার কাগজকে বিজ্ঞাপন দেবে না। ব্যস, পরদিন নলিনীদা আমায় ট্রান্সফার করে দিল প্রুফ রিডিংয়ে। আমার ডিমোশন হল।

—আপনি প্রতিবাদ করলেন না ?

—কোনও লাভ হত না। ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্য। এখন তোদের রিপোর্টারদের যা কীর্তিকলাপ আমার দম বন্ধ হয়ে যায় রে। বেরিয়ে আসতে পারলে বাঁচি। তাই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি। মানুষজন দেখি। কলকাতাটা খুব বদলে গেল রে অয়ন।"

বিষণ্ণ হয়ে এল অনন্তদার গলা। চোখ থেকে চশমাটা খুলে শার্টের কোণ দিয়ে মুছতে থাকলেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল। খবরের কাগজে সেই ট্রাডিশন, তা হলে সমানে চলছে। কল্যাণদারা এক সময় ছিল। এখন এসেছে দীপেনরা। হয়তো আমাদের পরে এ রকম কেউ ঢুকবে। কে জানে, অনন্তদার নামে বদনাম হয়তো এক সময় কল্যাণদারাই রটিয়েছে। পরমা হাত ধরে টানতেই বললাম, "আজ চলি অনন্তদা।"

গ্র্যান্ড হোটেলের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। ওখানে ট্যাক্সি পাওয়া সহজ। রাস্তায় বেশ ভিড়। সবাই ব্যস্ত। প্রচুর বাস, মিনিবাস আর প্রাইভেট কার, অধৈর্য হয়ে ছুটে যাচ্ছে। ভিড়ে ছিটকে যাওয়ার ভয়ে পরমা আমার হাত ধরে রয়েছে। এ ভাবে রাস্তায় হাঁটার অভ্যেস ওর নেই। কিছুদিন আগে হকার উচ্ছেদ হয়েছে রাস্তা থেকে। তবুও ফুটপাত দিয়ে হাঁটা যাচ্ছে না। উল্টোদিকে একটা ট্যাক্সি টার্ন নিচ্ছিল। হাত দেখিয়ে থামিয়ে, তাতে উঠে পড়লাম।

ট্যাক্সিতে বসেই আমার কাঁধে মাথা হেলিয়ে দিল পরমা। ওর কোমর জড়িয়ে, ওকে কাছে টেনে নিলাম। পরমা ক্লান্ত হয়ে গেছে। মনে হল, বাধা দেওয়ার শক্তিও নেই। ফিসফিস করে বললাম, "এই, দুপুরে একটা প্রশ্ন করেছিলাম। তার উত্তর তো তুমি দিলে না রমা?

চোখ বুজে ছিল পরমা। কেমন যেন ঘোর লাগা অবস্থায় জিজ্ঞাসা করল, "কোন প্রশ্নটার গো?"

—এই প্রফেশনে আর থাকব কি না?

চোখ খুলে সোজা হয়ে বসল পরমা। তারপর বলল, "প্রফেশন ছাড়ার কথা স্বপ্নেও ভাববে না। এই প্রফেশনে যা সম্মান, অন্য কোথাও তুমি পাবে না। নার্সিংহোমে ক'টা দিন থেকে তো দেখলাম, সবাই তোমাকে চেনে। ক'টা মেয়ের ভাগ্যে এমন বর জোটে?"

BOIRBOI.NET

॥ বারো ॥

সঙ্গে একজন সুন্দরী মহিলা থাকলে যে কত কাজ দেয়, তা এখন টের পাচ্ছি। কেডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে গেছিলাম স্টিফেন হাউসে। সঙ্গে পরমা। ঘরে ঢুকতেই লক্ষ করলাম, পরমাকে দেখে কেডিয়ার চোখ-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। তবে তা কয়েক সেকেন্ডের জন্য। পরমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে, কেডিয়া মুখ ফসকে বলে ফেললেন, "ইউ টু সিম টু বি মেড ফর ইচ আদার মিঃ ব্যানার্জি।"

বললাম, "পারহ্যাপস।"

—বসুন, বসুন অয়নবাবু, আমাদের কথা কিছু ভাবলেন?

—আপনাদের অফারটা খারাপ না। কবে জয়েন করতে হবে?

—এনি ডে ইউ লাইক। আপনি জয়েন করলে, মাস তিনেকের জন্য আপনাকে পাঠানো হবে হংকংয়ে। ফর্মাল ট্রেনিং নেওয়ার জন্য।

—অফার লেটারটা কি আজই পাওয়া যাবে ?

—তৈরিই আছে। আজ নিয়ে যান। অ্যাকসেপ্ট করবেন কি না, তা এক সপ্তাহের মধ্যে জানিয়ে দেবেন। বাই দ্য বাই, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?

—বলুন।

—মিস চ্যাটার্জিও বা কেন আমাদের এখানে জয়েন করবেন না। আমরা দু'জন ফিমেল ব্রডকাস্টার চাইছি। সেই সঙ্গে কম্প্রেয়ারও।

পরমা হেসে বলল, "কত মাইনে দেবেন মিঃ কেডিয়া। টিভি ব্রডকাস্টারের কাজটা খারাপ না। যাদবপুরে আমার সঙ্গে একটা মেয়ে পড়ত। নাম মধুমন্তী। এখন টিভি-তে খবর পড়ে।"

—কত মাইনে আপনি এক্সপেক্ট করেন মিস চ্যাটার্জি।

—না, না আমি ঠাট্টা করছিলাম।

—বাট আই অ্যাম নট জোকিং। ইউ হ্যাভ নাইস ভয়েস অ্যান্ড ফটোজেনিক ফেস। ইওর প্রোনান্সিয়েশন সিমস টুবি ভেরি গুড। আপনারা দু'জনেই আসুন না।

পরমা বলল, "থ্যাঙ্কস ফর ইওর অফার মিঃ কেডিয়া। আমার বাবার একটা ছোট্ট বিজনেস আছে। ভবিষ্যতে সেটা আমাকেই চালাতে হবে। আমার পক্ষে চাকরি করা সম্ভব নয়।"

—অ্যাজ ইউ উইশ। বলেই ইন্টারকমে কাকে যেন ডাকলেন কেডিয়া। আমি ঘরের চারপাশটা একবার জরিপ করে নিলাম। আদৌ এখানে চাকরি করব কি না, তার ঠিক নেই। তবুও অফার লেটার আজ নিতে এসেছি। ভবিষ্যতে কাজ দেবে। অফিসটা খুব সুন্দর করে সাজিয়েছেন কেডিয়ারা। পুরো একটা ফ্লোর জুড়ে। নীচে স্টুডিও। আশপাশে সব ঝকমকে ছেলেমেয়ে। কেডিয়া বেছে রিক্রুট করছেন বলে মনে হল।

একটু পরেই স্কার্ট পরা একটা মেয়ে ফাইল হাতে ঘরে ঢুকল। তাকে দেখে পরমা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "লীনা, তুই ?"

কেডিয়া বললেন, "ডু ইউ নো ইচ আদার ?"

লীনা বলে মেয়েটা বলল, "হ্যাঁ স্যার, ও আর আমি ব্র্যাবোর্নে একই সঙ্গে পড়তাম।

—তা হলে তো ভালই হল মিস চ্যাটার্জি। দুই বন্ধু একই অর্গানাইজেশনে কাজ করবেন।

কথাটা শুনে লীনা বলল, "ওর চাকরির দরকার নেই স্যার। দে আর ভেরি ভেরি রিচ।"

—আই সি। একটু লজ্জা পেয়েই বললেন কেডিয়া।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমরা বেরিয়ে এলাম স্টিফেন হাউস থেকে। আমার পকেটে কেডিয়ার অফার লেটার। কাল খুব অসুবিধা হয়েছিল বাড়ি ফিরতে। তাই আজ গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছি। দু'জনে মিলে দৈনিক প্রভাত অফিসে যাব। আমি

এডিটরের সঙ্গে কথা বলতে। পরমা শ্যামলের কাছে যাবে ছবি তুলতে। তারপর ঢুকব কোনও রেস্তোরাঁয়। পরমা আজ বেশ সেজেগুজে বেরিয়েছে। দারুণ লাগছে ওকে। ইচ্ছে করছে, ওকে আদরে আদরে ভরিয়ে তুলতে। কিন্তু আমার ইচ্ছেটা এখন বড় কথা নয়।

কাল বাড়ি ফিরে খুব বকুনি খেয়েছি বড়দার কাছে। পরমাকে নিয়ে নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্য। আমাকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছিল বড়বৌদি, "শুধু শুধু ওকে বকছ কেন? আমার বোনকে তো আমি তোমার চেয়েও ভাল চিনি। ও-ই নাচিয়েছে অয়নকে।"

রাগে গজগজ করেছিল বড়দা; "যতটা ছেলেমানুষি। এত বয়স হল পার্সোনালিটি গ্রো করল না। তুমিই দায়ী এ জন্য। আদর দিয়ে মাথা খেয়েছ।"

—রমাকে তুমি চেনো না? কারও কথা ও শোনে?

মোক্ষম জবাব পেয়ে ওই সময় বড়দা চুপ করে গেছিল। অফিসে যাওয়ার পথে, হাসতে হাসতে কথাগুলো বললাম পরমাকে। শুনে ও মুখ টিপে হাসল। তারপর বলল, "চয়নদাকে একদিন এমন একটা ঝামেলায় ফেলব, দেখো, কেঁদে কুল পাবে না।"

অফিসে পৌঁছে, পরমাকে ফটোগ্রাফি সেকশনে পৌঁছে দিয়ে, আমি উপরে উঠে গেলাম। সবে এডিটোরিয়াল মিটিং শেষ হয়েছে। এডিটরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন নিউজ এডিটর, অ্যাসিসট্যান্ট এডিটর আর চিফ রিপোর্টাররা। ওরা সবাই অবাক হয়ে তাকালেন আমার দিকে। মনে মনে হাসলাম। আর ক'দিন পর, আমাকেও ডাকতে হবে মিটিংয়ে। দৈনিক প্রভাত কাগজ চলবে আমারও পরামর্শে।

পি এ মোহনবাবু বোধহয় খবর দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ডেকে নিলেন এডিটর। ঘরে আর এক ভদ্রলোক বসে। বেশ ভারিক্কি চেহারার। এর আগে অফিসেই দেখেছি। নীল রঙের একটা মারুতি ভ্যানে যাতায়াত করেন। ভদ্রলোক কে, তা অবশ্য জানি না। কুমারেশবাবু বললেন, "অয়ন, আজই দিল্লিতে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। শুভঙ্করবাবুকে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে দিও, আমার তরফে।"

এডিটর আমাকে বসতে বলেননি। সোফায় বসব কি না, ভাবছি। এমন সময় উনি বললেন, "বোসো অয়ন, তোমার সঙ্গে আরও কথা আছে। ইনি সমীরণ স্যান্যাল। আমাদের জি এম। তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান।"

সমীরণবাবু বললেন, "বিনায়ক গোয়েঙ্কাকে আপনি চেনেন?"

—চিনি।

—কতটা পরিচয় আপনার সঙ্গে?

—উনি আমার বাবার বন্ধু। দীর্ঘদিন ধরে আমাকেও দেখছেন। টলি ক্লাবে মাঝেমধ্যে উনি গলফ খেলতে যান। সেখানেও দেখা হয় আমার সঙ্গে।

—আপনি গলফ খেলেন নাকি?

—হ্যাঁ। ইন ফ্যাক্ট, বিনায়ক আঙ্কল এখনও কর্পোরেট টুর্নামেন্টগুলোয় নামেন। দু'-তিনবার ওনার পার্টনার হয়েও খেলেছি।

—হ্যাঁ, উনি আমাকে তাই বলছিলেন। সপ্তাহ খানেক পর, মার্চেন্টস কাপ গলফ শুরু হচ্ছে। আপনি আমার পার্টনার হয়ে খেলবেন?

—গতবার বিনায়ক আঙ্কলের সঙ্গে খেলেছি। সেমিফাইনাল পর্যন্ত উঠেছিলাম। জানি না, উনি আমাকে ছাড়বেন কি না।

—কিন্তু অফিসের প্রতিও আপনার একটা কর্তব্য আছে।

এবার আমি সরাসরি তাকালাম সমীরণবাবুর দিকে। তারপর বললাম, "ওটা রেসিপ্রোকাল হওয়া উচিত।"

—আই ডিড নট গেট ইউ মিঃ ব্যানার্জি।

বিনয়ের খোলস ঝেড়ে ফেলে এ বার আমি সাংবাদিক অয়ন হতে শুরু করলাম, "মিঃ স্যান্নাল, গত ছয় বছর আমি এই ইন্সটিটিউশনের কাজ করছি। ইভন টু ডে, আই ডোন্ট নো, হোয়াট উড বি মাই ফেট ইন দিস অর্গানাইজেশন। প্রতি বছর আমি কুড়ি থেকে পঁচিশটা করে এক্সক্লুসিভ স্টোরি দিয়েছি। পাঁচ সাতটা বেরিয়েছে। বাকিগুলো হয় অন্য কাগজে লিক করে দেওয়া হয়েছে, না হয় ফেলে দেওয়া হয়েছে ওয়েস্ট পেপার বক্সে। আমার থেকে তিন বছরের জুনিয়র ছেলেকেও সিনিয়র রিপোর্টার করে দেওয়া হল। অথচ আমি আজ পর্যন্ত কোনও প্রোমোশন পাইনি। আমার মতো এডুকেশনাল ব্যাক গ্রাউন্ড এই কাগজে অন্য কোনও রিপোর্টারের নেই। আই অ্যাম আ গোল্ড মেডালিস্ট অব ক্যাল ইউনিভার্সিটি ...।

গলার স্বর একটু চড়ে যাচ্ছিল। মিঃ স্যান্নাল বললেন, "ডোন্ট বি সো এক্সাইটেড মিঃ ব্যানার্জি।"

দূর, লোকটাকে এত পাত্তা দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি গলার স্বরে সেই রকম ঝাঁঝ রেখেই বললাম, "দেয়ার আর রিজনস টু বি। অপদার্থ, ধান্ধাবাজ কিছু লোক কাগজটাকে শেষ করে দিচ্ছে। এখানে থাকারই আর ইচ্ছে নেই আমার মিঃ স্যান্নাল।"

এডিটরের মুখটা গম্ভীর। বললেন, "আপনি জানেন, আপনি কী বলছেন?"

ঘরে ঢোকার সময় এডিটর তুমি-তে নেমে এসেছিলেন। আবার আপনিতে ফিরে গেছেন। এটা লক্ষ করেই বললাম, "গত পনেরো দিনে আমরা অন্তত পাঁচটা ইন্সিডেন্ট মিস করেছি। কলকাতার বুকে, দিনের বেলায় ঘটে যাওয়া সব ইন্সিডেন্ট। পরদিন ঘটা করে তা ফলো আপ করেছি আমরা। লোকে জানে, আমি এই কাগজে কাজ করি। কেউ আর এখন একটা কাগজ পড়ে, সন্তুষ্ট হয় না। কিছু মিস হলে জবাবদিহিটা আমাদের মতো লোকদেরই করতে হয়। এটা আমার সহ্য হয় না।"

সমীরণবাবু বললেন, "আপনার কোন স্টোরি গ্যাগ করা হয়েছে, স্পেসিফিক কোনও এক্সাম্পল দিতে পারেন?"

অনেক এক্সাম্পল দিতে পারি। অজয় মিত্র বলে এক ভদ্রলোক পঁয়ত্রিশ বছর বিনা বিচারে আটক ছিলেন প্রেসিডেন্ট জেলে। নিশ্চয়ই জানেন, এটা বেআইনি। সেই খবরটা আমি লিখে চিফ রিপোর্টারের হাতে দিই। পরদিন সেটা না বেরোনোয় যখন জিজ্ঞাসা করি, তখন আমাকে বলা হল, এটা কোনও খবরই নয়। পরে ওই খবরটাই অন্য কাগজে অ্যাঙ্কর করে বেরোয়। তখন আমাকে বলা হল, কেন এই খবর করতে পারিনি।

এডিটর বললেন, "লেখার কপি আমাকে দেখাতে পারবেন?

—হ্যাঁ, সাত পাতা। আমার কাছেই আছে।

হাতের পাশেই ইন্টারকম। রিসিভার তুলে এডিটর ডেকে পাঠালেন নিউজ এডিটরকে। তারপর বললেন, "আর কোনও এক্সাম্পল দিতে পারেন ?

—প্লেন্টি। এ রকম কমপ্লেন আপনি অনেকের কাছেই পাবেন। কিংশুক, সৌমিত্র, দেবপ্রিয়— অনেকেই বলবে। অ্যান্ড দে আর অল আপকামিং রিপোর্টার্স। খবর না বেরোনোয় সবাই দমে যাচ্ছে। যে সব খবর বেরোয়, তার পিছনে কোনও না কোনও মতলববাজি থাকে।

—যেমন ?

—ক'দিন আগে একটা খবর বেরোল, লি রোডের এক মধুচক্র থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে রীনা দাশগুপ্ত বলে এক মহিলাকে। উনিই নাকি মক্ষিরানি। আসলে বিধবা ভদ্রমহিলার ওই বাড়িটার উপর লক্ষ্য ছিল এক প্রোমোটারের। তিনি কিনতে চেয়েছিলেন। ভেঙে আটতলা ফ্ল্যাট বাড়ি করবেন। ভদ্রমহিলা রাজি হচ্ছিলেন না। পুলিশের কনাইভেন্সে সেই প্রোমোটার মধুচক্র সাজিয়ে বেইজ্জত করলেন ভদ্রমহিলাকে। খবরটা আমাদের কাগজে ফলাও করে বেরোল, "মধুচক্র থেকে মক্ষিরানি গ্রেফতার।"

—মিসেস দাশগুপ্তর ভার্সান বেরিয়েছিল ?

—না। আমাদের এক স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট-এর ইন্টারেস্ট ছিল যাতে না বেরোয়। প্রোমোটার তাকে কথা দেন, নামমাত্র দামে একটা ফ্ল্যাট তিনি দেবেন। আমি কিন্তু পুলিশ সোর্স থেকে খবরটা পেয়ে, লিখে দিই চিফ রিপোর্টারকে। আসল ঘটনা, চেপে দেওয়া হয়। সেই বাড়ি এখন খালি হয়ে গেছে।

—মিসেস দাশগুপ্তকে আমার কাছে আনা যাবে ?

—সম্ভব না। ভদ্রমহিলা সুইসাইড করেছেন। ফলে প্রোমোটারের পক্ষে সেই বাড়ি দখল নেওয়া, সুবিধা হয়ে যায়।

সমীরণবাবু তাকিয়ে রইলেন এডিটরের দিকে। চোখ-মুখ দেখে বুঝতে পারলাম, উনি অসম্ভব রেগে গেছেন। আমাকে বললেন, "আপনার কথা যে সত্যি তার কোনও প্রমাণ আছে ?

—আছে। ভদ্রমহিলা আমার কাছে একটা চিঠি লেখেন। আমার সাহায্য চেয়ে। সেই চিঠি আপনাকে দেখাতে পারি।

নিউজ এডিটর কল্যাণ মল্লিক ঘরে ঢুকলেন এই সময়। কুমারেশবাবু খুব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "কুণাল কতদিন চিফ রিপোর্টার পোস্টে আছে, কল্যাণ ? বছর তিনেক হয়ে গেছে ?

—বোধহয়।

—কী রকম চালাচ্ছে রিপোর্টিং ?

কল্যাণ মল্লিক বোধহয় বুঝতে পারলেন, এটা সাদামাটা প্রশ্ন নয়। কায়দা করে উত্তর দিলেন, "মাঝেমধ্যে একটু আধটু গণ্ডগোল করে ফেলে। আমাকেই সামাল দিতে হয়।"

—ওর বিরুদ্ধে তো সিরিয়াস কতকগুলি চার্জ আছে।

—তাই নাকি ? আমাকে তো কেউ কখনও বলেনি।

—দেখো কল্যাণ, কাগজের ম্যানেজমেন্ট বদলাচ্ছে, জানো বোধহয়। যিনি টেক

ওভার করছেন, তিনি নতুন করে শেক আপ করতে চান। আমি রিপোর্টিং ঢেলে সাজাতে চাই। তুমি এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করো। কাল কথা বলব, এ নিয়ে। এখন তুমি আসতে পারো।"

কল্যাণ মল্লিক মাথা নিচু করে উঠে গেলেন। আমি আন্দাজ করলাম, আজ সন্ধ্যার মধ্যেই সারা অফিসে এ সব কথা রাষ্ট্র হয়ে যাবে। প্রথমে জানবে, চিফ সাব এডিটররা। কেন না, ওরা নিউজ এডিটরের আস্থাভাজন হয়। তারপর নিউজ ডেস্ক হয়ে কথাগুলো ছড়িয়ে যাবে রিপোর্টিংয়ে। এও রটবে, অদল-বদলে আমারও কিছু ভূমিকা আছে। ছড়াক, আমার কিছু আসে-যায় না।

এডিটর আমাকে বললেন, "অয়ন, আমরা এখন একটা ট্রাঞ্জিশন পিরিয়াডের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। এক্সপ্যানসনের কথা ভাবছি। তোমাদের মতো ছেলেরা যদি ছেড়ে চলে যায়, তা হলে গ্রোথ হবে কী করে?"

লোহা গরম থাকতে থাকতেই ঘা মারা ভাল। কথাটা মনে হতেই বললাম, "কুমারেশবাবু, ইন ফ্যাক্ট, আজ আপনার কাছে আমি রেজিগনেশন দিতেই এসেছিলাম। ভাল একটা অফার পেয়েছি। একটা টিভি চ্যানেলে আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু কুইট। তবু এত সব কথা বললাম, কাগজটাকে ভালবাসি বলে।"

—ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, অফারটা কী জানতে পারি?

সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে কেডিয়ার অফার লেটার বের করে এগিয়ে দিলাম। চিঠিটা উল্টেপাল্টে পড়ে, উনি বললেন, "ইটস আ গুড অফার, নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। কিন্তু আমার রিকোয়েস্ট, দৈনিক প্রভাত ছেড়ো না। এখানে তোমার ব্রাইট ফিউচার। চাই কী, একদিন তুমি ডিরেক্টরও হয়ে যেতে পারো। কী বলেন মিঃ স্যান্নাল?

কথাটা বলেই এডিটর অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন সমীরণবাবুর দিকে তাকিয়ে। মাথা নেড়ে সমীরণবাবু এ বার বললেন, "অয়নবাবু, কাল একবার টলি ক্লাবে যাব। আপনি আসবেন? কোর্সটা একবার দেখে নেব।"

বললাম, "কখন?"

—দশটা-সাড়ে দশটার সময়। তা ছাড়া বিনায়ক গোয়েঙ্কার সঙ্গেও একটু কথা বলতে হবে। বিজ্ঞাপনের জন্য।

—যাব।

BOIRBOI.NET

এডিটর আমার দিকে তাকিয়ে এ বার বললেন, "ঠিক আছে, অয়ন। আমি দেখছি, কাজ করতে তোমার যাতে অসুবিধা না হয়।"

ইঙ্গিত বুঝে, আমি উঠলাম। স্পষ্ট দেখলাম, দু'জনে ফের চোখাচোখি হল। কেন জানি না, হঠাৎ মনে হল, ওরা যে কারণে আমাকে ডেকেছিলেন, সেই কথাটা কিন্তু বললেন না। রেজিগনেশন দেওয়ার কথাটা কি না বললেই আজ ভাল হত? কে জানে? এডিটরের ঘর থেকে বেরোবার পর, একবার ইচ্ছে হল, রিপোর্টিংয়ে ঢুকি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই ইচ্ছেটা দমিয়ে ফেললাম। অনেকেই আজ আমাকে বাঁকা চোখে দেখবে। তা দেখে, ফের রাগ হয়ে যাবে। কী দরকার? তা ছাড়া পরমা বসে আছে শ্যামলদের ঘরে। নিশ্চয়ই ওর ছবি তোলা হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই একা একা বোর হচ্ছে।

ফটোগ্রাফি সেকশন দোতলায়। কাচ দিয়ে ঘেরা। দূর থেকে দেখতে পেলাম, পরমা বসে গল্প করছে শ্যামলের সঙ্গে। আমাকে দেখেই শ্যামল বলে উঠল, "অয়ন, তোর বান্ধবীর ফেস এত ফটোজেনিক, আমি আশাই করিনি। মৈনাকদার অপছন্দ হবে না।"

বললাম, "আজ তুই আমার সর্বনাশ করে দিলি শ্যামল।"

—কেন রে ?

—তোর হাতে ছবি, মানে মডেলিং ওয়ার্ল্ডে ঢোকার সার্টিফিকেট। গেল, বান্ধবীটা আমার হাতছাড়া হয়ে গেল।

শুনে শ্যামল আর পরমা দু'জনেই হাসতে লাগল। একটু তোল্লাই দেওয়ার জন্যই শ্যামলকে কথাটা বললাম। ওর প্রচণ্ড ইগো।

—কথাটা তুই মন্দ বলিসনি অয়ন। ম্যাডাম যদি চান, তা হলে ছবিগুলো আমি ড্রিম মার্চেন্টসে পাঠিয়ে দিতে পারি। ওরা কিন্তু লুফে নেবে।

পরমা বলল, "দিন পাঠিয়ে। কিছু রোজগার করে নেওয়া যাক। "শ্যামলদা, দু'-একটা ছবি আমায় দেবেন তো ?"

—সার্টেনলি। অয়নের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব। অবশ্য যদি তদ্দিনে আপনি ওর হাতছাড়া না হয়ে যান।

পরমা আর আমি দু'জনেই হেসে উঠলাম। শ্যামলের ঘরে এসে আমি হাসি-ঠাট্টা করছি, এটা দেখলে ওপরের ফ্লোরের অনেকেই অবাক হয়ে যেত। শ্যামল জমিয়ে বসেওছে। ওর টেবলে ডাই করা মুড়ি, তেলেভাজা। আড্ডায় ফটোগ্রাফার, আর ডার্ক রুমের দু'টো ছেলেও রয়েছে। মুড়ি খাওয়া আর গল্প করা—দুটোই চলছে। অবাক হয়ে দেখলাম, পরমাও সবার সঙ্গে টুকটাক তেলেভাজা চালিয়ে যাচ্ছে। এই যদি আমি খেতাম, পাঁচ কথা শোনাত।

কথায় কথায় হঠাৎ শ্যামল বলল, "সুজয় ছেলেটা তোর কেমন ধরনের আত্মীয় রে অয়ন ?"

—আমার আত্মীয় ? কে তোকে বলল ?"

—ও-ই বলে বেড়ায়। একটা সময় তোকে খুব ভাঙিয়েছে। এখন দেখছি, খুব মাখামাখি দীপেনদের সঙ্গে। ব্যাপারটা কী ? প্রেস ক্লাবে সে দিন দেখি, নিজের পয়সায় মাল খাওয়াচ্ছে কুণাল আর দীপেনকে। আর তোর নামে টুকটাক নিন্দে করছে।

BOIRBOI.NET

—কী বলছে ?

—যাক, সে সব কথা ম্যাডামের সামনে আর বলা যাবে না।

—জগতের এটাই নিয়ম রে শ্যামল, যার যত উপকার করবি, সে-ই তোকে বেশি বাঁশ দেবে।

পরমা বলে উঠল, "সুজয় ছেলেটা এত খারাপ, তা তো জানতাম না ?"

শ্যামল বলল, "দোষটা কিন্তু অয়নের। লাই দিয়ে খুব বাড়িয়েছে। ম্যাডাম জানেন, ছেলেটা কী করছে আজকাল ? টিভি সিরিয়ালে নামিয়ে দেবে, এই প্রমিস করে, আজকাল বহু ইয়ং মেয়েকে ডাকছে স্টুডিওতে। দেখবেন, আগরওয়াল বলে একটা লোক মাঝেমধ্যেই ওর সঙ্গে ঘোরে। সে নাকি প্রোডিউসার। আগরওয়ালের

সঙ্গে মেয়েদের পরিচয় করিয়ে দেয় সুজয়। তারপর লোকেশন দেখানোর নাম করে, অথবা শুটিংয়ের... আগরওয়াল মেয়েদের নিয়ে যায় কলকাতার কাছাকাছি কোনও রিসর্টে। আমার চেনা দু'একটা মেয়ে কমপ্লেনও করেছে ক'দিন।"

সুজয়ের সম্পর্কে এ সব কথা শুনে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। বললাম, "মেয়েগুলো পুলিশের কাছে যাচ্ছে না কেন?"

—চট করে কি কেউ পুলিশের কাছে যেতে চায় রে অয়ন। নানা ঝামেলা। ও শুয়ারের বাচ্চা, নানা জায়গায় তোর নেম ড্রপ করে। কোথায়, কবে ফাঁসিয়ে দেবে টেরও পাবি না। সবাই জানে, ও তোর খুব কাছের লোক। তোর সবথেকে বড় দোষ কী জানিস অয়ন, তুই লোক চিনতে পারিস না।"

পরমা বলল, "ঠিক বলেছেন। ও এত ভাল মানুষ, সবাই কাজ বাগিয়ে, তারপর আর চিনতেও পারে না।"

সুজয়কে নিয়ে আলোচনা মোটেও আমার ভাল লাগছিল না। প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্য হালকাভাবে বললাম, "কারেক্ট। দেখবি শ্যামল, এই ম্যাডামও একদিন আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে।"

শ্যামল কিন্তু কথাটা হালকাভাবে নিল না। সিরিয়াস হয়ে বলল, "দ্যাখ অয়ন, তোর একটা গুড ম্যান ইমেজ আছে বাজারে। এই সুজয় ছেলেটা .... আমার ভয় হচ্ছে ... তা নষ্ট করে দেবে। তোকে নিয়ে সেদিন কিছু কথা বলছিল, মোটেই আমার ভাল লাগেনি।"

—ছাড় তো। ও কী করবে আমার?

—এটাই ভুল করছিস। পিঁপড়ে যত ছোটই হোক, কামড়ালে কিন্তু লাগে।

কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ফটোগ্রাফি সেকশনে ঢুকল ঈশিতা। ওর পরনে প্যান্ট শার্ট। হাতে ফিল্মের একটা রোল। আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ও শ্যামলকে বলল, "কুণালদা এটা পাঠাল। প্রিন্ট করতে হবে।"

মুহূর্তে শ্যামলের গলা পাল্টে গেল, "কার ছবি রে?"

—বোধহয় সুজয় বসুর। চিফ মিনিস্টার আজ হলং গেলেন। তার ছবি।

—কুণালকে বলো, ডার্করুমে এখন লোক নেই। হবে না।

কাগজে সবই সবার খবর রাখে। ইশিতা বলল, "শ্যামলদা, প্লিজ আমাকে ডুবিও না। আজ আমার নাইট। দেরি হলে মুসকিলে পড়ব। এমনিতেই কাগজ রোজ লেট হচ্ছে। আমার মুখ চেয়ে, আজ অন্তত ছবিটা করে দাও।"

শ্যামল বলল, "তুই ওপরে গিয়ে বল, সুজয়ের ছবি আমরা কেউ করব না। শালা আমার এখানে পাঁচটা লোক বসে আছে। আর রেগুলার অ্যাসাইনমেন্টের ছবি করছে বাইরের লোক! এ সব আর চলবে না।

শ্যামলের রাগ দেখে ঈশিতা বেরিয়ে গেল। আমিও উঠে পড়লাম। শ্যামল আমাকে বলল, "কাণ্ডটা দেখলি।"

ওকে উসকে দেওয়ার জন্যই বললাম, "এই ইস্যুটা ছাড়িস না। পারলে, এই অফিসে ঢোকা বন্ধ করে দে ছেলেটার। কাল আমিও বলব, এডিটারকে।"

পরমাকে নিয়ে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। লম্বা করিডোর—সোজা লিফট পর্যন্ত। বাঁ দিকে লাইব্রেরি। ডান দিকে পরপর প্রসেস, আর মেকাপ সেকশন।

একেবারে শেষে ডি টি পি-র ঘর। ওপর থেকে আমরা যে সব কপি পাঠাই, প্রথমে সে সব কম্পোজ হয় ডি টি পি-তে। তারপর ওখানেই আর্টপুল হয়ে চলে যায় ওপরে সাব এডিটরদের কাছে। রাতের ডিউটিতে ওপরে যারা থাকে, তারা আর্টপুলগুলো নিয়ে নীচে নেমে আসে। ছবি পাঠিয়ে দেয় প্রসেসিং-য়ে। তারপর গিয়ে ঢোকে মেকাপ রুমে। প্রসেস আর মেকাপ রুমে আমাদের ঢোকার দরকার হয় না। যারা পেজ মেকাপ করে, তারাই যাতায়াত করে। এই দায়িত্বটা সাব এডিটরদের। ডামি শিটে নিউজ এডিটর নির্দেশ দিয়ে যান, কোন খবর কীভাবে যাবে। মেকাপ রুমে নেমে, সাব এডিটররা, রাতে সেই নির্দেশ অনুযায়ী, পাতায় আর্ট পুল বসিয়ে আর্টিস্টদের দিয়ে পেজ মেকাপ করে।

পরমাকে সব বোঝাতে বোঝাতে যাচ্ছি। হঠাৎ মেকাপ রুম থেকে বেরিয়ে বেরিয়ে এল ঈশিতা। আমাকে দেখে হাসতে হাসতে বলল, "আমার সঙ্গে আপনার বান্ধবীর পরিচয় করিয়ে দেবেন না অয়নদা? ভয় নেই, আমার কিছু ভাল রিপোর্টই দেব আপনার সম্পর্কে।"

পরমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম, "তুমি এক কাজ করো। ঈশিতা, নিউজ ডেস্ক ছেড়ে চলে এসো রিপোর্টিংয়ে।"

ভয় পাওয়ার ভান করে ঈশিতা বলল, "মাই গড। ওখানে যাব! আমাকে কি পাগলা কুকুর কামড়েছে?"

শুনে হাসতে লাগলাম, "ঠিকই বলেছ। রিপোর্টিংয়ে অনেক লোক এখন কুণালফোবিয়ায় ভুগছে। ছবির ব্যাপার ট্যাকল করলে কীভাবে?"

—এখনও করিনি। এই ওপরে যাচ্ছি। গিয়ে বলব। বাপরে, ওপরে যা হচ্ছে এখন, সাইক্লোন। পারলে, কুণালদা এখনই ছিঁড়ে খাবে আপনাকে। ঘরে সাত আটজনকে নিয়ে মিটিং বসিয়েছে। আপনি নাকি, কী সব কমপ্লেন করেছেন এডিটরের কাছে?"

—খবরটা এর মধ্যে পৌঁছে গেছে কুণালের কানে।

—এ সব খবর কখনও চাপা থাকে কাগজের অপিসে? সাবধান অয়নদা, লোকটা কিন্তু আপনার কেরিয়ার শেষ করে দেবে।

—কে কার কেরিয়ার শেষ করে, দেখাই যাক না ঈশিতা।

—আপনাকে একটা জিনিস আমি দেখাতাম অয়নদা। কিন্তু...

পরমার দিকে তাকিয়ে ঈশিতা ইতস্তত করছে দেখে আমি বললাম, "কী ব্যাপার, এনিথিং সিরিয়াস?"

ঘাড় নাড়ল ঈশিতা। তারপর বলল, "পরমা, ইফ ইও ডোন্ট মাইন্ড, অয়নদাকে দু'মিনিটের জন্য লাইব্রেরিতে নিয়ে যাব?"

পরমা বলল, "আমি নীচে রিসেপশনে গিয়ে বসছি তা হলে।"

—যাও।

ঈশিতার সঙ্গে লাইব্রেরিতে গিয়ে বসলাম। এই সময়টায় লাইব্রেরি ফাঁকা থাকে। লাইব্রেরিয়ান ভক্তিবাবু পাঁচটার সময় বেরিয়ে যান। আর উনি বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মীদের উৎসাহ নিভে যায়, যে যার আড্ডা মারতে বেরোয়। এক কোণে গিয়ে আমরা দু'জন বসলাম। ঈশিতা বলল, "খুব বিশ্বাস করে একটা কথা আপনাকে

বলব। কথা দিন, আমার নামটা কাউকে কোনওদিন বলবেন না।

—কী এমন ব্যাপার ঈশিতা ?

—দিন তিনেক আগে সৌমিত্রকে নিয়ে কুণালদা আর কল্যাণদার মধ্যে সামান্য কথা কাটাকাটি হয়েছিল। সৌমিত্র পোর্ট ট্রাস্টে দুর্নীতি নিয়ে কী একটা কপি দিয়েছিল। কুণালদা সেটা ওর ঘরের ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দেয়। এবং সেটা সৌমিত্রর সামনেই...

বছর তিনেক আগে, কুণালদা আমার একটা কপিরও একই দশা করেছিল। সেটা মনে পড়তে বললাম, "তারপর কী হল ? কল্যাণদার সঙ্গে লাগল কেন ?"

—সৌমিত্রকে তো জানেন, একটু আপরাইট ধরনের। ও গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কমপ্লেন করে কল্যাণদার কাছে। কল্যাণদাও তেমনি। যতক্ষণ কুণালদা অফিসে ছিল, ততক্ষণ কিছুই করল না। কুণালদা বেরিয়ে যেতেই, এসে ডেস্কের সামনে হম্বিতম্বি শুরু করল। তারপর হঠাৎ আমাকে বলল, "এই যা তো, কুণালের ঘর থেকে সৌমিত্রর কপিটা নিয়ে আয়।" কুণালদার ঘরে গিয়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে হাতড়াবার সময় অদ্ভুত একটা জিনিস পেলাম। চারভাগে ছিঁড়ে ফেলা একটা চিঠি।

—কার চিঠি ?

—বলছি। আমাদেরই এক কলিগের লেখা। কৌতূহলে একটা অংশ পড়তে গিয়ে চমকে উঠি। কাউকে কিছু না বলে ছেঁড়া অংশগুলো নিয়ে আমি বাড়ি চলে যাই। ছেঁড়া অংশগুলো বাড়িতে জুড়ে, যা পড়লাম, ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

—কে কাকে লিখেছে চিঠিটা ঈশিতা ?

—আপনাকে দিচ্ছি। আপনি পড়ে দেবেন। প্লিজ অয়নদা, কেউ যেন জানতে না পারে।

পকেটের ভেতর থেকে একটা খাম বের করে ঈশিতা বলল, "বাড়িতে নিয়ে যান। গিয়ে পড়বেন। কাল সকালে একবার আপনাকে ফোন করব, অয়নদা। ভাবতেই খারাপ লাগছে। অফিসটা কী ছিল, কী হয়ে গেছে।"

দু'জনে মিলে বেরিয়ে এলাম লাইব্রেরি থেকে। করিডোর দিয়ে হেঁটে আসছে পারমিতা বলে একটা মেয়ে। আরেক সাব এডিটর। কুণালদার খুব কাছের। অফিসে এই মেয়েটার খুব সুনাম আছে। দেখতে সুন্দরী, আগে কাজ করত 'বিজনেস টাইমস' বলে একটা কাগজে। কুণালদাই ওকে আমাদের কাগজে নিয়ে আসে। ইংরেজিতে চোস্ত। কিন্তু বাংলায় সে রকম ভাল না। ঈশিতার সঙ্গে সম্পর্ক খুব খারাপ। মেয়েটা অফিসে গতক্ষণ থাকে, খুব কম কথা বলে। থাকে হিন্দুস্থান পার্কের দিকে কোথাও। মাঝেমধ্যে কুণালদার গাড়িতে যায়। একই দিকে বাড়ি বলে। পারমিতাকে কিছুদিন আগে কুণালদা এক মাসের জন্য জার্মানিতে পাঠিয়েছিল। কী একটা ট্রেনিং নিতে। সেই সময় ঈশিতা একদিন রাগে ফেটে পড়েছিল আমার কাছে। পারমিতাকে কেউ অবশ্য ঘাটায় না। কুণালদা চটে যাবে বলে।

পারমিতাকে আসতে দেখেই ঈশিতা চট করে ফের লাইব্রেরির ভেতর ঢুকে গেল। বোধহয়, ও পারমিতাকে জানতে দিতে চায় না, আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে। ব্যাপারটা বুঝে, মনে মনে হাসলাম। খবরের কাগজ এখন কর্পোরেট হাউসের মতো হয়ে গেছে। সবাই সবাইকে সন্দেহ করে। কেউ কাউকে পছন্দ করে না। সামান্য

স্বার্থের জন্য, মুখ ফিরিয়ে নিতেও দ্বিধাবোধ করে না। এই কামড়াকামড়ি বোধহয় কর্তৃপক্ষও পছন্দ করে। ইচ্ছে-করেই একজনের পিছনে আরেকজনকে লাগিয়ে রাখে। একেবারে আমেরিকান দস্তুর 'হায়ার অ্যান্ড ফায়ার।' তোকে টাকা দিচ্ছি, দায়িত্ব দিচ্ছি। টিকতে পারলে টেকো, না হলে কাটো। এমনটা কিন্তু আগে ছিল না।

পরমা রিসেপশনে বসে। লিফটের জন্য অপেক্ষা না করে আমি সিঁড়ি দিয়ে নামলাম।

সন্ধে এখন ছ'টা-সাড়ে ছ'টা। গত ছয় বছরে কখনও এই সময়টায় অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাইনি। চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটিয়েছি। কেউ কথা বলতে এলে বিরক্ত বোধ করেছি। সিনেমা-থিয়েটারে পা দিইনি। কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতে পারিনি। এ নিয়ে অনেক অশান্তি হয়ে গেছে আমার জীবনে। অথচ আজ স্বচ্ছন্দে প্রেমিকার সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছি রেস্তোরাঁয় খেতে। কথাটা মনে হতেই, কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করলাম।

—অয়নদা কেমন আছেন ?

—প্রশ্নটা শুনে তাকিয়ে দেখি, নির্মল। হকার অ্যাসোসিয়েশনের পাণ্ডা। শ্যামবাজার না হাতিবাগান, কোথায় যেন থাকে। বছর খানেক আগে আমার সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছিল পি জি হসপিটালে। অসুস্থ বাবাকে ভর্তি করাতে পারছিল না নির্মল। আমি করিয়ে দিয়েছিলাম। মাঝেমধ্যে আমাদের অফিসে আসে। লিফটে উঠতে-নামতে কখনও কখনও দেখা হয়। খবরের কাগজের আসল লোক ওরাই। সার্কুলেশন বিভাগের কর্তারা, কখনও ওদের চটায় না। রিসেপশনে দাঁড়িয়ে ওকে বললাম, "ভাল। তোমার বাবা কেমন আছেন ?"

—ভাল। আজ একটা জরুরি মিটিং ডেকেছিলেন, সার্কুলেশনের মনোজিৎবাবু। তাই দেখা করতে এলাম। এ বার আমি প্রেসিডেন্ট হয়েছি হকার অ্যাসোশিয়নের।

—বাঃ। শুনে খুব ভাল লাগল।

—অয়নদা, আপনাদের তো সান্ধ্য দৈনিক বেরোচ্ছে। জানেন ?

—শুনেছি। কবে থেকে, তা অবশ্য জানি না।

—সে সম্পর্কেই আলোচনা করার জন্য ডেকেছিল আমাকে। শুনলাম, টার্গেট পয়লা বৈশাখ।

—চলবে মনে হয় ?

BOIRBOI.NET

—নিশ্চয়ই চলবে। আজকের সংবাদ একটা বের করে। ওদের সার্কুলেশন খারাপ না। জনকণ্ঠ বলে আরেকটা কাগজও বেরোয়। তবে ওদের মার্কেট পেতে অসুবিধা হবে না। যাঃ, অনেকক্ষণ আপনাকে আটকে রাখলাম। বৌদি হয়তো অসন্তুষ্ট হচ্ছে।"

পরমা হেসে বলল, "না। না।"

নির্মল আমাদের সঙ্গেই বেরিয়ে এল গেট দিয়ে। মারুতিটা রাখা আছে পার্কিং লটে। সেদিকে দু'পা বাড়াতেই দেখি, সুকান্ত। মাথার চুল উস্কো-খুস্কো।

গালে অনেকদিনের না-কামানো দাঁড়ি। পরনে ময়লা একটা রঙিন পাঞ্জাবি। ওর চোখ দু'টো কিন্তু খুব উজ্জ্বল। সুকান্ত ছেলেটা কোনও একটা ব্যাঙ্কে চাকরি করে।

সেই সঙ্গে লিটল ম্যাগাজিন চালায়। মাঝেমধ্যে গল্প লেখে নিরঞ্জনদার পাতায়। পরমাকে সঙ্গে দেখে ও বোধহয় ইতস্তত করছিল, আমার সঙ্গে কথা বলবে কি না। তা ভেবে সেটা লক্ষ করে, নিজেই এগিয়ে গেলাম। "এই সুকান্ত, এখানে দাঁড়িয়ে ?"

ম্লান হেসে ও বলল, "নিরঞ্জনদার জন্য ওয়েট করছি।"

—ওপরে চলে যা। হয়তো আছেন।

—গেলে রাগ করবেন, অয়নদা।

—কেন ?

—অনেক ব্যাপার আছে।

—অনেক দিন, তোর গল্প দেখছি না কেন রে ?

—দিয়ে রেখেছি দু'টো। ছাপা হচ্ছে না। নিরঞ্জনদা ছাপবেন না।

—কেন রে ?

—আসলে নিজের ব্যবসা নিয়ে এমন ব্যস্ত উনি, গল্প পড়ার সময়ই পান না।

—নিরঞ্জনদা ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত ? কিসের ব্যবসা ?

—জানেন না ? বেনামে পাবলিশিং হাউস খুলেছেন নিরঞ্জনদা। কলেজ স্ট্রিটে ঘর ভাড়া নিয়ে। সারাটা দিন উনি ওখানেই কাটান। বিকেলের দিকে এখানে আসেন। খুব ভাল চলছে ওনার আলি প্রকাশনী।

—নিরঞ্জনদাকে দেখতে তো এ রকম ধান্ধাবাজ লোক বলে মনে হয় না ?

সুকান্তর মুখটা আরও ম্লান হয়ে গেল। তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, "অয়নদা আপনাদের এই বাড়িটা আজব জায়গা। নিরঞ্জনদার খুব রাগ আনন্দবাজারের ওপর। প্রথম জীবনে নাকি ওনার একটা গল্প রিজেক্টেড হয়েছিল আনন্দবাজারে। সেই থেকে আনন্দবাজার গোষ্ঠীর সাহিত্যিকদের উনি দেখতে পারেন না। এখানে পাল্টা গোষ্ঠী করেছেন। তাদেরই আড্ডা বসে রোজ ওর প্রকাশনীতে....

—সে তো বুঝলাম, তোর উপর রাগ হল কেন ?

—মাস ছয়েক আগে বাগনানে আমরা, লিটল ম্যাগাজিনের লোকেরা... সংবর্ধনা দিয়েছিলাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে। সেখানে সুনীলদার প্রশংসা করে আমি দু'চারটে কথা বলি। সেটা কেউ বোধহয় কানে তুলে দিয়েছে নিরঞ্জনদার। তারপর থেকেই আমার উপর রাগ। তারপর পাবলিশিং হাউস খোলার সময় উনি আমাকে বলেছিলেন, আমাদের ব্যাঙ্ক থেকে কিছু লোন পাইয়ে দিতে। সেটা আমি করতে পারিনি। তারপরই আমার উপর রাগটা বেড়ে যায়।

—রবিবারের পাতায় তা হলে এখন গল্প বাছছে কে ?

—সুনীতা বলে মেয়েটা। নিরঞ্জনদা ওর ওপরই সব ভার দিয়ে রেখেছেন। মেয়েটার লিটারারি কোনও সেন্স নেই। যে সব গল্প ছাপা হচ্ছে, পড়া যায় না। আগে লোকে খুব পড়ত। তার টের পেতাম, আড্ডায় গেলে। এখন কেউ আলোচনাই করে না দৈনিক প্রভাতের কোনও গল্প নিয়ে। পাতাটাকে শেষ করে দিলেন নিরঞ্জনদা। অয়নদা, আপনার গল্পও তো অনেকদিন দেখছি না। সময় পাচ্ছেন না বুঝি ? আপনারা এত ব্যস্ত থাকেন....। সেদিন দেখা হল আবুল বাশারের সঙ্গে। বইমেলায়। উনি খুব প্রশংসা করছিলেন আপনার সম্পর্কে।

নিজের প্রশংসা শুনতে কার না ভাল লাগে ? তবু প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে বললাম,

"সুকান্ত, পরে একবার দেখা করিস। লিখে যা, ভাল লিখতে পারলে, কেউ তোকে আটকাতে পারবে না।"

পরমাকে নিয়ে যখন গাড়িতে উঠলাম, তখন প্রায় সাতটা। মারুতি নিয়ে বড় রাস্তায় উঠতেই পরমা বলল, "সত্যিই খবরের কাগজের অফিস একটা আজব জায়গা। সুকান্ত ছেলেটার জন্য খুব খারাপ লাগছে। ওর মুখটা দেখলেই মনে হয়, খুব ট্যালেন্টেড। অথচ দেখো, পলিটিকসের শিকার হয়ে বেচারি, সুযোগই পাচ্ছে না।"

—ছেলেটা বাংলায় এম এ। ফাস্ট ক্লাস ফার্স্ট। প্রবন্ধ লিখে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পেয়েছে। ওকে নিয়ে আমি একটা কড়চা লিখেছিলাম।

পার্ক স্ট্রিটে গাড়ি ঢোকাতেই, পরমা বলল, "এই, আজ কোনও রেস্তোরাঁয় ঢুকব না। বাড়ি চলো। কাল তোমাকে খাওয়াতে পারেনি মা। আজ সকালে খুব আপসোস করছিল। দিব্যেন্দু কাকু আজ আসতে পারে। সোজা লেক গার্ডেন্স চলো। তোমার সঙ্গে দেখাও হতে পারে।"

দিব্যেন্দু চ্যাটার্জির নামটা শুনে আমি আবার সাংবাদিক অয়ন হয়ে গেলাম। ভদ্রলোকের সঙ্গে মাত্র একবারই সামান্য কিছু কথা হয়েছে নার্সিংহোমে। ঘরোয়া পরিবেশে বসার সুযোগ পেলে, আরও কাছে যাওয়া যাবে। দিব্যেন্দু চ্যাটার্জির কথা অবশ্য অফিসে অনেকেই জানে না। জানতে পারলে অনেকেই দৌড়োদৌড়ি শুরু করে দেবে। তার আগে, ভদ্রলোককে ব্রিফ করে দেওয়া দরকার। বালিগঞ্জ প্লেসে বিরাট বাড়ি অথচ দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি যে ক'দিন কলকাতায় থাকেন, ওঠেন গ্র্যান্ড হোটেলে। বড়লোকের কত রকম খেয়াল!

—রমা, চুপ করে আছ, কী ব্যাপার।

—তোমাদের অফিসে পরপর দু'দিন গেলাম। একটা কথা মাথায় ঘুরছে কাল থেকে।

—কী সেটা?

—বসে না থেকে কিছু করব। ভাবছি, কাল থেকে বাবার অফিসে গিয়েই বসব। বাবা অনেকদিন ধরে বলছে। নিজেকে ব্যস্ত রাখা দরকার।

—খুব ভাল কথা।

—তোমার কোনও আপত্তি নেই তো অয়ন?

—আপত্তি! আমি খুব খুশি হব। আমার বিশ্বাস, তুমি খুব ভাল করবে বিজনেসে।

BOIRBOI.NET

—কিন্তু তোমাকে সময় দিতে পারব? বিজনেসটা এক ধরনের নেশা অয়ন। বাবাকে তো দেখেছি। মা-কে একটা সময় খুব ইগনোর করেছে।

—রমা, যাই করো, আমাকে কোনওদিন ইগনোর কোরো না। তুমি ছাড়া, জীবনে আর কোনও মেয়ের সংস্পর্শেই আমি আসিনি। বড়দার বিয়ের দিন, তোমাকে দেখে আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম, যদি কোনওদিন কাউকে লাইফের পার্টনার করি, তা হলে তুমি।

পরমা আমার দিকে একটু সরে এসে কাঁধে মাথা রেখে, নিশ্চিন্তে বলল, "সে কথা আমি জানি অয়ন।"

শুনে মনে মনে হাসলাম। লোকে কত কথাই না ফেস ভ্যালুতে নেয়। বিশ্বাস

করে !

লেক গার্ডেন্সে পৌঁছে দেখলাম, বাড়ির বাইরে সাদা রঙের একটা ওপেলল গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি আছেন। লোহার গেট সরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল, লনে বসে আছেন দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি এবং পরমার বাবা।। ওঁরা প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠলেন, "এখানে এসো অয়ন।"

পরমা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে বলল, "আন্টি আসেনি ?

দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি বললেন, "এসেছে। এখন কিচেনে। আমাদের আজ কীসী একটা যেন খাওয়াবে। পরমা, রান্না করা খাবারটা কিন্তু প্রথমে তুই টেস্ট করবি। তুই সার্টিফিকেট দিলে, তবে আমরা খাব।"

পরমার বাবা আমাকে বললেন, "তুমি বসো অয়ন। ছবি তোলা হল রমার ? দুপুর থেকেই ও খুব এক্সাইটেড ছিল।"

পরমা চোখ পাকিয়ে বলল, "বাবা। তুমি কিন্তু এ নিয়ে আর একটা কথাও বলবে না।"

—কেন, এক্সাইটেড তো ছিলিই। পঁচিশটা শাড়ি বের করে, বারবার এসে বলছিলি, দেখো তো, কোনটা পরলে আমাকে ভাল লাগবে ?'

পরমা কৃত্রিম রাগে বলল, "যাও। সব ফাঁস করে দিলে। আমি আর এখানে থাকবই না।" কথাটা বলে ও বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল।

সামনে একটা সেন্টার টেবল। তাতে স্কচ হুইস্কির একটা বটল। কয়েকটাটা গ্লাস। একটা ক্যাসারোল। তাতে আইস কিউব। দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি একটা গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে বললেন, "ডু ইউ ড্রিঙ্ক, অয়ন ?"

হঠাৎ এই প্রশ্নে অবাক হয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি বললাম, "না।"

—ছ'সাত বছর জার্নালিজম করছ, অথচ ড্রিঙ্ক করো না। অদ্ভুত তো।

আমি তখনই সাংবাদিক অয়ন হয়ে গেলাম। বললাম, "রমা পছন্দ করে না।"

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি। তারপর পরমার বাবাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "দ্যাখ নিখিলেশ, আজকালকার ছেলেদের অবস্থা দ্যাখ। জরু না পেতেই গোলাম হয়ে গেছে। মাই গড, ভাবতেও পারি না।"

পরমার বাবা গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন, "সবাই কী আর তোর মতো ?"

—ডোন্ট সে লাইক দ্যাট নিখিলেশ।

গ্লাসের হুইস্কিতে চুমুক দিলেন দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি। তারপর আমার দিকেক তাকিয়ে বললেন, "অয়ন, সমীরণের সঙ্গে তোমার কথা হল ?

—হ্যাঁ।

—আমি ওকে বলে দিয়েছি, তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। ও-ই আমার রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে কাজ করবে। ও কি বলেছে, একটা ইভনিং ডেইলি আমরা বের করছি ?

—উনি বলেননি। কিন্তু আমি শুনেছি।

—আই সি। ইভনিং ডেইলি চলবে, তোমার কী মনে হয় ?

—এই কালচারটা আমাদের এখানে এখনও গ্রো করেনি। তবে কাগজটাটা সে রকম করলে, নিশ্চয়ই চলবে।

—কাগজটার এনটায়ার দায়িত্ব যদি তোমাকে দেওয়া হয়, তুমি চালাতে পারবে ?

প্রস্তাবটা শুনে সারা শরীরে একটা ঝাঁকুনি খেলাম। দ্রুত সামলে নিয়ে বললাম, "অফ কোর্স চালাতে পারব। তবে পুরো একটা আলাদা সেট আপ আমাকে দিতে হবে।"

দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি বললেন, "তোমাকে দু'দিন সময় দিচ্ছি। তুমি কী চাও, আমাকে জানাও। এত বড় একটা ব্রেক তুমি পাচ্ছ। আশা করি, আমাকে ডোবাবে না।'

—অফ কোর্স নট।

—তুমি বিদেশি কিছু ইভনিং ডেইলি ঘাঁটাঘাঁটি করো। সমীরণকে বলে দিচ্ছি, সাবস্ক্রাইব করতে। তা হলে কিছু আন্দাজ পাবে। এখনও কিছুদিন সময় আছে। ঝাঁপিয়ে পড়ো। তোমার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছি। তুমি পারবে।

তারপরই পরমার বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "নিখিলেশ, তুই এদের চার হাত এক করে দিচ্ছিস না কেন ?

—এইবার দেব। আমি ভেবেছিলাম, এক রকম। হল অন্য রকম। আমার এত বড় বিজনেসটা কে চালাবে বল তো ?

—কেন পরমা ?

—ও তো কোনও ইন্টারেস্টই নেয় না।

আমি বললাম, "এইবার নেবে মেসোমশাই। আজই ওকে বুঝিয়েছি। সম্ভবত দু'একদিনের মধ্যেই ও আপনার অফিসে গিয়ে বসবে।"

—ও কথা বলল ? দ্যাটস গ্রেট। আমি তো এতদিন বুঝিয়ে বুঝিয়ে পারিনি।

দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি বলেন, "এবার তুমি ভেতরে যাও অয়ন। আর তোমাকে আটকে রাখব না।

... পরমাদের বাড়িতে ডিনার সেরে যখন ফিরে এলাম, রাত তখন সাড়ে দশটা। খুব সুন্দর কাটল আজ দিনটা। বিশেষ করে, সন্ধেটা। বাইরে থেকে খুব রাশভারি মনে হলেও, দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি কিন্তু খুব হুল্লোড়বাজ লোক। ডিনার টেবল মাতিয়ে রাখলেন নানা ধরনের জোকস বলে। বোস্টনে ওনার বিরাট ব্যবসাটা। সেটা দেখাশুনা করেন ওনার একমাত্র ছেলে। আমেরিকান সিটিজেন। ভারতে আসার নাকি তার কোনও ইচ্ছে নেই। ছেলের প্রসঙ্গে কথা বলার সময় দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি মাঝেমধ্যেই আবেগপ্রবণ হয়ে উঠছিলেন।

রাতে শুতে যাওয়ার সময়, হঠাৎই মনে পড়ল ঈশিতার সেই চিঠিটার কথা। সঙ্গে সঙ্গে জামার পকেট থেকে বের করে আনলাম। খাম খুলে দেখি। এক পাতার চিঠি। ছেড়া অংশগুলো সাবধানে জোড়া। পড়তে শুরু করলাম। "ডিয়ার কু, তোমার চিঠিটা এইমাত্র পড়লাম। কাল রাতের এক্সপিরিয়েন্স তুমি ডিটেল লিখেছ। পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল, এজাকুলেশন হয়ে যাবে। আমার শরীরের গোপন যে অংশটা তুমি সবথেকে পছন্দ করো, চিঠিটা সেখানে একবার টাচ করলাম...

মাই গড়, এ কী ধরনের চিঠি ! লাইনগুলোয় চোখ বোলাতে বোলাতে ঘেন্না পেল। কদর্য ভাষায় যৌনানুভূতির বিশদ বর্ণনা। তাও মহিলার লেখা ! দ্রুত লেখিকার নাম দেখলাম—'ইতি, তোমার পা।' পড়া শেষ করে আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে ছিলাম। কোনও সুস্থ মহিলার পক্ষে যে এই ধরনের নোংরা চিঠি লেখা সম্ভব, তা

আমার ধারণায় ছিল না। কু-এর সঙ্গে পা, কাল রাতে অবাধ যৌনাচার করেছে। সেই অনুভূতি পরস্পরকে চিঠি লিখে জানাচ্ছে। পারভার্সন ছাড়া আর কিছু নয়। পড়ে সত্যিই খারাপ লাগল। কু লোকটাকে না হয় বোঝা গেল। চিঠিটা যার ঘর থেকে পাওয়া গেছে—সেই কুণাল। কিন্তু পা মহিলাটি কে? জানা দরকার।

ঈশিতা এখনও অফিসে নাইট ডিউটি করছে। মেকাপ রুমে ফোন করতেই এসে ধরল। বললাম, "অয়নদা বলছি। চিঠিটা পড়লাম।"

ফিসফিস করে ঈশিতা বলল, "ল্যাঙ্গুয়েজ দেখেছেন?"

—হ্যাঁ। পর্নোগ্রাফি। কিন্তু মেয়েটা কে?

—পারমিতা চাকলাদার।

নামটা বলেই ঈশিতা ভয় পাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, "এখন ছাড়ছি অয়নদা। আমি পেজ মেকাপে ব্যস্ত। কাল সকালে কথা বলব।"

কর্ডলেস সুইচ অফ করে টেবলে রাখার পরই পারমিতার মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। ওই রকম নিষ্পাপ মুখ। আর তার মধ্যে এত বিষ!

॥ তেরো ॥

বেলা আড়াইটে-তিনটে নাগাদ, লরি করে নিউজ প্রিন্টের বড় বড় রীল আসে অফিসে। সেই সময় গলি দিয়ে বড় রাস্তায় বেরনো খুব কঠিন হয়ে যায়। রীল নামানোর জন্য লরি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে গলির মধ্যে। উল্টো দিক দিয়ে, অন্য কোনও গাড়ি এলেই রাস্তা জ্যাম। পারতপক্ষে, এই সময়টায় অফিসের গলিতে, আমি মারুতি নিয়ে ঢুকতে চাই না। ঢুকলেই আটকে যেতে হয়। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়। বেলা সাড়ে চারটের সময় অফিসে গিয়েও আমি আজ ফেঁসে গেলাম।

চিটচেটে বোদ্দুর। গলির মুখে গাড়িতে বসে ঘামছি। সামনে রিকশা, ম্যাটাডোর, কয়েকটা মারুতি-অ্যাম্বাসাডর এমনভাবে দাঁড়িয়ে, নড়াচড়ার কোনও সম্ভবনা নেই। এই গলিটার দু'পাশে প্রচুর দোকান। সারাক্ষণই লোকজনের ভিড়। এখানে কর্তারা কেন দৈনিক প্রভাতের অফিস করতে গেলেন, ভগবানই জানেন। আশপাশে তাকাতেই নজরে পড়ল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সুশান্তকে। হাত নেড়ে ডেকে বললাম, "কী হয়েছে রে ওদিকে? এত জ্যাম?"

—আপনি শোনেননি অয়নদা? দুপুরের খবরে রেডিওতে তো বলেছে।

—কী রে?

—নিরঞ্জনদা মারা গেছেন। কাল রাতে। স্ট্রোক হয়েছিল। ডেডবডিটা এনেছে অফিসে, দু'নম্বর ইউনিয়নের লোকেরা। ফুল-টুল দিচ্ছে। এখুনি জ্যাম কেটে যাবে।

নিরঞ্জনদা মারা গেছেন! শুনে খুব খারাপ লাগল। এই ক'দিন আগে সুকান্ত খুব নিন্দে করছিল লোকটার। আর এখন উনি সব নিন্দা-প্রশংসার ঊর্ধ্বে।

নিরঞ্জনদা আমাকে খুবই ভালবাসতেন। মাঝেমধ্যে রবিবারের পাতায় লেখাতেন। ওকে শেষ শ্রদ্ধাটা জানানো দরকার। কথাটা মনে হতেই গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। সুশান্ত গ্রান্ড স্ট্রিটের দিকে পা বাড়াচ্ছে দেখে, জিজ্ঞেস করলাম, "নিরঞ্জনদার

BOIRBOI.NET

বডির সঙ্গে তুই বার্নিং ঘাটে যাবি না ?"

—না গো। ইদানীং উনি আমার ইউনিয়নে ছিলেন না। দু'তিন বছর আগে, উনি একবার কো অপারেটিভ থেকে লোন চেয়েছিলেন। বেশ মোটা টাকার। দিইনি। সেজন্য রাগ করে, দু'নম্বরে গেলেন।

সুশান্ত পুব দিকে পা বাড়াল। ওর কথা শুনে, ভাল লাগল না। এত রাগ, এত অভিমান—এ সবের দরকার আছে ? আর কয়েক ঘণ্টা পরেই তো নিরঞ্জনদা লোকটার কোনও অস্তিত্বই থাকবে না পৃথিবীতে। হাঁটতে হাঁটতে এলাম অফিসের গেটে। কাচের গাড়িতে ডেডবডি ফুলে ফুলে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। ঔপন্যাসিক হিসাবে নাম ছিল নিরঞ্জনদার। দু'একটা পুরস্কার পেয়েছেন। ওর কাছে রোজ যাতায়াত করত, এমন কিছু পরিচিত মুখ চোখে পড়ল আশপাশে। গেটের সিঁড়িতে বসে আছে সুনীতা বলে মেয়েটা। মুখ চোখ ফোলা, দেখে মনে হল, কান্নাকাটি করেছে। স্বাভাবিক।

টিভি-র লোকজন ছবি তুলছে। বোধহয় খবরের সঙ্গে দেখাবে। নামী ও তরুণ সাহিত্যিকদের ইন্টারভিউ নিচ্ছে প্রতীপ রায়। ছেলেটাকে আমি চিনি। বেহালার দিকে থাকে। টিভি-তে একবার আমাকে দিয়ে প্রোগ্রাম করিয়েছিল বেহালার সেই ভেজাল তেলের ঘটনার সময়। ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুকান্ত। পরনে সেই একই পঞ্জাবি। উস্কো-খুস্কো চুল, না-কামানো দাঁড়ি। ওকে দেখে প্রতীপ মাইক্রোফোনটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "সুকান্তবাবু, আপনি কিছু বলুন নিরঞ্জনবাবুর সম্পর্কে।"

সুকান্ত বলল, "আমার কিছু বলার নেই। বাংলা সাহিত্যের বিরাট এক ব্যক্তিত্ব আজ চলে গেলেন। আমরা তাঁর অনুগামী। ভাবশিষ্য। ওঁর পায়ের তলায় বসে লেখা শিখেছি। ওর মূল্যায়ণ করার যোগ্যতা আমাদের নেই। তবে কল্লোল যুগের পর এত তীক্ষ্ণ কলম নিয়ে, সমরেশ, সুনীল, শীর্ষেন্দু আর মতি নন্দী ছাড়া আর কেউ জন্মাননি। এমন নিঃস্বার্থ লোক আমি খুব কমই দেখেছি।"

দূর থেকে সুকান্তর কথাগুলো শুনে মনে মনে আমি হাসলাম। বাইরে থেকে দেখলে লোককে বোঝা যায় না। এই সুকান্ত ছেলেটা এমন মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করে যাচ্ছে নিরঞ্জনদার। অথচ কয়েকদিন আগেই আমাকে বলেছিল, 'লোকটা বেসিক্যালি ধান্দাবাজ। কিছু না দিলে, কারও জন্য কিছু করে না।' কথাটা মনে পড়তেই মনে মনে বললাম, 'বাহ, সুকান্ত, অয়ন ব্যানার্জির লাইনেই এগোচ্ছিস'। কাচের গাড়ি ঘিরে দু'নম্বর ইউনিয়নের লোকজন খুব ব্যস্ত। ওদেরই কে একজন হঠাৎ এসে খবর দিল, এডুকেশন মিনিস্টার মিটিংয়ে রয়েছে। এখানে আসবেন না। উনি ফুল দিতে যাবেন কেওড়াতলায়। সঙ্গে সঙ্গে ভিড় পাতলা হতে শুরু করল। গাড়ি স্টার্ট নিল কেওড়াতলার দিকে।

মারুতি পার্ক করে, রিসেপশনে ঢুকতেই অঞ্জলি বলল, "অয়নদা, এক ভদ্রলোক আপনার জন্য অনেকক্ষণ বসে রয়েছেন।"

—কে বল তো ?

—বলেই চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিলাম। কোণের দিকে সোফায় বসে হাতকাটা নীলু। ডান দিকে পাঞ্জাবির হাতটা ঢলঢল করছি। উঠে এসে নীলু খুব বিনয়ের সঙ্গে

বলল, "অয়নদা, আমাকে ডেকেছিলেন ?"

সঙ্গে সঙ্গে বাদশার কথা মনে পড়ে গেল। এখানে সবার সামনে কথা বলা যাবে না। নীলুকে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া দরকার। বললাম, "চলো, ক্যান্টিনে গিয়ে বসি। কথা আছে।"

অফিসের ক্যান্টিনটা দেড়তলায়। লাঞ্চ পাওয়া যায়। যাদের ডিউটি সকালের দিকে, ক্যান্টিনেই কম পয়সায় তারা লাঞ্চ সেরে নেয়। পি বি এক্সের একজন অপারেটর আছে—রুমা। আমাকে ক্যান্টিনে ঢুকতে দেখেই বলল, "অয়নদা, পরমা চ্যাটার্জি নামে একজন আপনাকে ফোন করেছিলেন। বার তিনেক। আপনাকে যোগাযোগ করেত বলেছেন।"

শুনে ঘাড় নাড়লাম। বেলা এগারোটায় ফোন করেছিল বাড়িতে। তখনই জিজ্ঞেস করে নিয়েছিল, সারাদিনে আমার কী কাজ। ওকে বলেছিলাম, বেলা চারটের মধ্যে অফিসে পৌঁছে যাব। পাঁচটার সময় মিটিং আছে আমার সমীরণবাবুর সঙ্গে। রিডার্স মিট নিয়ে। সন্ধে ছ'টা নাগাদ বেরিয়ে যাব অফিস থেকে। ইস্টার্ন বাইপাসে নতুন একটা হোটেল হয়েছে—সাবরমতী। সেখানে আজ ডিনার খাওয়াব নির্মলকে। সাড়ে আটটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ব হোটেল থেকে। লেক গার্ডেন্সে যেতে হবে। পরমার মা আর বাবা দিল্লি গেছেন দু'দিনের জন্য। বাড়িতে ও এখন একা। ওর সঙ্গে আড্ডা মেরে বাড়ি ফিরব দশটা-সাড়ে দশটার সময়। মোটামুটি এই আমার প্রোগ্রাম।

ক্যান্টিনে এই সময়টায় ভিড় থাকে না। দু'চারজন এদিক ওদিক বসে। এক কোণে নীলুকে নিয়ে বসে, বাদশার কথা সব খুলে বললাম। ও প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়েছে শুনে নীলু বলল, "ছেলেটা ডেঞ্জারাস। ওর মাথাটা খুব শার্প। এই কারণে এখনও তাড়াতে পারিনি এন্টালি থেকে। তবে আপনি কিছু ভাববেন না অয়নদা। আমি দেখছি।"

—পুলিশকে কিছু জানাব ?

—এখনই দরকার নেই। আমার উপর ছেড়ে দিন। আমার এক চামচা ওর দলে ভিড়ে আছে। সে-ই ওর সব খবর আমাকে দেয়। ও যদি সত্যিই আপনার কোনও ক্ষতি করতে চায়, তা হলে আমি জানতে পারব।

আরও মিনিট পাঁচেক কথা বলে নীলু বেরিয়ে গেল। আমিও উঠতে যাচ্ছি, হঠাৎ একটা মেয়ের দিকে চোখ গেল। উল্টো দিকে, কোণের একটা টেবলে বসে স্যান্ডউইচ খাচ্ছে। রাখী না ? ভাল করে নজর দিতেই বুঝলাম, না মেয়েটা রাখী না। তবে একই রকম দেখতে। মাই গড, এমন সিমিলিয়ারিটি হয় দু'টো মানুষে ! রাখীর কথা মনে হতে, চোখের সামনে ভেসে উঠল সুধাময়দার চেহারাটা। সাংবাদিক হওয়ার ইচ্ছে, প্রথম আমার জাগে সুধাময়দাকে দেখেই। ওনাকে প্রথম দেখি, সেন্ট জেভিয়াস কলেজের ফাংশানে। সেদিন উনি গেস্ট স্পিকার ছিলেন। ওই রকম স্মার্ট লোক তার আগে, কখনও আমার চোখে পড়েনি। সুধাময়দা তখন আনন্দবাজারের স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট। প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হয়ে সদ্য ঘুরে এসেছেন অমেরিকা থেকে। এমার্জেন্সির সময়, বিতর্কিত লেখা লিখে বেশ কিছুদিন জেলে ছিলেন সুধাময়দা। তখন থেকেই খুব জনপ্রিয়। বাবা আর বড়দাকে, প্রায়ই দেখতাম, তর্ক করছেন সুধাময়দার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ নিয়ে। কলেজের ফাংশানে ওই রকম একটা লোককে

দেখে, সত্যি বলতে কী, সেদিন আমি মোহিত হয়ে গেছিলাম।

ফাংশান শেষ হয়ে যাওয়ার পর কলেজের স্টুডেন্টস ইউনিয়নের নেতা শ্যামলেন্দু এসে বলেছিল, "এই অয়ন, মিঃ দাশগুপ্তর স্পিচটা তো তুই শুনেছিস। লিখে ফেলতে পারবি ? আমরা কলেজের ম্যাগাজিনে ছাপব।"

বলেছিলাম, "হ্যাঁ, কেন পারব না ?"

পরদিনই পুরো বক্তৃতটা লিখে ফেলেছিলাম। কলেজে সেটা দেখে শ্যামলেন্দু বলেছিল, "চল, সুধাময় দাশগুপ্তর বাড়িতে যাব। ওর একটা পার্মিশন নেওয়া দরকার ছাপানোর আগে।"

তিন চারদিন পর আমরা দু'জন গিয়েছিলাম সুধাময় দাশগুপ্তর বাড়ি। পার্ক স্ট্রিটের কুইন্স ম্যানসনে। তখন সকাল দশটা-সাড়ে দশটা। স্লিপিং গাউন পরে সোফায় বসে কাগজ পড়ছিলেন উনি। শ্যামলেন্দুকে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন, "এসো, এসো। তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম এতক্ষণ।'

শ্যামলেন্দু বোধহয় ফোনে কথা বলে রেখেছিল। সোফায় বসে সঙ্গে সঙ্গে ও লেখাটা এগিয়ে দিয়েছিল। মিনিট দশেক ধরে মন দিয়ে পড়ে সুধাময় বলেছিলেন, "কে লিখেছে এটা ?"

শ্যামলেন্দু আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিল। আমি খুব কুণ্ঠিত হয়ে বলেছিলাম, "কোথাও ভুল হয়েছে স্যার ?"

—তুমি কি শর্ট হ্যান্ডে নোট নিয়েছিলে ?

—না। মন দিয়ে শুনেছিলাম।

—ওয়ান্ডারফুল। ইন টোটো লিখেছ। ভাবাই যায় না। একটা শব্দ পর্যন্ত বাদ পড়েনি। তোমার মেমারির-র প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না। বাই দ্য বাই, তোমার নাম কী ভাই ?

নামটা বলার পরেই সুধাময়দা আমার সঙ্গে গল্প শুরু করেছিলেন। আমার সম্পর্কে সব কিছু জানার পর হঠাৎই উনি বললেন, "কলেজ থেকে বেরিয়ে তুমি কী করতে চাও ?"

—এম এ।

—তারপর ?

—বাবা আমেরিকায় পাঠাতে চান।

—তুমি জানালিজম করবে ? আমি চাই, তোমাদের মতো ছেলেরা এই প্রফেশনে আসুক।

—কিন্তু প্রফেশন সম্পর্কে আমার তো কোনও ধারণাই নেই স্যার।

—সেটা বড় ব্যাপার নয়। ধারণা হয়ে যাবে। আমি কালই উগান্ডায় যাচ্ছি ফরেন মিনিস্টারের সঙ্গে। ফিরব লন্ডন হয়ে নেক্সট উইকে। তুমি একবার আমার সঙ্গে দেখা করবে তখন।

—ঠিক আছে স্যার।

—স্যার নয়, বলো সুধাময়দা।

বলেই উনি উঠে গেছিলেন পাশের ঘরে। ফিরে এলেন হাতে একটা বই নিয়ে। তারপর সেই বইয়ে নামটা লিখে, এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "এটা রিসেন্টলি বের

BOIRBOI.NET

করেছে এন বি টি। আমার লেখা বই। ইন্দিরা গান্ধীকে যেমন আমি দেখেছি।

বইটা হাতে নিয়ে বলেছিলাম, 'থ্যাঙ্কস।"

ঠিক ওই দিনই আমার মনে সাংবাদিক হওয়ার ইচ্ছেটা গেঁথে দেন সুধাময়দা। ঘণ্টা দুয়েক ছিলাম ওনার সঙ্গে। তার মধ্যেই সাংবাদিকতা নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন। সব ইন্টারেস্টিং ঘটনা। কথা বলার মাঝেই হাজির হয়েছিল চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সী একটা মেয়ে। সুধাময়দা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, "এ আমার মেয়ে রাখী। লরোটোতে পড়ে।"

... কলেজ জীবনে বহুবার গেছি সুধাময়দার বাড়িতে। যাওয়াটা কমে যায় ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়। উনি কিন্তু মাঝেমধ্যেই মনে করিয়ে দিতেন, "জার্নালিজম করার জন্য তৈরি হও।' আনন্দবাজারে আমার কয়েকটা লেখাও উনি ছাপিয়ে ছিলেন সেই সময়। আমার প্রচণ্ড উৎসাহ বেড়ে গিয়েছিল তাতে। কিন্তু ঠিক ওই সময়টায় পরমা এসে গেছে আমার জীবনে। ও বারবার নিরুৎসাহিত করেছে, 'ও সব ফালতু প্রফেশনে তুমি যাবে না।"

দৈনিক প্রভাতে জয়েন করার পর একবার কুইন্স ম্যানসনে গিয়েছিলাম সুধাময়দাকে সুখবরটা দেওয়ার জন্য। কলিং বেল টিপতেই দেখি, অপরিচিত এক মহিলা দরজা খুলে দিলেন। সুধাময়দার কথা তুলতেই ভদ্রমহিলা বললেন, "উনি তো রিটায়ার করে গেছেন। এই ফ্ল্যাটটা আনন্দবাজারের। আমার স্বামী ওখানকার অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর। এখন আমরাই এখানে থাকি।"

—সুধাময়দারা কোথায় গেছেন বলতে পারেন ?

—ঠিক জানি না। শুনেছি, বেহালা চৌরাস্তার দিকে। হয়তো আমার স্বামী বলতে পারবেন।

শুনে মনটা সেদিন খুব খারাপ হয়ে গেছিল। আনন্দবাজারের সুধাংশুদা তখন আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন বড়দার কাছে। বোধহয় সম্পর্ক ভাল ছিল না সুধাময়দার সঙ্গে। সুধাংশুদাও ঠিকানাটা বলতে পারেনি। বহুদিন পর, রাখীর সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে যায় ওয়ালডর্ফে। বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে ডিনার খাচ্ছিল। সুধাময়দা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় বলেছিল, "বাবা দিল্লি চলে গেছে আমার অন্য মায়ের কাছে।" বলেই হি হি করে হেসে উঠেছিল। বলার ভঙ্গি দেখেই বুঝেছিলাম, ও ড্রিঙ্ক করেছে।

BOIRBOI.NET

—অন্য মা মানে ?

—ভদ্রলোক জার্নালিজম করার নামে, বছরের অর্ধেকটা সময় থাকতেন দিল্লিতে। ওনার জীবনে তখনই আমার অন্য মা এসে যায়। হি হি হি .... আমরা কিছুই জানতাম না। উনি রিটায়ার করার পর ... জানতে পারলাম, আমার আরও একটা মা আর বোন আছে।

—তারপর ?

—আর কী, আমার কলকাতার মাতৃদেবী সুইসাইড করলেন। আমিও জীবনটাকে এনজয় করছি এখন। দ্য এন্ড।

সুধাময়দার সঙ্গে তারপর আর কখনও দেখা হয়নি। মাঝে একবার ইলেকশনের সময়, টিভি-তে দেখেছিলাম। রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করছিলেন। উনি

হয়তো জানেনও না, আমি একই প্রফেশনে রয়েছি। মনে খুব ইচ্ছে, কোনওদিন দিল্লি গেলে, সুধাময়দাকে খুঁজে বের করবই। ওঁর কাছে গিয়ে বলব, "দেখুন সুধাময়দা আপনি যা চেয়েছিলেন, তাই হয়েছি।"

.... রাখীর মতো দেখতে মেয়েটা, খাওয়া-দাওয়া করে ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে গেল। কোন ডিপার্টমেন্টে কাজ করে জানি না।

কাগজ হাত বদল হওয়ার পর অনেক নতুন কর্মী এসেছে। অনেককেই চিনি না। বিশেষ করে, মার্কেটিং আর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের কর্মীদের। কিছু মেয়েকেও নেওয়া হয়েছে। এই মেয়েটা বোধহয় ওখানকারই। এতক্ষণ সুধাময়দার কথা ভাবছিলাম। লক্ষই করিনি, ক্যান্টিন ফাঁকা হয়ে গেছে।

হাত ঘড়িতে দেখলাম, প্রায় সাড়ে পাঁচটা। সমীরণবাবুর সঙ্গে আরও আধ ঘণ্টা আগে আমার দেখা করার কথা ছিল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। তিন তলায় এক দিকে রিপোর্টিং। অন্য দিকে জি এমের ঘর। নতুন করে বানানো হয়েছে। ঘরে ঢোকার আগে, দেখি করিডোর দিয়ে হেঁটে আসছে পারমিতা। অনেক দিন পর দেখলাম। পরনে স্টোন ওয়াশের লং স্কার্ট। গায়ে লেবু রঙা শার্ট তার নীচে লেবু সবুজের বাস্টিয়ার। চুল উঁচু করে বাঁধা। কাছে আসতেই দেখলাম, ঠোঁটে হালকা কমলা লালের লিপস্টিক। যেচেই বলল, "অয়নদা, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে। কয়েক মিনিট সময় দেবেন?"

মনে মনে বিপদ গুনলাম। ওর চিঠিটা আমি ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম কুণালদার বাড়ি। কুণালদার স্ত্রীর নামে। সেটা কি পারমিতা জেনে গেছে? ফালতু কথা কাটাকাটি হবে নোংরা মেয়েটার সঙ্গে। ওকে এড়াবার জন্যই বললাম, "পরে বললে হয় না? জি এম-এর সঙ্গে এখুনিই একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।"

—একটা মিনিট। শুনলাম, আপনি সান্ধ্য দৈনিকের চার্জ নিচ্ছেন। অয়নদা, আপনি আমাকে নেবেন?

—কেন, কুণালদার সঙ্গে তোমার তো খুবই হৃদ্যতা। দৈনিক প্রভাত তুমি ছাড়তে চাইছ কেন?

—ভাল লাগছে না অয়নদা। আপনি যা করতে বলবেন, করব। প্লিজ, আমাকে একটা সুযোগ দিন। কুণালদাটা একটা বাস্টার্ড। আমাকে এখন চিনতেই পারে না। এমন ট্রাবল দিচ্ছে, যাতে চাকরি ছেড়ে চলে যাই।

মনে মনে হাসলাম। এটাও কুণালের চাল নাকি? হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। হয়তো চিঠি পাওয়ার পর কুণালের বউ ওকে চাপ দিচ্ছে। তাই পারমিতাকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে চায়। সম্ভব, জগতে সবই সম্ভব। স্বার্থ ফুরিয়ে গেলে লোকে অমানুষ হয়ে যেতে পারে। সান্ধ্য দৈনিকের জন্য আমার গোটা ছয়েক রিপোর্টার আর সাব এডিটর দরকার। তিনজনকে ইন্টারভিউ মারফত নিয়েছি। এ ছাড়া তিনতলা থেকে এনেছি সৌমিত্র আর কিংশুককে। এঁদের সঙ্গে কুণালের সম্পর্ক আদায় কাচকলায়। এখনও একজন ইচ্ছে করলে নিতে পারি। তবে অবশ্যই পারমিতা নয়। মেয়েটা চিঠিতে যে সব কথা লিখেছিল, তাতে ওর সম্পর্কে ঘেন্নাই রয়েছে আমার মনে।

পারমিতা উৎসুক চোখে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। ঠোঁট দুটো ফাঁক করা।

BOIRBOI.NET

ওই ঠোঁট দিয়ে কুণালকে কীভাবে খুশি করেছিল, তার বিশদ বর্ণনা ছিল ওর চিঠিতে। ঘেন্না চেপে আমি এক সেকেন্ডেই সাংবাদিক অয়ন হয়ে গেলাম। বললাম, "পারমিতা, তোমার মতো মেয়ে পেলে আমি সত্যিই বর্তে যেতাম। তোমাকে বরাবরই আমি পছন্দ করি। মুশকিল হচ্ছে, কুণালদা কি তোমাকে ছাড়বেন ? উনি না ছাড়লে তো আমি নিতে পারব না।"

পারমিতা সামান্য দমে গিয়ে বলল, "সৌমিত্রদের তো আপনি নিয়েছেন অয়নদা।"

—ওদের ব্যাপারে কুণালদা কিন্তু আপত্তি করেনি।

—ও। ঠিক আছে, বলে দেখুন একবার।

—আজই বলব। সন্ধে সাতটায় তুমি থাকবে ?

—আপনি বললে থাকব। আমার এখন ছুটি হয়ে গেছে।

—তা হলে এক কাজ করো। অফিসে কথা বলা উচিত হবে না। ঠিক সাতটায় মেট্রো স্টেশনের নীচে দাঁড়িয়ে থেকো। তোমাকে তুলে নিয়ে কোথাও গিয়ে বসব। আপত্তি নেই তো ?

উজ্জ্বল হয়ে উঠল পারমিতার মুখ। বলল, "কী বলছেন অয়নদা। আমার সৌভাগ্য।"

ওর দিকে হাসিমুখে তাকালাম। মনে মনে বললাম, "ব্লাডি হোর। থাক পাতাল রেলের তলায় দাঁড়িয়ে। ওখানেই তোর আসল জায়গা।" কথাটা বলেই নব ঘুরিয়ে জি এম-এর ঘরে ঢুকে গেলাম।

আজকাল রোজই মিটিং করতে হচ্ছে সমীরণবাবুর সঙ্গে। সান্ধ্য দৈনিকের কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। মার্কেট রিসার্চ করে এমন একটা সংস্থার সঙ্গে কথা বলছিলাম। সান্ধ্য দৈনিক থেকে সাধারণ লোক কী ধরনের খবর আশা করে, তা জানার জন্য। এক সপ্তাহের মধ্যে ওরা সেই রিপোর্ট দিয়েছে। লোকে ভারী খবর পড়তে চায় না। স্পট স্টোরি চায়। মচমচে খবর। তা সেলিব্রেটিদের নিয়ে হলে, উত্তম। লোকে দেশ-বিদেশের খেলার খবর জানতেও আগ্রহী। ক্রাইম আর স্পোর্টস—আমাকে প্রাধান্য দিতেই হবে। কয়েকদিন আগে সমীরণবাবুকে বলেছিলাম, "লোকের মুখে ঝাল না খেয়ে, নিজেরাই পাঠকদের মুখোমুখি হলে কেমন হয় ? উনি তাতে খুব আগ্রহ দেখান। জেলায় জেলায় ঘুরে রিডার্স মিট করলে, পাঠকরাও উৎসাহিত হবে। তাদের গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

দৈনিক প্রভাতের সার্কুলেশন এখন প্রায় সোয়া লাখ। আমার সান্ধ্য দৈনিকের টার্গেট প্রথম মাসে পঞ্চাশ হাজার। তিনমাসের মধ্যে এক লাখ। কুমারেশ মজুমদার তা শুনে হাসতে হাসতে বলেছেন, "অসম্ভব।" আমিও সেটাকে সম্ভব করার জন্য জেদ ধরেছি। সান্ধ্য দৈনিকে এডিটর হিসাবে নাম থাকবে কুমারেশ মজুমদারের। তবে তা চালাবার পুরো দায়িত্ব আমার। কেউ নাক গলাবেন না তাতে। আমাদের জন্য আলাদা বাজেট। আলাদা সেট আপ। একটা বিরাট স্পেস খালি করে দেওয়া হয়েছে একতলায়। তাতে ইন্টেরিয়র ডেকোরেশনের কাজ চলেছে। আমার জন্য আলাদা চেম্বার হচ্ছে। দৈনিক প্রভাতের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। ঠিক করেছি, ওদের কোনও খবর আমরা যেমন নেব না, তেমন দেবও না। উল্টে আমরা এমন খবর করব, যাতে পরদিন সকালে ওরা ফলো আপ করতে বাধ্য হয়। আমার

BOIRBOI.NET

টিমের সবাইকে আমি বুঝিয়েছি, কাগজটা হল পণ্য। কোয়ালিটি ভাল করতে হবে ভাই। মার্কেটিং করার ভার আমার উপর।

গত এক মাস প্রচণ্ড খেটেছি। বিজ্ঞাপনের রেসপন্স খুব ভাল। দৈনিক প্রভাতের বিজ্ঞাপন বিভাগটা দেখে তপন মল্লিক। ওর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। আগে অফিসে আসতাম। পড়ে থাকতাম রিপোর্টিংয়ে। কাগজের অন্য বিভাগের কোনও খবরই রাখতাম না। সান্ধ্য দৈনিকের দায়িত্ব পাওয়ার পর, কাগজের ব্যবসা সম্পর্কে আগ্রহ বেড়ে গেছে। এখন সব বিভাগ নিয়েই আগ্রহ আমার। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, দৈনিক প্রভাতকে ডোবাচ্ছে সার্কুলেশনের লোক। হকারদের সঙ্গে সম্পর্ক খুব খারাপ। বিভিন্ন সেন্টারে ঠিক সময়ে কাগজটা পৌঁছয় না। হকারদের কোনও ইনসেন্টিভ দেওয়া হয় না। দৈনিক প্রভাতের সার্কুলেশন তাই কমের দিকে। এক নম্বরে আনন্দবাজার। অনেক, অনেক পিছনে ভোর। তারপর জনকণ্ঠ। চার নম্বরে দৈনিক প্রভাত। অথচ চেষ্টা করলে এই কাগজটা দু' নম্বরে উঠে আসতে পারত।

সান্ধ্য দৈনিকের বিজ্ঞাপন আনার দায়িত্ব দিয়েছি নতুন একটা ছেলের উপর। সুব্রত সেন। আগে একটা ছোট্ট এজেন্সিতে কাজ করত। তপন মল্লিকের সঙ্গে ওর সম্পর্ক আদায়-কাঁচকলায়। ও বলেছে, "নিশ্চিন্ত থাকুন অয়নদা। কাগজটা দাঁড় করানোর জন্য, আমিও লড়ব। তখন মাইনে-কড়ি যা দেওয়ার, দেবেন। তপন মল্লিককে আমি শিক্ষা দিতে চাই।" কয়েকজন ক্যাজুয়াল ছেলে নিয়েছে সুব্রত। একটা গাড়ি চব্বিশ ঘণ্টার জন্য ওদের দিয়েছি। সারাদিন ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে টো টো করে।

তিনতলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক দিন কে দিন খারাপ হচ্ছে। তাতে কিছু আসে-যায় না আমার। দৈনিক প্রভাতের ওদের, মাড়িয়ে যেতে হবে আমাকে। কাউকে পাত্তাই দিই না। দিব্যেন্দু চ্যাটার্জির সঙ্গে আমার সম্পর্ক, সবাই জেনে গেছে, অয়ন ব্যানার্জি দারুণ একটা কাগজ বের করছে।

সমীরণবাবুর সঙ্গে মিটিং শেষ করতে প্রায় সাড়ে ছ'টা বেজে গেল। ভদ্রলোক চট করে সব কিছুর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আলোচনায় ঠিক হল, ব্যারাকপুর, কল্যাণী, রানাঘাট বেল্টে আমাদের যেতে হবে। ওই অঞ্চলের এজেন্ট মারফত কথা বলতে হবে পাঠকদের সঙ্গে। সন্ধ্যার দিকে প্রচুর লোক ফিরে যায় ওই সব অঞ্চলে। ট্রেনে তাদের হাতে ধরাতেই হবে সান্ধ্য দৈনিক। সমীরণবাবু দৈনিক প্রভাতের ক্যাম্পেনটাও এক সঙ্গে সারতে চাইছিলেন। আমি আপত্তি করায় থেমে যান।

হোটেল সাবরমতীতে যখন পৌঁছলাম, তখন সোয়া সাতটা। পার্ক সার্কাস আর ইস্টার্ন বাইপাসের কানেকটরে এই হোটেলটা কিছুদিন আগে খুলেছেন গুজরাতের এক হোটেলিয়ার। লাউঞ্জে ঢুকে নির্মলকে কোথাও দেখতে পেলাম না। নিশ্চয়ই কোথাও আটকে গেছে। দরজার উল্টোদিকে একটা সোফায় গিয়ে বসলাম। নির্মল ঢুকলেই দেখতে পাব বলে। অবাঙালিদের ভিড়ই বেশি। ঢুকছে জোড়ায় জোড়ায়। পোশাক-আশাক দেখে, আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলল, এখানে আদিম ব্যবসাটাও চলে। শহরের একপাশে হোটেল। একটু আড়ালে। এখানে স্ফূর্তি করতে এলে চট করে লোকের চোখে পড়বে না।

দরজার দিকে তাকিয়ে থাকার সময় হঠাৎই চোখে পড়ল শিলাজিৎকে। সঙ্গে কৃষ্ণা বলে মেয়েটা। শিলাজিতের হাতে একটা ছোট্ট সুটকেস। দু'জন ডান দিকে ঘুরে

রিসেপশনে গেল। যাতে চোখাচোখি না হয়, সেজন্য আমি নিচু হয়ে জুতোর ফিতে খুলতে লাগলাম। শিলাজিৎকে দেখেই আমার শরীরে চিনচিনে রাগ হতে শুরু করল। বাস্টার্ড, অনিমেষের কাছে বলেছে, অনুপ ভদ্রকে দিয়ে ওর কাজটা করিয়ে দেওয়ার জন্য আমি নাকি টাকা নিয়েছি। ওকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।

—অয়নদা, মিনিট কুড়ি দেরি হয়ে গেল। হোটেলটা এমন জায়গায়, চিনতে পারিনি।

তাকিয়ে দেখি, নির্মল। শিলাজিৎরা রিসেপশনে নেই। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "আমিও এই প্রবলেমে পড়েছিলাম। যাক, কী খাবে বলো, চাইনিজ, না ইন্ডিয়ান ?

—একটা কিছু হলেই হল।

পাশাপাশি দু'টো রেস্তোরাঁ। চিনা রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকলাম। পিছনেই সুইমিং পুল। পাশে বিরাট লন। তার উপর বিরাট প্লাস্টিকের ছাদ। আলো জ্বলছে নানা রঙের। প্রথমে মনে হল, ডিস্কো ফ্লোর। পরে বুঝলাম, না, তা নয়। তবে কোনও একটা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছে। দেখেই তা মনে হল।

চেয়ারে বসে খাবারের অর্ডার দিতেই, নির্মল বলল, "অয়নদা, বলুন। কেন ডেকেছেন।"

—তোমার কাছ থেকে কিছু ইনফর্মেশন চাই।

—বলুন।

—দৈনিক প্রভাত কাগজটার কী রকম চাহিদা, বলো তো ?

—খারাপ না। অন্তত দৈনিক ভোরের থেকে ভাল।

—তবু সার্কুলেশন এত কম কেন ? লিটারেসি রেট বেড়েছে। রিডারের সংখ্যাও তো বেড়েছে আগের অনুপাতে।

—ঠিক। কিন্তু আপনাদের সার্কুলেশনের লোকেরাই তো চান না, কাগজটা আরও বেশি বিক্রি হোক।

—কী বলছ তুমি, নির্মল ?

—ঠিকই বলেছি। আপনাদের কাগজটা ঠিক সময়ে সেন্টারেই পৌঁছয় না। রোজ রোজ দেরি করে। আজই দেখুন না, হাজরা আর গড়িয়াহাট-দুটো বড় সেন্টার, সেখানে আপনাদের কাগজটা আজ ছাপা হয়ে পৌঁছল সকাল সাড়ে সাতটায়। হোয়ার অ্যাজ, আনন্দবাজার পৌঁছেছে সোয়া ছ'টায়, দৈনিক ভোর সাড়ে ছ'টায়। আর জনকণ্ঠ পৌনে সাতটায়। দৈনিক প্রভাতের জন্য আমার হকাররা আরও পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করবে কেন বলুন ? এমন নয়, আপনাদের কাগজ আনন্দবাজার। না পড়লে পেটের ভাত হজম হবে না। হাতের সামনে যে কাগজ আগে পাবে, হকাররা তা নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। বাড়ি বাড়ি অন্য কাগজ বিলি করে, তারপর শুধু দৈনিক প্রভাত নেওয়ার জন্য কোনও হকার নিশ্চয়ই দ্বিতীয়বার সেন্টারে ফিরে আসবে না।

—কিন্তু কাগজ দেরিতে ছাপা হওয়ার জন্য তো সার্কুলেশন বিভাগ দায়ী হতে পারে না।

হাসল নির্মল। তারপর বলল, "অয়নদা, আমরা দু' পুরুষের হকার। হাতিবাগানে আমার বাবার একটা স্টল ছিল। সেই স্টলে বসতে শুরু করি, যখন আমার দশ বছর বয়স। গত কুড়ি বছর ধরে এই কাজই করছি। দৈনিক ভোর একটা ফালতু কাগজ।

মাত্র চার বছর হল বেরিয়েছে। এই কাগজটাও আপনাদের মেরে বেরিয়ে গেল। চোখের সামনে তো দেখলাম। স্রেফ আপনাদের, কিছু লোকের দোষে।

—কী রকম ?

—আরে, আমাদের পাত্তাই দিত না। কাগজের দাম যখন দু' টাকা করল, তখন আমরা কথা বলতে গেছিলাম। সেই সময় এমন দুর্ব্যবহার করল, বিশ্বাস করুন, আমরা দৈনিক প্রভাত বয়কট করার কথা ভেবেছিলাম।

—যাক ভাই, আমাকে তুমি কীভাবে সাহায্য করতে পারো, বলো।

—আমার কথা শুনবেন ?

—বলো।

—দেখুন অয়নদা, আজকের সংবাদের সান্ধ্য বিক্রি হয় হাজার তিরিশ। আর জনকণ্ঠ হাজার দশেক। প্রবলেম হচ্ছে কী জানেন, বিকেলে কাগজ পড়ার অভ্যেস আমাদের কম। হকাররাও ইন্টারেস্ট নেয় না। সকালের দিকে যারা হকারি করে, তারা প্রায় সবাই, কোনও না কোনও অন্য কাজ করে। বিকেলের দিকে, ফের হকারি করার সময় বা সুযোগ তাদের হবে না। আপনি এক কাজ করুন অয়নদা, মেট্রো রেল স্টেশনে জোর দিন। শেয়ালদা আর হাওড়া দিয়ে রোজ ওই সময়টায় প্রচুর লোক কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে যায়। তাদের হাতে কাগজটা যাতে পৌঁছয়, তার ব্যবস্থা করুন। ট্রেনে পড়তে পড়তে তারা চলে যাবে। ফাইভ পার্সেন্ট এ রকম লোকও যদি ধরতে পারেন, তা হলে হাজার পঞ্চাশ সার্কুলেশন পেয়ে যাবেন। তা, দামটা কত রাখছেন আপনারা।

—এক টাকা।

—মাই গড। চলবে ভেবেছেন ?

—কেন চলবে না ? পুরো কাগজটাই কালার হবে। হাতে তুললে মনে হবে বিদেশি কাগজ। দাম বেশি হলে তো তোমাদেরও লাভ। কমিশন থার্টি পার্সেন্ট।

—তা ঠিক। তবে কী জানেন, বাঙালিদের একটা ব্যাড হ্যাবিট, সিগারেটের দাম এক টাকা বাড়লে কিছু বলবে না, ট্যাক্সি ভাড়া পাঁচ টাকা বেশি দিতে হলে মুখ বুজে থাকবে। কিন্তু কাগজের দাম পাঁচ পয়সা বাড়লেই, মুখ গোমড়া।

—দ্যাখো ভাই, ভাল জিনিস কিনতে গেলে, একটু বেশি দাম দিতে হবেই। আজকের সংবাদ-এর সান্ধ্যর দাম পঁচাত্তর পয়সা। খুচরো দেওয়া বা নেওয়ায় অনেক ঝামেলা। তার চে' একটাকার একটা কয়েন দাও-নাও। এই সিস্টেমে অনেক সুবিধা।

—তবুও বলছি, দামটা কিন্তু বেশি হয়ে গেল। যাক গেল, আপনি আমাকে ডেকেছেন কেন বলুন।

—আমার একটা প্ল্যান আছে। নির্মল, তোমাকে ভাই একটু সাহায্য করতে হবে।

—বলুন।

—আজকের সংবাদের যে ক'টা কপি সন্ধেবেলায় বেরোয়, তার এইট্টি পার্সেন্ট কিনে, তোমাকে নষ্ট করে ফেলতে হবে। ওই কাগজটা যেন লোকের হাতে না পৌঁছয়। প্রথম একটা মাস, যেন লোকের হাতে আমার কাগজই থাকে। ব্যাপারটা একটু সিক্রেট রাখতে হবে। আজকের সংবাদ ডেস্ট্রয় করার সব টাকা আমি তোমায়

দেব।

—প্ল্যানটা দারুণ সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের লাভ ?

—ইউজুয়াল কমিশন।

—মুসকিল হচ্ছে কী জানেন অয়নদা, সেন্টারে সেন্টারে ওদের লোকও ঘুরে বেড়ায়। দু' চারদিনের মধ্যেই ধরে ফেলবে, কোথায় হচ্ছে গড়বড়টা।

—সেজন্যই তো বলছি, কাজটা ট্যাক্টফুলি করতে হবে। কথা বলতে বলতে খাবার এসে গেল। দু'জনে চুপচাপ খেতে লাগলাম। নির্মল খুব একটা উৎসাহ দেখাচ্ছে না। যদি ওকে দিয়ে কাজ না হয়, তা হলে অন্য এক নির্মলকে ধরতে হবে। অমার হাতে সময় কম। আর মাত্র সাতটা দিন। দু' একদিনের মধ্যেই ট্রায়াল দেব কাগজের। দৈনিক প্রভাতের প্রেসে নয়। বাইরের কোনও প্রেসে। আমি চাই না, ছাপা কাগজটা চোরা পথে বাইরে চলে যাক। আমি কী করছি, তা জানার জন্য মুখিয়ে আছে আজকের সংবাদ ও জনকণ্ঠ। আমার সান্ধ্য দৈনিক বেরোবে। প্রথমদিনই বোমা ফাটাবে। টেস্ট ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলি গোপনে বিয়ে করেছে প্রেমিকা ডোনা রায়কে। রেজেস্ট্রি বিয়ে। খবরটা কেউ জানে না। কোনও কাগজে বেরোয়ওনি। সৌরভ এখন ন্যাশনাল টিমের কোচিং ক্যাম্পে। মাদ্রাজে। এই খবরটা আমি প্রথম দিনই করব।

বাইরে লনে হঠাৎই মিউজিক শুরু হল। নির্মলের সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত ছিলাম। লক্ষ করিনি, পনেরো-ষোলো জোড়া পুরুষ-মহিলা লনে নাচতে শুরু করেছে। পুরুষদের পরনে পাজামা-পঞ্জাবি। মেয়েদের পাতলা সালোয়ার-কামিজ। দেখে একটু অবাক লাগল। হোটেলে নাচের ফ্লোরে সাধারণত এ রকম পোশাক দেখা যায় না।

খেতে খেতে নির্মল বলল, "বড়লোকদের কী অদ্ভুত সব খেয়াল, না অয়নদা ? নাচতে আসার জন্যও কত পয়সা ওড়াচ্ছে।"

বললাম, "হ্যাঁ, ওখানে ঢুকতে নিশ্চয়ই পয়সা লেগেছে।"

—আমি কখনও থ্রি স্টার হোটেলে ঢুকিনি। এই প্রথম।

—কে বলতে পারে, তুমি একদিন, এ রকম নাচতে ঢুকবে না।

—এ জন্মে আর হবে না। বাড়িতে দুই বোন। বিচ্ছিরি দেখতে। বিয়ে হচ্ছে না। বাবা আমার ঘাড়ে রেখে গেছে। খুব অশান্তি। এ সব জায়গা আমাদের কাছে স্বপ্নের মতো। সিনেমাতেই দেখি।

—তোমাকে একটা সুযোগ দেব নির্মল। সান্ধ্য দৈনিকের পুরো এজেন্সিটা তুমি নেবে ? ভেবে দেখো। ভাল রোজগার।

টোপটা খেয়ে গেল নির্মল। হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, "সে তো অনেক টাকার ব্যাপার অয়নদা। আমার সামর্থের বাইরে।"

—আমি তোমাকে সাহায্য করব। বলো নেবে ? দেখো, অ্যাট এনি কস্ট, কাগজটাকে আমি দাঁড় করাতে চাই। আমার জীবন-মরণ বাজি।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে নির্মল বলল, "ঠিক আছে। ভেবে দেখি। কাল না হয় আপনাকে বলে যাব।"

বাকিটা সময় নির্মল কোনও কথা বলল না। বুঝলাম, মনে মনে ও যোগ-বিয়োগ

করছে। করুক। দিনে পাঁচ হাজার টাকা রোজগারের টোপ। সহজে কেউ ছাড়তে পারে ? খাওয়া-দাওয়া সেরে ও উঠে দাঁড়াল। দু' একটা কথা সেরে চলে গেল। রাত আটটা-সোয়া আটটা বাজে। লেক গার্ডেন্সে যেতে ইচ্ছে করছে না। আবার, এত তাড়াতাড়ি বাড়ি গেলেও বড়বৌদি ভেবে বসবে, অসুখ করেছে। আজকাল বাড়িতে থাকার একদম সময় পাচ্ছি না। বাড়িতে একটাই খবর, মেজবৌদি মা হচ্ছে। লজ্জায় প্রথম দু'দিন আমার সামনে বেরোয়নি মেজবৌদি। মেজদার মেজাজ বেশ ফুরফুরে। পরমা নার্সিংহোম থেকে ফিরে আসার পর বাড়িতে কথা উঠেছিল, ছোড়দার বিয়ে দেওয়া হোক। সেটা আপাতত ধামাচাপা পড়ে গেছে, মেজবৌদির জন্য।

ওয়েটার বিল নিয়ে এল। পার্স বের করে কার্ড দিয়েছি। হঠাৎ বাইরে তাকাতেই চোখে পড়ল শিলাজিৎ আর কৃষ্ণাকে। লনে নাচছে। নাচে কেউ এক্সপার্ট নয়। স্টেপে ভুল হচ্ছে। কৃষ্ণার কোমর জড়িয়ে রেখেছে শিলাজিৎ এক হাতে। অন্য হাতটা কাঁধে। কৃষ্ণারও এক হাত শিলাজিতের পিঠে। দু'জনে মিলে হাসছে। লনে, নাচিয়েদের সংখ্যা আরও বেড়ে গেছে। আগের থেকে দ্রুতলয়ে মিউজিক বাজছে। তবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে আলো। হালকা নীল আলোয়, জায়গাটাকে মনে হচ্ছে অন্য কোনও গ্রহের। শিলাজিতের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। দূর থেকে বুঝতে পারছি, সম্মোহিত হয়ে গেছে।

অনিমেষের সেই কথাটা আবার মনে পড়ে গেল। "শিলাজিতের কাছ থেকে তুই টাকা নিয়েছিস, নিসনি ?" লেক ক্লাবে তর্কাতর্কি করার সময় ও বলে ফেলেছিল। কথাটা মনে হতেই ফের সারা শরীরে চিনচিনে রাগ হতে শুরু করল। বাস্টার্ড শিলাজিৎ হয়তো কোনওদিন রঙ চড়িয়ে কথাটা বলেছিল অনিমেষকে। সাংবাদিক সত্তাটা হঠাৎই প্রবল হয়ে উঠল। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলাম, শিলাজিৎকে একটা শিক্ষা দেব। ওয়েটার কার্ড ফেরত দিতে এসেছে। ওকে বললাম, "এই টেলিফোন আছে, কোথাও ?"

—কাউন্টারে চলে যান।

পার্স বের করে গোটা কুড়ি টাকা এগিয়ে দিলাম ওয়েটারকে। তারপর উঠে কাউন্টারে গিয়ে ফোন করলাম মণিকাকে।

—হ্যালো ?

—অয়নদা ?

—বাব্বাঃ, গলা শুনেই চিনতে পেরেছ ? তোমরা কেমন আছ ?

—ভাল। জিৎ তো নেই। আজ বিকেলের ফ্লাইটেই দু' দিনের জন্য দিল্লি গেল। আমি একাই থাকব। একদিন আসুন না।

—সে কী ? এই মাত্র ওকে যে দেখলাম সাবরমতী হোটেলে !

—কী বলছেন আপনি অয়নদা ?

—ঠিকই বলছি। ওর সঙ্গে ছিল ওই মেয়েটা...নামটা মনে করতে পারছি না মণিকা...তোমাদের বাড়িতেই, সেদিন আলাপ হল যার সঙ্গে। ও প্রান্তে মণিকা চুপ। কয়েক সেকেন্ড পর ভাঙা গলায় বলল, "এই হোটেলটা কোথায় অয়নদা।

—পার্ক সার্কাস আর বাইপাসের কানেক্টরে। তুমি ভেবো না। হয়তো ফ্লাইট মিস করেছে। অনেক সময় এমন হয়। শিলাজিৎ ফিরুক। তখন না হয় একদিন আড্ডা

মারতে যাব। ছাড়ি তা হলে ?'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই, লাইনটা আমি ছেড়ে দিলাম। জীবনে এমন খারাপ কাজ আর একবারই করেছি। পারমিতার চিঠির একটা কপি কুণাল শালার বউকে পাঠিয়ে। উপায় নেই। খারাপ লোককে শায়েস্তা করার জন্য, খারাপ হওয়া দরকার। নালে, খারাপ লোকটা আমাকে মাড়িয়ে চলে যাবে। বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, নাচিয়ে পুরুষ ও সঙ্গিনীরা ভিজতে ভিজতেই নাচছে। হঠাৎই মনে পড়ল, পারমিতার কথা। পাতাল রেলের স্টেশনে ও দাঁড়িয়ে থাকবে। লোকে ওকে সেক্স ওয়ার্কার ভাববে। ভাবুক, ও তো সেক্স ওয়ার্কারদের থেকেও বেশি দক্ষ।

অলস চোখে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। সুইমিং পুলে স্নান করছে স্বল্পবসনা তিন মহিলা। তাদের দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে, আরাম চেয়ারে বসে থাকা কয়েকজন পুরুষ। হঠাৎই নজরে এল, সুইমিং পুলের দিকে বৃষ্টি নেই। আশ্চর্য ! এও সম্ভব ! মনে এই প্রশ্নটা জাগতে লনের ছাদের দিকে তাকালাম। মাই গড, কৃত্রিম বৃষ্টির ব্যবস্থা রয়েছে। ছাদের ওপরে, আকাশে কিন্তু তারা ঝকমক করছে।

সঙ্গে সঙ্গে ক্যালকাটা হেরাল্ড-এর একটা আর্টিকেলের কথা মনে পড়ে গেল। রেন ড্যান্স। কলকাতার দু' তিনটে হোটেলে নাকি, এই রেন ড্যান্স এখন বাড়তি আকর্ষণ। কৃত্রিম বৃষ্টিতে, উদ্দাম মিউজিকের তালে, সঙ্গিনীদের নিয়ে শরীরের সুখ আদায়ের প্রকাশ্য অনুষ্ঠান। এটা হয় শুক্র ও শনিবারের রাতে। প্যাকেজ ডিল। পাঁচ হাজার টাকার। দু' রাত্রি ও তিনটে দিন হোটেলে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাসহ। যাদের সঙ্গিনী নেই, তাদের জন্য সঙ্গিনীও পাওয়া যাবে। তবে দিতে হবে আরও পাঁচ হাজার।

কথাগুলো মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিলাজিতের দিকে তাকালাম। কৃষ্ণার বুকে মুখ ঘষছে। একটু পরেই মুখটা তুলে ও হাঁফাতে লাগল। নাচতে নাচতে ওরা দু'জন ডান দিকে সরে গেল। কাচের জানলার বাইরে, দু'হাতের মধ্যেই, একজন পুরুষ মুখ ডুবিয়ে দিয়েছে তার সঙ্গিনীর ঠোঁটে। মেয়েটার কামিজ ভিজে সপসপ করছে। অন্তর্বাস পরা নেই। স্তনবৃন্তটা তীক্ষ্ণ হয়ে ফুটে উঠেছে। লোকটার ভ্রূক্ষেপ নেই। ঠোঁট থেকে মুখটা সরিয়েই স্তনবৃন্তে হাত দিয়ে খেলা করতে লাগল।

দেখেই গা-টা শিরশির করতে লাগল। শিলাজিৎ আর কৃষ্ণাকে আমি খুঁজতে লাগলাম। একটা থামের আড়ালে ওরা দু'জন দাঁড়িয়ে। দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরেছে। হাত ঘড়িতে দেখলাম, পৌনে ন'টা। এতক্ষণে মণিকার আসা উচিত ছিল। এলে হাতে নাতে ধরতে পারত। উঠে আসার আগে, শেষ দৃশ্যটা চোখে লেগে রইল আমার। কৃষ্ণাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়েছে শিলাজিৎ। ওই বৃষ্টির মধ্যেই দু'জন দু'জনকে পাগলের মতো চুমু খাচ্ছে। এই দৃশ্যটাই বহুক্ষণ উত্তেজিত করে রাখল আমায়। কুলতলিতে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে একদিন সবিতাকে ঠিক এইভাবেই আমি পাঁজাকোলা করে তুলে, লঞ্চের কেবিনে ঢুকেছিলাম। সবিতার নরম দেহটা, চুম্বকের মতো টানতে লাগল আমায়।

হোটেল থেকে বেরিয়ে মারুতিটা আমি ছুটিয়ে দিলাম লেক গার্ডেন্সের দিকে। যা হয়, হোক। পরমাকে আমার চাই। এখখুনি চাই।

॥ চৌদ্দ ॥

রহস্যময় সেই লোকটার ফোন এল, সান্ধ্য দৈনিক বাজারে বেরোবার বেশ কিছুদিন পর। বেলা বারোটা, অফিসে তখন আমি খুবই ব্যস্ত। হাতের সামনে লিড করার মতো কোনও খবর নেই। পাতাল রেলের একটা কামরায় আগুন লেগেছিল বেলা দশটায়। সৌমিত্রকে সেখানে পাঠিয়েছি। ঠিক বুঝতে পারছি না, খবরটা কত বড় হবে। তখনও ফেরেনি সৌমিত্র। বেলা আড়াইটার সময় ছাপা শুরু হবে। তার অন্তত ঘণ্টাখানেক আগে খবরটা প্রেসে পাঠানো দরকার। খুবই চাপের মধ্যে রয়েছি।

—অয়ন ব্যানার্জি ?

—বলছি।

—কয়েকদিন ধরে আপনার ইভনিং ডেইলি কিনছি। মন্দ না। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও সেনসেশনাল খবর আপনি কিন্তু দিতে পারেননি।

ফোনটা ধরে চুপ করে রইলাম। লোকটা পিছু ছাড়েনি। এ নিয়ে তৃতীয়বার ফোন করল। বোঝাই যাচ্ছে, আমার সম্পর্কে বেশ খোঁজখবর রাখে। কে এই লোকটা। যে এই ব্যস্ততার সময় ইয়ার্কি মারছে ? আমাকে কথা না বলতে দেখে লোকটা বলে উঠল, "জানি, রাগ করছেন। একটা খবর দেব। করবেন ?"

—বলুন।

—খিদিরপুরে একটু আগেই একটা মার্ডার হয়েছে। মিলন সংঘ বলে একটা ক্লাব আছে। তার গায়ে ফ্ল্যাট বাড়িতে। ভদ্রমহিলার নাম সংযুক্তা মল্লিক। এক সময় নামকরা ফিল্ম অ্যাকট্রেস ছিলেন। ভীষণ ইন্টারেস্টিং হবে খবরটা। কেউ এখনও জানে না। চলে যান।

—উনি মার্ডার হয়েছেন, আপনি কী করে জানলেন ?

—সেটা আপনার জানা জরুরি নয়। হারি আপ। আজ বিকেলে খবরটা দেখতে চাই আপনার কাগজে।

বলেই লোকটা ফোন ছেড়ে দিল। সংযুক্তা মল্লিককে আমি চিনি। কিছু দিন আগে বিশ্বরুপা থিয়েটারে একটা অনুষ্ঠান দেখতে গেছিলাম। তখনই দেখি। সত্তরের দশকে বেশ কয়েকটা ছবিতে নায়িকার রোল করেছেন। হঠাৎই ফিল্ম জগৎ থেকে সরে যান। সংযুক্তা মল্লিকের একটা বই— পরকীয়া দারুণ হিট করেছিল। ক'দিন আগে ডি ডি সেভেনে সেই বইটা দেখেছি বলে মনে হল।

ধর্মতলা থেকে খিদিরপুর এমন কিছু দূরে নয়। মিনিট দশেকের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যাবে। কী মনে হল, মারুতিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ফিরে এলেও, খবরটা বেশ ভালভাবে করা যাবে। লোকটা ফোনে এর আগেও একটা খবর দিয়েছিল। করিনি। এই খবরটা যদি সত্যি হয়, অর্থাৎ উনি যদি মার্ডার হয়ে থাকেন, তা হলে আমার কাগজ আজ লোকের হাতে হাতে ঘুরবে। রেড রোডে পৌঁছে অবশ্য একবার মনে হল, খিদিরপুর যাওয়া ঠিক হচ্ছে কি না। একটা লোক টেলিফোনে খবর দিল। তাকে চিনি না, জানি না। তার কথায়, খুনখারাপির মধ্যে যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে ? কোনও বদমাইশ লোকের ট্র্যাপ হতে পারে। খবরের কাগজে

কাজ করি। শত্রুর অভাব নেই।

হঠাৎই বাদশার কথা মনে পড়ল। লোকটা এই ক'দিন আগে ফোনে একবার শাসিয়েছিল। ও থাকে অবশ্য এন্টালি এরিয়ায়। কিন্তু ওর মতো সমাজ বিরোধীদের যোগাযোগ সর্বত্র। পরক্ষণেই উড়িয়ে দিলাম কথাটা মন থেকে। বাদশার যদি আমাকে ট্র্যাপে ফেলার ইচ্ছে থাকে, তা হলে ফোন করত না। যা আছে কপালে দেখা যাক। ভেবে মারুতি ছুটিয়ে দিলাম খিদিরপুরের দিকে।

মিলন সংঘ ক্লাবের বেশ নাম আছে খিদিরপুর অঞ্চলে। কয়েক বছর আগে ক্লাবের দুর্গাপুজোয় ওরা সানি গাওস্করকে নিয়ে এসে উদ্বোধন করিয়েছিল। খুব হইচই ফেলে দিয়েছিল কলকাতায়। ক্লাবের পাশে বড় ফ্ল্যাট বাড়িটা খুঁজে পেতে তাই অসুবিধে হল না। সংযুক্তা মল্লিকের ফ্ল্যাট একতলায়। গিয়ে দেখি, দুর্ঘটনার কোনও চিহ্নই নেই। বোধহয় কেউ জানতে পারেনি। অথবা রহস্যময় লোকটা আমার সঙ্গে রসিকতা করেছে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য কলিং বেল টিপলাম।

উল্টোদিকের ফ্ল্যাটের দরজাও বন্ধ। কিন্তু টিভি চলছে। বাংলা কোনও সিরিয়াল চলছে মেট্রো চ্যানেলে। শব্দ ভেসে আসছে। বার কয়েক কলিং বেল টেপা সত্ত্বেও, কেউ দরজা খুলে দিল না। গা-টা ছমছম করে উঠল। হয়তো ভেতরে সংযুক্তা মল্লিকের মৃতদেহ পড়ে আছে। কী অবস্থায়, কেউ জানে না। সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটু অধৈর্য হয়ে উঠলাম। অফিসে শুধু কিংশুককে বলে এসেছি। প্রথম পাতাটা আমার জন্য ফাঁকা রেখে দিতে। লাইব্রেরিতে গিয়ে সংযুক্তা মল্লিকের কয়েকটা কালার ছবি বের করে, এতক্ষণে প্রসেস করেও রেখেছে কিংশুক। আমি গিয়ে লেখা দিলে পাতা মেকাপ হবে।

কী ভেবে উল্টোদিকের ফ্ল্যাটে কড়া নাড়তেই কুড়ি-একুশ বছর বয়সী একটা মেয়ে উঁকি দিল। এক পলক আমাকে জরিপ করে মেয়েটা জিজ্ঞাসা করল, "কাকে চাই?"

—সংযুক্তা মল্লিক কি ওই ফ্ল্যাটে থাকেন?

—হ্যাঁ।

—ওরা কোথায়, জানেন? বেল টিপে যাচ্ছি, অথচ কেউ সাড়া দিচ্ছেন না।

—আপনি কি থানা থেকে আসছেন?

শুনে একটু অবাকই হলাম। মেয়েটা এই প্রশ্ন করল কেন? তাহলে কি সংযুক্তা মল্লিক কোনও পুলিশি ঝামেলায় পড়েছিলেন? পরে জিজ্ঞাসা করা যাবে। এই ভেবে নিজের পরিচয় দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার মুখের রঙ পাল্টে গেল। কী যেন বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ পিছনে এসে দাঁড়ালেন ভারিক্কি চেহারার এক মহিলা। বোধহয় আমার প্রশ্নটা শুনে থাকবেন। বিরক্তির সঙ্গে বললেন, "ওদের কোনও খোঁজখবর আমরা রাখি না। আপনি ঠিক উপরের ফ্ল্যাটে যান। ওরা বলতে পারবেন।"

ঠিক এই সময়, উপরের সিঁড়ি দিয়ে দুড়দাড় করে একটা ছয়-সাত বছর বয়সী ছেলে নেমে এল। তাকে দেখে, দরজায় দাঁড়ানো মেয়েটা জিজ্ঞাসা করল, "পুপাই, তোদের বাড়িতে কেউ নেই?"

ছেলেটা খুব ব্যস্ততার সঙ্গে বলল, "মা আছে। একটু আগে স্কিপিং নিয়ে খেলছিল। আমাকে বলল, ওপরে তোতনদের ঘরে গিয়ে টিভি দ্যাখ।"

—তোর বাবা নেই?

–না গো পায়েলদি। কাল রাতে মা খুব কাঁদছিল। তারপর বাবাকে খুব মারল। সক্কালবেলায় বাবা কোথায় বেরিয়ে গেল। বলল, আর আসবে না।

পুপাই বলে ছেলেটা আরও কী সব বলতে চাইছিল। থামিয়ে দিল পায়েল, "তোর মাকে একবার ডাক তো। এই কাকুটা তোদের বাড়িতেই এসেছে।"

পুপাই দু'হাতে ধাক্কা মারতেই দরজা খুলে গেল। ভেতরে ডাইনিং স্পেসে পরমুহূর্তেই যে দৃশ্যটা দেখলাম, শিউরে উঠলাম। সিলিং ফ্যানে ফাঁস লাগিয়ে এক ভদ্রমহিলা ঝুলছেন। গলাটা একপাশে কাত হয়ে আছে। চোখ দু'টো ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। জিভটাও। কয়েকদিন আগে বিশ্বরূপা থিয়েটারে যে সংযুক্তা মল্লিককে দেখেছিলাম, তাকে চিনতে পারলাম না।

বাইরে দাঁড়িয়ে আমার পা থরথর কাঁপতে লাগল। খুন বা আত্মহত্যার ঘটনা অনেক শুনেছি। নিজের চোখে কখনও দেখিনি। সংযুক্তা মল্লিকের মতো একজন গ্ল্যামারাস মহিলা, এভাবে খুন হবেন, ভাবতেও পারছিলাম না। পুপাই, মায়ের ঝুলন্ত দেহটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে। তারপর পা দু'টো জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, "মা, তুমি উপরে উঠে কী করছ ? নেমে এসো, মা। তোমাকে দেখে ভয় লাগছে।"

আর সহ্য করতে না পেরে মুখটা ফিরিয়ে নিলাম। উল্টোদিকের ফ্ল্যাটের ভারিক্কি চেহারার মহিলা কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়িতেই বসে পড়লেন। পায়েল বলে মেয়েটার চেঁচামেচিতে আশপাশ থেকে ছুটে এলেন আরও কয়েকজন। মুহূর্তেই ভিড় জমে গেল। হাত ঘড়িতে প্রায় সোয়া একটা বাজে। আর দেরি করা যাবে না। পায়েলকে দেখলাম, বেশ শক্ত মনের মেয়ে। পুলিশ আসার আগেই ওর কাছ থেকে প্রচুর তথ্য জেনে নিলাম। পুলিশের এক অফিসার প্রায়ই সংযুক্তা মল্লিকের কাছে আসতেন। তাঁর সঙ্গে নাকি অবৈধ সম্পর্ক ছিল সংযুক্তার। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই অশান্তি চলছিল। সংযুক্তার স্বামী পুতান মল্লিক পোর্ট ট্রাস্টের অফিসার। নিরীহ ধরনের মানুষ। বারবার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও পায়েল কিছুতেই পুলিশ অফিসারের নামটা মনে করতে পারল না। পুপাই অবশ্য একবার বলল, "বাবা অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর কাকু একবার আমাদের বাড়িতে এসেছিল। তখনই মা বলে, উপরে গিয়ে টিভি দ্যাখ।"

খবর সম্পর্কে মোটামুটি সন্তুষ্ট হয়ে, দ্রুত আমি বেরিয়ে এলাম। পুলিশ এটাকে আত্মহত্যার ঘটনা বলে চালাবে। কিন্তু আমি প্রথম থেকেই খুন বলে লিখতে থাকব। প্রাক্তন অভিনেত্রীর সঙ্গে পুলিশ অফিসারের অবৈধ সম্পর্কের পরিণামে খুন। এই খবর বাজারে খুব খাবে। অন্তত, দিন পাঁচেক তো চালাতে পারবই। তার আগে জেনে নেওয়া দরকার, পুলিশ অফিসারটি কে ? কতটা তিনি পাওয়ারফুল।

অফিসে ঢোকার সময় রিসেপশনে দেখা সমীরণবাবুর সঙ্গে। হেসে বললেন, "কী আজ সেনসেশনাল কিছু আছে ?"

স্থান-কাল ভুলে বলে উঠলাম, "আছে। হটকেক হয়ে যাবে।"

—লাঞ্চ করে আসছি। তখনই শুনব।

দ্রুত পায়ে লিফটের সামনে আসতেই, হঠাৎ দেখলাম, দীপেন। কথাটা শুনে ফেলেছে। বেরিয়ে যাচ্ছিল। ফিরে এল। ওকে ফিরে আসতে দেখে, আমি মনে মনে হাসলাম। বিড় বিড় করে বললাম, "আজ যদি খচড়ামি করিস, তোর কপালে

দুঃখ আছে।"

নিজের চেম্বারে ঢুকে দ্রুত লিখতে শুরু করলাম। খিদিরপুর থেকে ফেরার সময় মনে মনে ভাগ করে নিয়েছিলাম, চারটে ছোট স্টোরি করব। প্রথমে, সংযুক্ত মল্লিকের খুনের খবর। একটু প্রশ্নবোধক করে। দ্বিতীয় খবর, 'কে এই পুলিশ অফিসার?' তৃতীয় খবর, পুপাইকে নিয়ে হিউম্যান অ্যাঙ্গেলে। পুপাইয়ের কী হবে? চতুর্থটা, সংযুক্তা মল্লিকের অবিচুয়ারি। কিংশুককে বললাম, লাইব্রেরি থেকে ফাইল আনিয়ে সংযুক্তার অবিচুয়ারি লিখে দিতে। সৌমিত্রকে মুখে বলে দিলাম, পুপাই সম্পর্কে কী লিখতে হবে। বাকি দু'টি স্টোরি আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই লিখে ফেললাম।

আমাদের লেখাগুলো কম্পোজ করে ডি টি পি-র ছেলেরা। শিফট ইনচার্জ মলয় লাহিড়ি উদ্বিগ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে নিজেই নেমে এসেছে কপি নিতে। ওর হাতে দু'টো স্টোরি দিয়ে বললাম, "মলয়, তুই নিজে দাঁড়িয়ে কম্পোজ করাবি। ওপরের দৈনিক প্রভাতের কেউ যেন না দেখে। এটা এক্সক্লুসিভ খবর।"

—নিশ্চিন্ত থাকুন অয়নদা। কেউ জানতে পারবে না। আপনি বাকি দু'টো কপি তাড়াতাড়ি পাঠান। না হলে কাগজ ঠিক টাইমে বেরোবে না।

কিংশুক খুব দ্রুত কপি লেখে। অবিচুয়ারি লিখে আমার হাতে দিতেই ওকে বললাম, "বাকি তিন পাতার খবর কী রে? মেকাপ হয়ে গেছে?"

—হ্যাঁ অয়নদা। গৌতম খুব ভাল একটা খবর দিয়েছে শানু সম্পর্কে। স্পোর্টস পেজে রূপায়ণেরও একটা এক্সক্লুসিভ আছে। ইস্টবেঙ্গল ন্যাশনাল লিগের জন্য নাইজিরিয়ার একজন ওয়ার্ল্ডকাপার আনছে।

—ইস, আগে বললি না। ওই খবরটা তা হলে ফার্স্ট পেজে রাখতাম। ময়দানে আজ এটাই খুব আলোচনা হবে। নির্মলকে বলিস, ধর্মতলা সেন্টারে যেন বেশি করে কাগজ রাখে।

—বাকি ফিচারগুলো সব গেছে অয়নদা। শুধু 'লালবাজার থেকে' ছাড়া।

—দরকার নেই। লালবাজারের থেকেও বড় খবর আমরা আজ দিচ্ছি। সংযুক্তা মল্লিকের কী ছবি দিয়েছিস?

—দেখলে আপনার পছন্দ হবে।

—আমি পি বি এক্স থেকে একটু ঘুরে আসছি। তুই পাতা মেকাপের সময় নিজে থাকিস।

বলেই আমি তিনতলায় উঠে এলাম। অ্যাকাউন্টস সেকশনের পাশেই পি বি এক্স-এর ঘর। কাঁচের দরজা। রুমা বলে সেই মেয়েটা ডিউটি করছে। ঘরে ঢুকতেই রুমা বলল, "আপনি? কোনও ফোন করবেন?"

—না। তিনতলা থেকে গত আধঘণ্টায় যে সব ফোন বাইরে গেছে, তার টেপ শুনব।

দু'একটা সুইচ এদিক ওদিক টিপে রুমা, আমার দিকে একটা হেড ফোন এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা পরে নিন। আমি টেপটা চালিয়ে দিচ্ছি।"

এই সিস্টেমটা আগে আমাদের অফিসে ছিল না। দিন দুশেক আগে এডিটরের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, অফিস থেকে খবর ফাঁস করা নিয়ে। তখনই উনি বলেন, পি বি এক্সের সব আউটগোইং ফোন টেপ করতে। দু'দিনের মধ্যেই সব ব্যবস্থা হয়ে যায়।

BOIRBOI.NET

এ সব কথা অপারেটর ছাড়া আর কেউ অবশ্য জানে না। রুমার কথামতো তাই হেড ফোনটা পরে নিলাম।

কাগজের অফিসে দুপুরবেলা মানে, প্রচুর ফোন। শুনে যাচ্ছি একেকজনের গলা। মাঝেমধ্যে ফার্স্ট ফরোয়ার্ড করে নিচ্ছি। হঠাৎই, যা চাইছিলাম, শুনতে পেলাম। দীপেনের গলা, 'লম্বুটা, আজ কোনও একটা বড় কিছু করছে। তোদের ইভনিং ডেইলি কিন্তু আজ ঝাড় খাবে।"

—"পুলিশ বিট-এর কিছু ?" উল্টোদিকে একজনের গলা। খুবই উদ্বিগ্ন।

—বুঝতে পারছি না। মালটা এখনও প্রেসে পাঠায়নি। আমি আছি। কপিটা দেখার সুযোগ পেলেই তোকে জানাব।

—লম্বুটা পর পর দু'দিন আমাকে ঝাড় দিয়েছে। শালা, পুরুলিয়ার অস্ত্র রহস্য নিয়ে সি বি আইয়ের রিপোর্টটা ওকে কে দিল রে, জানিস ?

—বুঝতে পারছি না। লম্বুটা আজকাল আমাদের জি এম-এর সঙ্গে গল্ফ খেলে। ভাও খুব বেড়ে গেছে অফিসে। ওর পিছনে লোক লাগিয়েছি। তুই কিছু ভাবিস না। আধ ঘণ্টার মধ্যেই তোকে ফোন করছি।

তারপরই ফোন রেখে দেওয়ার শব্দ। লম্বু মানে আমি। কথাটা ভাবতেই আমার হাসি পেয়ে গেল। দীপেন একটু ভয় পেয়েছে। ওকে আরও ভয় পাওয়াতে হবে। শুয়োরের বাচ্চা, গত পাঁচ বছর আমাকে কোণঠাসা করে রেখেছিল। ভাল ভাল খবর করতাম। আর তা পাচার করে দিত দৈনিক ভোর-এ। তখন আমার সন্দেহ হত। কিন্তু কিছু করতে পারতাম না। আজই ওর ব্যবস্থা করব। হেডফোনটা মাথা থেকে খুলে রুমাকে বললাম, "ঠিক আছে, যা শোনার শুনে নিয়েছি। এক ঘণ্টা পর ফের আসছি। আবার একবার টেপ শুনব। আর শোনো, এ কথাটা যেন কেউ না জানে। বুঝলে ?"

রুমা ঘাড় নাড়ল। পি বি এক্স থেকে বেরিয়ে একবার টয়লেট গেলাম। মুখেচোখে জল দিয়ে আয়নার দিকে তাকাতেই হঠাৎ সংযুক্তা মল্লিকের ঝুলন্ত দেহটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। কী ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য ! পুলিশ নিশ্চয়ই এতক্ষণে বডিটা মোমিনপুরের মর্গে নিয়ে গেছে। সারা রাত হয়তো পড়ে থাকবে ওই সুন্দর দেহটা, কিছু বেওয়ারিশ লাশের সঙ্গে। কাল কাটা-ছেঁড়া হবে। ভাবতেই গা-টা গুলিয়ে উঠল। হঠাৎই মনে হল, সংযুক্তা মল্লিকের মার্ডার নিয়ে টালিগঞ্জ পাড়ার একটা রি-অ্যাকশন স্টোরি থাকলে ভাল হত। ওনার সমসাময়িক অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কিছু মন্তব্য। মর্নিং এডিশনগুলো নিশ্চয়ই এই স্টোরিটা করবে। ভাবতেই হাত কামড়ালাম।

—অয়ন, কেমন আছ ?

তাকিয়ে দেখি মিলনদা। দৈনিক প্রভাতের পুরনো রিপোর্টার। এক্সটেনশনে আছেন রিটায়ার করে যাওয়ার পাঁচ বছর পরও। রুমাল দিয়ে মুখ মুছছিলাম। বললাম, "ভাল। আপনি ?"

—ওই একইরকম। আমাদের আর থাকা না থাকা। আমরা এখন ঠিকে ঝি, বুঝলে। কবে তাড়িয়ে দেবে, জানতেও পারবে না।

—আপনার সঙ্গে কুণালের সম্পর্ক তো বেশ ভাল। তাড়িয়ে দেবে কেন ?

—ওপরতলায় কী সব বদল-টদল হল, শুনলাম। মালিকানা নাকি পাল্টে গেল। কুণাল তো ধরেই নিয়েছে, আর চিফ রিপোর্টার থাকছে না। আমাকে একটু দেখো ভাই। শুনলাম, তুমিই নাকি চিফ রিপোর্টার হচ্ছ।

মনে মনে বললাম, তুমি শালা একটা আস্ত শয়তান। এতদিন কুণালের চামচেগিরি করে এখন আমার কাছে এসেছ। লাথি মেরে ভাগিয়ে দেব। মুখে অবশ্য বললাম, "মিলনদা, অনেক বছর তো সার্ভিস দিলেন। এবার একটু রেস্ট নিন।"

কথাটা পছন্দ হল না মিলনদার। বললেন, "আর দু'একটা বছর। ছোট ছেলেটা দাঁড়িয়ে গেলেই ভাবছি, আর এক্সটেনশন চাইব না।"

কড়া গলায় বললাম, "মিলনদা, সল্টলেকে আপনি যে বাড়িটা বানিয়েছেন, তার দামই প্রায় বারো লাখ। ফিনান্স মিনিস্টার-এর কাছ থেকে এই ক'দিন আগেই একটা মদের দোকানের লাইসেন্স নিয়েছেন। অবশ্য নিজের নামে নয়। ছোট ছেলের নামে। দিব্যি আছেন, আর কেন?"

বলেই টয়লেট থেকে বেরিয়ে এলাম। এই সব ধান্ধাবাজ রিপোর্টারের জন্যই আমাদের প্রফেশনের এত বদনাম। এই মিলনদা, পাঁচ বছর আগে বিরাট একটা ক্ষতি করে দিয়েছিলেন আমার কেরিয়ারের। তখন আমি রাইটার্স বিট করতাম। মিলনদাও। ফিনান্স মিনিস্টার সেই সময় কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে একশো কোটি টাকা লোন নিয়েছিলেন। সেই খবরটা পেয়ে আমি একটা স্টোরি জমা দিই কুণালদার কাছে। মিলনদা জানতে পেরে ফিনান্স মিনিস্টারকে সঙ্গে সঙ্গে ফোনে জানিয়ে দেন। আমার সেই খবর আর বেরোয়নি। ওপরতলায় কী হল, জানি না। দু'একদিন পর ফিনান্স মিনিস্টার একটা প্রেস কনফারেন্সে সবার সামনে আমাকে অপমান করলেন। আমিও পাল্টা জবাব দিয়েছিলাম। তারপর দিন থেকে রাইটার্স যাওয়া আমার বন্ধ হয়ে গেল। আমাকে এডুকেশন বিট দেওয়া হল। রাগ হয়, খুব রাগ হয় সেই সব কথা ভাবলে।

সিঁড়ি দিয়ে হেঁটেই একতলায় নেমে এলাম। সৌমিত্র টিভি দেখছিল। আমাকে দেখে বলল, "পাতা ঠিক টাইমেই গেছে অয়নদা। আর মিনিট কুড়ির মধ্যেই ছাপা কপি পেয়ে যাবেন। প্রেসের অমূল্যকে বলেছি। উপরে কয়েক কপি দিয়ে যাবে।"

বললাম, "এই, সবাইকে ডাক তো। অভিনেত্রী খুন, এই খবরটা আমাদের কয়েক দিন চালিয়ে যেতে হবে। আমার মনে হয়, লোকাল থানায় কেসটা আর থাকবে না। ডি ডি নিয়ে নেবে। আজই আমরা ভাগাভাগি করে নিই, কে কী অ্যাঙ্গেলে খবরটা করব।"

সৌমিত্র আর কিংশুকে বাদে সবাই নতুন ছেলে। আমি নিজে বেছে নিয়েছি, তিনটে ছেলেকে-সুপর্ণ প্রজ্ঞা আর শুভময়। প্রত্যেকেরই ফ্যামিলি কানেকশন ভাল। পাঁচজন আমার চেম্বারে এসে বসতেই বললাম, "কাল মর্নিং এডিশনগুলো কী করবে, আমি জানি। পুলিশ বলবে, সংযুক্তা মল্লিক আত্মহত্যা করেছেন। সব কাগজই তাই লিখবে। আমরা ছয়জন নিজেরা ইনভেস্টিগেশন করব। বলো, কে কীভাবে স্টোরি করতে চাও।"

সৌমিত্র বলল, "আমি পুতান মল্লিকের পিছনে লেগে থাকব।"

কিংশুক বলল, "আমি ফিউনিরালে যাব। ওখানে নিশ্চয়ই টালিগঞ্জের অ্যাক্টর?

অ্যাকট্রেসরা থাকবেন।"

সুপর্ণ বলল, "ডি ডি-তে আমার কিছু জানাশুনো আছে। অয়নদা, লালবাজারটা আমাকে দেবেন?"

বললাম, "কাকে চেনো তুমি ডি ডি-তে?"

—ডি সি সোমেন মিত্র। আমার জ্যাঠতুতো দাদা।

—ফাইন। আজ থেকেই লেগে পড়ো। ওকে বলবে, তোমার কনফার্মেশন নির্ভর করছে এই স্টোরিটার ওপর।

—আমি অলরেডি কথা বলেছি অয়নদা। যে পুলিশ অফিসারটি সংযুক্তা মল্লিকের বাড়ি যেতেন, তার নামও জেনেছি।

—এক্সিলেন্ট। লোকটা কে?

—ডি সি পোর্ট মনোরঞ্জন মহাপাত্র। আমি আজই মহাপাত্রর কাছে যাচ্ছি। বর্ধমান রোডে পোর্টল্যান্ড কোয়ার্টারে। আজ রাতে কেউ এ খবর পাবে না।

—এক্সিলেন্ট। প্রজ্ঞা, তুমি কিছু ভেবেছ?

—হ্যাঁ অয়নদা। পোস্টমর্টেমের রিপোর্টটা কালই জোগাড় করে ফেলব।

—পাবে কী করে?

—আমার বাবা হেলথ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারি। বাবাকে দিয়ে ইনফ্লুয়েন্স করব।

—ফাইন। এবার শুভময়, তোমার প্ল্যানটা কী?

—আমার মনে হয়, খিদিরপুরের ওই বাড়িতে সকাল থেকেই কারও থাকা দরকার। বেলা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত। ইনসাইড স্টোরি, পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

—যেতে পারো। উল্টোদিকের ফ্ল্যাটে পায়েল বলে একটা মেয়ে থাকে। তার কাছে আমার নাম কোরো। কাল সকালে সব কাগজ খুঁটিয়ে পড়ে, সব্বাই আমাকে একবার ফোন করে ইনপুট দেবে। ফার্দার কোর্স অফ অ্যাকশন, তখনই ঠিক করে নেব।

মিটিং ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেস থেকে অমূল্য দশ-বারোটা কাগজ নিয়ে উঠে এল। ফ্রন্ট পেজটা দুর্দান্ত হয়েছে। সবার মুখই খুশিতে উজ্জ্বল। কাগজটা হাতে হাতে ঘুরছে। চারটে পাতায় দ্রুত চোখ বুলিয়ে আমি বললাম, "মেন হেডিংয়ের পয়েন্ট আর একটু বাড়িয়ে দিলে কি ভাল হত?"

সৌমিত্র বলল, "না অয়নদা, ঠিক আছে। আরও বড় হেডিং করলে মাস্ট হেড ঝাড় খেত।"

মনে মনে তারিফ করলাম ছেলেটার। লে আউট সেন্স সবার থাকে না। এই ছেলেটার আছে। পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছে। ওই ব্যাচে সব থেকে বেশি নম্বর পেয়েছিল লিখিত পরীক্ষায়। ওরাল পরীক্ষায় কিন্তু বাদ চলে যাচ্ছিল। ওদের ব্যাচে তিনজনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠানো হয়। সৌমিত্রর নাম ছিল চার নম্বরে। দ্বিতীয় জন চাকরি পেয়েও না আসায়, তখন ওকে ডেকে নেওয়া হয়। খবরের কাগজে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করেছি, পড়াশুনা জানা বহু ভাল ছেলে দাঁড়াতে পারে না। তারা চাপই নিতে চায় না। আবার মাঝারি ধরনের ছেলেরা অনেক সময়

ক্লিক করে যায়। অনেক নামী রিপোর্টারকে জানি, যাদের অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার এমন কিছুই না।

সৌমিত্র, প্রজ্ঞারা একে একে বেরিয়ে গেল। লাঞ্চ করা হয়নি। সকালে আজকাল হেভি ব্রেকফাস্ট করে বেরোই। অফিসে আসার পর, কাজের চাপে কয়েকদিন খাওয়ার কথা মনে পড়েনি। কথাটা দু'দিন আগে বলে ফেলায়, পরমা খুব চটে গেছিল। বেলা আড়াইটার সময় রোজ ও মনে করিয়ে দিচ্ছে, লাঞ্চ করতে গেছি কি না। আজ বোধহয় নিজেই ভুলে গেছে। কথাটা মনে হতেই টেলিফোনের দিকে চোখ গেল। ইস্, রিসিভারটা ক্রেডলে বসানো নেই। মিটিং চলার সময় যাতে ফোন ধরতে না হয়, সে জন্য রিসিভারটা তুলে রেখেছিলাম। ফের ঠিক জায়গায় রাখতে, ভুলে গেছি।

রিসিভারটা রাখতেই ফোন এল ওপর থেকে। অপারেটর রুমা বলল, "অয়নদা, আপনি কি টেপ শুনবেন ? আমার ডিউটি শেষ হয়ে গেছে। আপনার জন্যই বসে আছি।"

বললাম, "ক্যাসেটটা পাঠিয়ে দেবে ?"

—আমি নামছি। নিজেই নিয়ে যাচ্ছি।

—এসো।

—আপনার একটা লাইন আছে। ছাড়বেন না কিন্তু।

কয়েক সেকেন্ড পরই পরমার গলা শুনতে পেলাম, "কী এমন রাজকার্যে ব্যস্ত তুমি ? এবার নিয়ে দশবার করলাম। প্রতিবারই এনগেজড ?"

হাসতে হাসতে বললাম, "রাজাদের আমলে কিন্তু টেলিফোন ছিল না।"

—খেয়েছ ?

মিথ্যে করে বললাম, "হ্যাঁ।"

—বাজে কথা।

—কী করে বুঝলে ?

—ইনটুইশন। সংযুক্তা মল্লিকের খবর করতে গিয়ে, সময় পাওনি। তাই না ?

—কারেক্ট।

—তাহলে কেন মিথ্যে কথা বললে ?

—যদি তুমি বকাবকি করো।

—বাঃ, কী কনফেশন।

BIRBOI.NET

—সত্যি রমা, তুমি বলায় এখন প্রচণ্ড খিদে পাচ্ছে। কাছে পেলে তোমাকেই হয়তো খেয়ে ফেলতাম।

—কিংশুকরা ধারে কাছে নেই বুঝি ?

—সবাই বাড়ি চলে গেছে।

—তুমি কখন বেরোবে ?

—কেন, কোনও দরকার আছে ?

—বলোই না, কখন বেরোবে ?

—নির্মলের জন্য বসে আছি। আজকের সার্কুলেশন ফিগারটা, নিতে হবে।

—সে তো সাড়ে পাঁচটার আগে পাবে না। তাই না ?

—আর একটু দেরিও হতে পারে।

—পরে ফোন করে নিলে হবে ?

—নেওয়া যায়।

—বাবা আর মা আজ তোমাদের বাড়ি যাবে।

—ভেরি গুড। লেক গার্ডেন্সে, তা হলে তুমি একা ?

—মোটেই না। আমার এক বন্ধু আসবে।

—বারণ করে দাও না রমা। আজ তুমি আর আমি, লনে বসে শুধু চাঁদ দেখে যাব।

—চাঁদ নেই।

—তা হলে, তোমার ঘরে মুখোমুখি বসে পলকহীন তাকিয়ে থাকব পরস্পরের দিকে।

—হঠাৎ এত কবিত্ব ?

—বরাবরই ছিল। চেপে রেখেছিলাম।

—জিজ্ঞেস করলে না তো, বাপী আর মা কেন তোমাদের বাড়ি যাচ্ছে ?

—নেমন্তন্ন আছে বোধহয় ?

—কী বুদ্ধি। আমাকে বাদ দিয়ে, কখনও নেমন্তন্ন হবে ?

—তা হলে ?

—আজ পাকা কথা বলতে গেছে।

—কিসের পাকা কথা, রমা ?

—বিয়ের।

—কার বিয়ে ?

—এই, ইয়ার্কি মেরো না। বাবা আর ওয়েট করতে চাইছে না।

—তুমি ?

—আমিও না। সেদিন যা হল, আমার খুব ভয় করছে অয়ন।

—ভয়ের কী আছে, রমা।

—তুমি হঠাৎ এত অসভ্য হয়ে গেলে কেন বলো তো ? আমারও যে কী হল সেদিন। কিছুতেই চেক করতে পারলাম না। তোমার সামনে যেতেই এখন আমার লজ্জা করছে।

উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম। রুমা এসে হাজির। মুখ টিপে হাসছে রুমা, তখনও আমাকে কথা বলতে দেখে। অফিসে প্রায়ই ফোন করে পরমা। অপারেটররা গলা চেনে। টেবলের উপর ক্যাসেটটা রেখে, রুমা বলল, "পরে কিন্তু ফেরত দেবেন।"

ও প্রান্ত থেকে পরমা বলল, "কে গো মেয়েটা ?"

হাসতে হাসতে বললাম, "তোমার ভয় নেই। অপারেটর। বাবা কখন যাবেন আমাদের বাড়ি ?"

—তুমি আসবে ? যদি আসো, তা হলে আমিও যেতে পারি।"

—ঠিক আছে। আসছি। পাকা কথা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকা দেখাটাও হয়ে যাক।

—বাকি আছে নাকি ? অসভ্য কোথাকার।

BOIRBOI.NET

বলেই লাইনটা কেটে দিল পরমা। টেবল গুছিয়ে আমিও উঠে পড়লাম। চেম্বারে এ দিক-ও দিক অনেক কিছু পড়ে থাকে। তাই বেরিয়ে যাওয়ার আগে রোজ লক্ করে যাই। বাইরে টুলে বসে রয়েছে গুণধর। সান্ধ্য-র বেয়ারা। ওকে চাবি দিয়ে বেরিয়ে এলাম। নীচে নামতেই দেখি, রিসেপশনে বসে অঞ্জলি আজকের সংবাদের সান্ধ্য এডিশন পড়ছে। সংযুক্তা মল্লিকের খবরটা কি ওদের কাগজে বেরিয়েছে? কথাটা মনে হতে, কাগজটা চেয়ে নিলাম অঞ্জলির কাছ থেকে।

প্রথম পাতায় লিড নিউজ 'উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নির্বিঘ্নে শুরু'। দেখেই আমার হাসি পেল। এটা কোনও খবর? ঝামেলা হলে না হয় খবর হত। দ্রুত চোখ বোলাতে লাগলাম। দিল্লিতে লালুপ্রসাদ যাদব, যাত্রাপাড়ায় মুনমুন সেন, যাদবপুরে গণধর্ষণ, তার পেটে ছোট্ট একটা খবর 'প্রাক্তন অভিনেত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু'। পাঁচ-সাতটা লাইন। চৌদ্দ পয়েন্টে হেডিং। খবরটা দেখেই আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। শুয়ারের বাচ্চা দীপেনের কাজ। খবরটা খুব ভাল করে পায়নি। যা পেয়েছে, পাচার করে দিয়েছে আজকের সংবাদে। না, আজই এর বিহিত করা দরকার। কাগজটা হাতে নিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে তিন তলায় উঠে এলাম।

এডিটরের ঘরে পি এ মারফত খবর দিতেই ডাকলেন উনি। "অয়ন, তোমাকেই খুঁজছিলাম। ফ্যানটাস্টিক হয়েছে আজ ইভনিং এডিশন।"

—সেই সম্পর্কেই একটা কথা আপনাকে বলতে এসেছিলাম।

—আমাদের ইয়ং বয়সে সংযুক্তা মল্লিকের দারুণ গ্ল্যামার ছিল বুঝলে। অ্যাকচুয়ালি উনি কিন্তু ফিল্ম লাইনে আসার আগে স্টেজে ছিলেন। পড়াশুনা করেছেন ইউনিভার্সিটি লেভেলে। মাঝে একদিন টলি ক্লাবে দেখলাম, ফিগারটা বেশ ভাল রেখেছিলেন। বিয়ের আগে...সংযুক্তা কেপ্ট ছিলেন সুশীল হিম্মতসিঙ্কার। থাকতেন আলিপুরে। সে সব কথা আর লেখা যাবে না। কল্যাণকে ডেকে আমি বলে দিয়েছি, মর্নিং এডিশনেও খবরটা যেন ভাল করে বেরোয়। দরকার হলে তোমার কাছ থেকে ইনপুট নিতে।

—আপনাকে একটা কথা বলার ছিল।

—বলো।

—আমার এই খবরটা এক্সক্লুসিভ হত। লিক হয়েছে।

এডিটর গম্ভীর হয়ে গেলেন, "কে করেছে?"

—দীপেন সরকার।

—কোনও প্রমাণ আছে?

—আছে।

বলেই পকেট থেকে বার করলাম ক্যাসেটটা। ইন্টারকমে নিউজ এডিটরকে ডাকলেন এডিটর, "কল্যাণ, তোমাদের কারও কাছে টেপ রেকর্ডার আছে? থাকলে নিয়ে এসো।" তারপরই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে এই ছেলেটা?"

—আমার ব্যাচের। অনেকদিন ধরে এটা করছে।

—তোমার কথা যদি সত্যি হয় অয়ন, আজই ছেলেটাকে স্যাক করব।

কল্যাণদা ঘরে ঢুকতেই এডিটর বললেন, "দিন, টেপ রেকর্ডারটা দিন।"

ক্যাসেট ঢুকিয়ে সুইচ টিপতেই দীপেনের গলা শোনা গেল, "শোন, পুরনো দিনের

BOIRBOI.NET

একজন অ্যাকট্রেস সংযুক্তা মল্লিক মার্ডার হয়েছে। থাকতেন খিদিরপুরে।

—লম্বুটা কি বড় করে লিখছে ?

—লিড নিউজ। তোদেরও করতে বল।

ক্যাসেট বেজেই চলল। দীপেনের কথা শেষ হতেই আমি সুইচ টিপে দিলাম। এডিটর ফেটে পড়লেন রাগে, "আমি আজই এই ছেলেটাকে স্যাক করছি।"

কল্যাণদা দুর্বল গলায় বললেন, "আগে ওকে শো কজ করলে হত না ?"

—নো নিড। হয় ওকে রেজিগনেশন দিতে বলুন, না হয় আমি ওকে চিঠি দেব। চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলাম। যান।

মনে মনে আমি হাসলাম। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। পাঁচ-ছ'টা বছর আমাকে যন্ত্রণা দিয়েছে এই ছেলেটা। ওর শাস্তি পাওয়া দরকার ছিল। এই খবরটা আমিই কাল ছড়িয়ে দেব সারা অফিসে। বাতাসের গতিতে তা ছড়িয়ে পড়বে অন্য কাগজে। দীপেনের পক্ষে প্রফেশনে টিকে থাকা মুসকিল হবে। এই দীপেনই একদিন আমাকে কথায় কথায় বলেছিল, "খবরের কাগজে লোকে চাকরি খরতে ঢোকে হাসতে হাসতে। ছাড়ার সময় কেউ হাসিমুখে বেরোয় না।" আশা করি, দীপেনও আজ হাসিমুখে বেরোবে না।

কুমারেশ মজুমদারের সঙ্গে আরও দু'চারটে কথা বলে নীচে নেমে এলাম। পার্কিং লটে মারুতিটা আছে। সেদিকে যেতে পিছন থেকে কে যেন ডাকলেন, "অয়ন ?"

ঘুরে দেখলাম, ভূপালদা। দৈনিক প্রভাতের চিফ সাব এডিটর। বয়স্ক মানুষ। খুব হাসিখুশি। অফিসে ঢোকার পরদিন থেকে একই পোশাকে দেখছি ভূপালদাকে। সেই ধুতি-পঞ্জাবি।

—কোন দিকে যাবি ?

—বাড়ির দিকে। কেন ? যাবেন ?

—যদি দয়া করে নিয়ে যাস।

বলেই হাসতে লাগলেন ভূপালদা। পদ্মপুকুরের দিকে থাকেন। আমাকে একটু ঘুরে যেতে হবে। ভূপালদার মতো ভদ্রলোকের জন্য এ টুকু করা যায়। মারুতিটা বের করে এনে দরজা খুলে দিলাম। গাড়িতে ওঠার আগে দৈনিক প্রভাতের বাড়িটা, মিনিট খানেক ধরে দেখে নিলেন ভূপালদা। তারপর আমার পাশে বসে বললেন, "দেখেও ভাল লাগে, আজকালকার রিপোর্টাররা মারুতি চালিয়ে বাড়ি যাচ্ছে। আমাদের সময় কেউ ভাবতেও পারতাম না।

BOIBOI.NET

—ক'দ্দিন হল আপনার ভূপালদা ?

—বেশিদিন না রে। চল্লিশ বছর। মনে হয়, এই তো সেদিন ঢুকলাম। তখন অফিসটা ছিল বউবাজারে। ছোট্ট এক চিলতে জায়গায়। হট মেটালে কাজ হত। মাইনে কত পেতাম, জানিস ? তেরো টাকা চার আনা।

—মাই গড।

হাসতে হাসতে ভূপালদা ফের বললেন, "তাও প্রতি মাসে জুটত না। তাতে কিছু আসত-যেত না। ছুটি বলে কিছু ছিল না। একদিন আপিসে না এলে মনে হত, দিনটা যেন বেকার গেল। তখন এডিটর ছিলেন মানবেন্দ্র উপাধ্যায়। বলতেন, "ভূপাল, কাজে কখনও ফাঁকি দিবি না। রিটায়ার করার দিন পর্যন্ত কাজ করে যাবি।

কী লোক ছিল, তোকে বলে বোঝাতে পারব না।"

গাড়ি চালাতে চালাতে শুনছি, ভূপালদার কথা। এঁদের স্যাক্রিফাইস, এখন অবশ্য কেউ মনে রাখে না। পুরনো আমলের লোকেদের মধ্যে একমাত্র এই ভদ্রলোকই টিকে আছেন। নির্বিরোধী মানুষ। কারও সঙ্গে কোনওদিন বিবাদে জড়িয়ে পড়েননি। খবরের কাগজে এমন মানুষ পাওয়া খুবই কঠিন। হাসতে হাসতে ভূপালদা পুরনো দিনের সব কথা বলে যাচ্ছেন।

পদ্মপুকুরে পৌঁছে ভূপালদা গাড়ি থেকে নেমে বললেন, "আসবি নাকি, গরিবের বাড়িতে।"

—আজ থাক, ভূপালদা। অন্য কোনওদিন নিশ্চয়ই আসব।

—আর তো তোর সঙ্গে কোনওদিন দেখা হবে না ভাই।

—কেন ভূপালদা ?

—আজই তো আমি রিটায়ার করলাম।

বলেই হা হা করে হেসে উঠলেন ভূপালদা। সেই হাসি শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। খবরের কাগজ ছাড়ার সময়ও লোকে তাহলে হাসে !

॥ পনেরো ॥

দৈনিক প্রভাতে ঢোকার পর, বছর খানেক আমি দিনে আঠারো ঘণ্টা করে খাটতাম। এত ভাল লাগত কাজ করতে। সারা দিন অফিসেই পড়ে থাকতাম। তখন সিনিয়র রিপোর্টার ছিলেন সোমনাথদা। কাজে আমার এত আগ্রহ দেখে উনি বলতেন, "খবরের কাগজ হল তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের। শরীরটাকে একটু রেস্ট দিও ভাই। না হলে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন চালাতে পারবে না।"

আমি লজ্জা পেয়ে বলতাম, "খাটতে আমার ভাল লাগে সোমনাথদা।"

—ভাল লাগাটাই তো আসল। সেটাই তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে। যাতে আরও বেশিদিন ধরে ভাল লাগে, সেই চেষ্টা কোরো ভাই।

—আমার লাগবে।

—লাগলে ভাল। আসলে কী জানো, জমা-খরচের হিসাব যে দিন করতে বসবে, সেদিন নাও ভাল লাগতে পারে।

BOIRBOI.NET

কথাগুলো তখন বুঝতাম না। একদিন সুধীন কথাগুলো শুনে ফেলেছিল। সোমনাথদা উঠে যাওয়ার পর আমাকে বলেছিল, "গাণ্ডুটা তোকে কী সব জ্ঞান দিচ্ছিল রে ?"

একজন সিনিয়র লোক সম্পর্কে ওই রকম মন্তব্য শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম, "যাঃ, কী বলছিস তুই ?"

—বলব না মানে ? শালারা চায় না, আমরা দাঁড়াই। আমরা দাঁড়িয়ে গেলে তো ওদের কেউ পুছবে না। যত রকমভাবে পারবে, আমাদের তাই ওরা ডিপ্রেস করার চেষ্টা করবে।

ইভনিং ডেইলির দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে, এখন মাঝেমধ্যে সোমনাথদার কথা খুব মনে পড়ছে। সত্যিই, খবরের কাগজ হল তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের। রোজ রোজ

সমানভাবে কাজ করে যাওয়া কঠিন। প্রায় এক মাস হল সান্ধ্য দৈনিকের সম্পাদনা করছি। সত্যি বলতে কী, আমি একটু হাঁফিয়েই উঠেছি। রবিবার সান্ধ্য দৈনিক বেরোয় না। বাকি ছ'টা দিন খুব টেনশনে থাকি। কাগজের সার্কুলেশন ফিগার এখন আমার আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঝে একটা দিন সার্কুলেশন ড্রপ করে দাঁড়িয়েছিল বারো হাজারে। সেদিন একটা মধুচক্রের খবর ছিল লিড। গণ্যমান্য লোকের সেখানে যাতায়াত। ভেবেছিলাম, খবরটা লোকে খাবে। কিন্তু খায়নি। সেদিনই প্রথম একটা মানসিক ধাক্কা খাই। লোকে কোন খবর নেবে, কোন খবর নেবে না— বোঝা মুসকিল। মাঝে একদিন একটা খবর করেছিলাম, "পণ্ডিচেরির অরবিন্দ আশ্রমে সুচিত্রা সেন।" সেদিন হট কেকের মতো কাগজটা বিক্রি হয়ে গেছিল। নির্মল নাচতে নাচতে এসে বলেছিল, একান্ন হাজার।

এই এক মাসে অনেক কিছু ঘটে গেছে আমার জীবনে। তিনতলার লোকেদের সঙ্গে আমার সম্পর্কে আরও খারাপ হয়ে গেছে। দৈনিক প্রভাতের রিপোর্টারদের ধান্ধাবাজি, আমি একদম বন্ধ করে দিয়েছি। সকালে ওরা যে খবরগুলো বের করছে, তাতে ধান্ধাবাজির গন্ধ পেলে, আমি রিপোর্টার পাঠিয়ে, ঠিক উল্টো খবরটা ছাপছি সান্ধ্য সংস্করণে। যাদের বক্তব্য ওরা ছাপছে না, তাদের ডেকে এনে, খবর ছাপছি। এ নিয়ে অশান্তি চরমে উঠেছিল মাঝে একদিন। এডিটরকে আমি সাফ বলে দিয়েছি, "কাগজ আমাকে বেচতে হবে। আমি কোনও নীতি-ফিতি মানব না।" এডিটরকে এ সব বলার আগে অবশ্য, কথা বলে নিয়েছিলাম দিব্যেন্দু চ্যাটার্জির সঙ্গে। উনি মিটিং ছাড়া সচরাচর অফিসে আসেন না। ওকে ধরা অন্যদের পক্ষে কঠিন। কয়েকটা ঘটনায় এডিটরও বুঝে গেছেন, খোদ মালিকের প্রশ্রয় রয়েছে। অয়ন ব্যানার্জি কারও কথা শুনবে না।

লিফটে ওঠা-নামার সময় পাছে তিনতলার লোকদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, সে জন্য আজকাল আমি সিঁড়ি দিয়ে যাতায়াত করি। দীপেনের চাকরি চলে যাওয়ার পর থেকে অনেকের কাছে আমি ভিলেন হয়ে গেছি। দেখা হলেও, জ্যোতি আমার সঙ্গে কথা বলে না। আমিও বলি না। আমি এখন অ্যাসিস্টান্ট এডিটর। জ্যোতি স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট। ওকে পাত্তা না দিলেও আমার চলে। মাঝে একদিন শুনলাম, প্রেস ক্লাবে মদ খেতে খেতে কুণাল নাকি সবাইকে শুনিয়ে বলেছে, "অয়নের চোখের জল, যদ্দিন আমার প্যান্ট দিয়ে না মোছাতে পারি, তদ্দিন এই প্রফেশনই ছাড়ব না।" শুনে আমি টার্গেট করেছি, শুয়ারের বাচ্চাটাকে যত আগে সম্ভব, দৈনিক প্রভাত থেকে তাড়াব। আজকাল তাই দিব্যেন্দু চ্যাটার্জির কাছে সুযোগ পেলেই জ্যোতির খুব প্রশংসা করি। কানে রোজ রোজ ঢুকিয়ে দিচ্ছি, কুণালের জায়গা নেওয়ার লোক তৈরিই আছে। একটা সময় জ্যোতি আমার উপকার করেছিল। পাল্টা উপকার আমার করা দরকার। জ্যোতি জানুক অথবা না জানুক।

মাঝে একদিন এয়ারকন্ডিশনড মার্কেটে আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছিল পরমা। কিছু জামা-কিনে দেওয়ার জন্য। সেখানে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় মণিকার সঙ্গে। চেহারাটা একদম বদলে গেছে। প্রথমে চিনতেই পারিনি। পরনে মাঝারি দামের তাঁতের শাড়ি। ওদের বাড়িতে, ওর চোখ-মুখে যে ঔজ্জ্বল্য দেখেছিলাম, তা একেবারে নেই। অবাক হয়ে পরমা জিজ্ঞেস করেছিল, "এ কী রে মণি, তোর কী

হয়েছে ? তোকে সিক মনে হচ্ছে ?"

শিলাজিৎ সম্পর্কে পরমাকে কিছু বলিনি। ও কিছুই জানত না। দু'জনে মিলে মণিকাকে নিয়ে বসেছিলাম কাছে একটা রেস্তোরাঁয়। দু'-একটা কথা জিজ্ঞেস করায়, মণিকা কেঁদে ফেলেছিল। কাঁদতে কাঁদতেই বলেছিল, হোটেল সাবরমতীতে শিলাজিৎ আর কৃষ্ণাকে হাতে নাতে ধরে ফেলার দিনই, শিলাজিৎ বাড়িতে এনে তোলে কৃষ্ণাকে। পরদিন সকালে মণিকা এক কাপড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। গিয়ে উঠেছে ওর দাদার বাড়ি। এখন চাকরি খুঁজছে। এয়ারকন্ডিশন্ড মার্কেটের একটা দোকানে সেলসউওম্যানের একটা চাকরির দরখাস্ত করেছিল। তারই ইন্টারভিউ দিতে এসেছে। কথায় কথায় মণিকা সেদিন বলে, "অয়নদা, আপনার উপর জিতের প্রচণ্ড রাগ। কোনওদিন আপনার ক্ষতি করে দেবে।"

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আমার উপর রাগ হওয়ার কারণ।"

—ঝগড়ার সময় আচমকা আপনার কথা বলে ফেলেছিলাম।

—না বললেও পারতে।

—সেটাই বোকামি হয়েছে। আমার তো জীবনটা নষ্ট করে দিলই। ভয় হচ্ছে, আপনার পিছনে না লোক লাগিয়ে দেয়। পয়সা হওয়ার পর থেকে ও বদসঙ্গে মিশছে। আমি বুঝতে পারছি, যে কোনওদিন ও পুলিশের ঝামেলায় পড়ে যাবে।

—এ কথা বলছ কেন মণিকা ?

—জানেন, ওর কোচিং ক্লাসের এত রমরমা কেন ?

—কেন ?

—গত দু'বছর ধরে ও টাকাপয়সা খাইয়ে উচ্চ আর মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে প্রশ্নপত্র বের করে আনছে। সেগুলো বিক্রি করছে ছেলে-মেয়েদের কাছে।

—কী বলছ তুমি ?

—খোঁজ নিয়ে দেখুন। উচ্চ মাধ্যমিক তো এখন চলছে। উচ্চশিক্ষা পর্ষদে গদাধর বারিক বলে একটা লোক আছে, সে-ই ওকে কোয়েশ্চেন পেপার সাপ্লাই করে।

—তুমি ওকে বারণ করোনি কেন মণিকা ?

—অনেকবার করেছি। পয়সা এমন নেশা, ও শোনেনি। ও বাঁচবে না অয়নদা। ধরা একদিন পড়বেই। আমার সুখ শান্তি যে নষ্ট করেছে, ভগবান তাকে শাস্তি দেবে না। আপনি তো জানেন, কোন অবস্থা থেকে ওকে আমি তুলে এনেছি। আমার স্যাক্রিফাইসের কি কোনও মূল্য নেই ?

বলতে বলতে মণিকা কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। পরমা সব শুনে প্রচণ্ড গম্ভীর হয়ে গেছিল। সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, "তুই কিছু ভাবিস না মণি। আমার বাবার অফিসে তোর একটা কিছু হয়ে যাবে।"

মণিকাকে সেদিন ওর দাদার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম আমরা। গাড়ি থেকে নেমে, ও বলেছিল, "হোস্টেলে থাকার একটা ব্যবস্থা করে দেবেন অয়নদা ? আপনার তো অনেক জানাশুনা। দাদার বাড়িতে বেশিদিন থাকা যাবে না।" প্রশ্নটা শুনে চমকে উঠেছিলাম। এই প্রশ্নটাই কিছুদিন আগে আমাকে করেছিল কৃষ্ণা। ঘর ও পেয়ে গেছে। আরেকজনকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে।

মণিকার কথাটা মনে ছিল। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। আমার কাগজে একদিনও পরীক্ষা নিয়ে কিছু বেরোয়নি। সুংযুক্তা মল্লিকের খবরটা নিয়ে কয়েকদিন আমরা এমন চটকেছি যে আর নতুন কিছু নেই। প্রথম যেদিন খবরটা বেরোল, সেদিন রাতেই ফোন করেছিল রহস্যময় সেই লোকটা। "সত্যি আপনার এলেম আছে। এত সুন্দর কভারেজ, ভাবা যায় না।"

—থ্যাঙ্কস। কিন্তু আপনি লোকটা কে, সেই খবরটা দিন ?

—দেব। দেব। এত অধৈর্য হচ্ছেন কেন অয়নবাবু। একদিন আমি নিজেই আপনার কাছে আসব। আমাকে দেখে, তখন আপনি চমকে যাবেন।

—আপনাকে কি আমি চিনি ?

—পুরোটা নিশ্চয়ই না। মানুষ চেনা কি অতই সহজ ? মোটেই সহজ না।

—সংযুক্তা মল্লিকের খবরটা আপনি পেলেন কীভাবে ?

—আমার কন্টাক্ট আছে। সে-ই খবরটা দেয়। পুতান মল্লিকের পিছনে লোক লাগান। অনেক খবরই পাবেন। পোর্ট এরিয়ার দাগী ক্রিমিনালরা সবাই ওর জানাশুনো। লোকটা অনেকভাবে ইনকাম করে। ডিসি পোর্ট এমনি এমনি ওর ফ্ল্যাটে আসত না।

—মার্ডারটা তা হলে কে করেছে ? পুতান মল্লিক ?

—সেটা আপনিই বের করুন। আমি আপনাকে টিপস দিয়েছি। বাকি কাজটা আপনিই করুন। আচ্ছা, ছাড়ি তা হলে ? পরে আবার ফোন করব। গুড নাইট।

... কয়েকটা দিন আমি লোক লাগিয়ে রেখেছিলাম পুতান মল্লিকের পিছনে। রিপোর্টেও সন্দেহটা ছুঁড়ে দিয়েছিলাম ওঁর দিকে। মার্ডারের তৃতীয় দিনেই পুলিশ ওকে গ্রেফতার করে। খুনের রিপোর্টে বারবার মনোরঞ্জন মহাপাত্রের নাম এসে পড়েছে। পুলিশ মহলে যথেষ্ট বেইজ্জত হয়ে যান ডি সি পোর্ট। একদিন তো ফোন করে, মামলার হুমকিও দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি পিছিয়ে আসিনি। সান্ধ্য দৈনিকের সার্কুলেশন আশি হাজারে উঠেছে তখন। পিছিয়ে আসা যায় ?

সংযুক্তা মল্লিকের হত্যারহস্য এই মুহূর্তে ডেড ইস্যু। নতুন কিছু খুঁজছি। মণিকার কথাটাই আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে এখন— প্রশ্নপত্র ফাঁস। শিলাজিৎ প্রশ্নপত্র জোগাড় করে, এই খবরটা পেয়েছি। কিন্তু শুনে তো আর খবরটা করা যাবে না। আমার হাতে প্রমাণ চাই। প্রমাণ। প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে কিছু করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করছিলাম সৌমিত্রদের সঙ্গে। হঠাৎ ও বলে উঠল, "আমাদের পাড়ায় গাইড বলে একটা টিউটোরিয়াল হোম আছে। সেখানকার কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীকে আমি চিনি। সবাই উচ্চ মাধ্যমিক দিচ্ছে।"

গাইড শুনেই চমকে উঠেছি। আমার আসল টার্গেট ওই গাইডই। শিলাজিৎকে টাইট দেওয়ার দরকার আছে। গাইড-এর নাম জানি, এটা বুঝতে না দিয়ে বললাম, "ভেরি গুড। আমরা না হয়, এই গাইড দিয়েই ইনভেস্টিগেশন শুরু করি। সৌমিত্র, ওই ছেলেমেয়েদের কাছে তুমি যাবে। ওদের কাছ থেকে প্রতিটা সাবজেক্টের সাজেশান তুমি নিয়ে আসবে। এখনও পর্যন্ত তিনটে পরীক্ষা হয়ে গেছে। আমি মিলিয়ে দেখতে চাই। গাইড যে সাজেশানগুলো দিয়েছে, তার সঙ্গে কোয়েশ্চেন পেপার মিলছে কি না।

BOIRBOI.NET

—আর দু'দিন পর অঙ্ক পরীক্ষা। সেই সাজেশনটাও কি আনব অয়নদা ?

—অবশ্যই আনবে। কিংশুক, কাল সকালেই তুমি পর্ষদ যাবে। ওখানে গদাধর বারিক বলে একজন এমপ্লয়ি আছে। তার সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে আসবে। আমার কাছে খবর আছে, এই লোকটা প্রশ্নপত্র পাচার-চক্রে ইনভলভড।

সুপর্ণ বলল, "পুলিশের দিক থেকে কি কিছু করণীয় আছে অয়নদা ?"

—দেখো না, তোমার দাদাকে বলে। এই গদাধর লোকটাকে তুলে এনে যদি পুলিশ চাপ দেয়, তা হলে সব ফাঁস হয়ে যাবে।

পাঁচ রিপোর্টার, আমার পঞ্চপাণ্ডব। বেরিয়ে গেছে খবরের খোঁজে। ওদের জন্য অপেক্ষা করছি। বেলা সাড়ে এগারোটা বাজে। এখনও কারও পাত্তা নেই। ওপর থেকে ডি টি পি ইনচার্জ মলয় একবার তাগাদা মারল, "টাইমটা মেনটেন করুন অয়নদা। এরপর দৈনিক প্রভাতের বিজ্ঞাপন কম্পোজ করতে হবে। তখন কিন্তু চেল্লাবেন না।"

লোক কম ডি টি পি-তে। দুপুরের দিকে তাই ওরা বিজ্ঞাপন কম্পোজ করিয়ে রাখে। মিটিংয়ে ঠিক হয়েছিল, সান্ধ্য দৈনিকের কাজ ওরা করবে বেলা বারোটা পর্যন্ত। দু'-একটা বিশেষ কপি, তার পরেও কম্পোজ করা যাবে। কিন্তু একবার ছেলেরা বিজ্ঞাপন কম্পোজ করতে বসলে, অন্য খবর আর ধরবেই না। আজ ফিচার ছাড়া খবরের কোনও কপিই যায়নি ডি টি পি-তে। একটু টেনশনে পড়ে গেলাম মলয়ের তাগাদায়। খবর কিছু হোক বা না হোক, কাগজ আমাকে বের করতেই হবে। এবং তা বেলা সাড়ে তিনটের মধ্যে।

ফোনে ক্রিং ক্রিং শব্দ। নিশ্চয়ই সৌমিত্রদের কেউ। রিসিভার তুলে জিজ্ঞাসা করলাম, "বলো।"

ও প্রান্তে মেয়ের গলা, "কী বলব ?"

—কে বলছেন ?

—বলো তো কে ? গেস।

সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলাম, "ওহ্ সবিতা। কোত্থেকে ?" সারা শরীর চনমন করে উঠল।

—কলকাতা থেকেই।

—কবে এসেছ সবিতা ? আমাকে তো জানাওনি।

—হঠাৎই চলে এলাম।

—প্যারিস থেকে তোমাদের টিম এসেছে ?

—আমি তো আর ফ্রেঞ্চ টিভি-তেই নেই। এখানকার এক বাংলা চ্যানেলে জয়েন করেছি।

—মানে কেডিয়ার চ্যানেলে ?

—ঠিকই ধরেছ। ফ্যাবুলাস অফার পেলাম। আরও এলাম তোমার জন্য। কেমন সারপ্রাইজ দিলাম, বলো।

—দারুণ। কোথায় উঠেছ তা হলে ?

—লেক গার্ডেন্সে। তিনশো তেরো নম্বর। একটা ফ্ল্যাট নিয়েছি। এখন টেলিফোন পাইনি। কয়েক দিনের মধ্যে পেয়ে যাব।

BOIRBOI.NET

লেক গার্ডেন্স শুনেই, আমার মাথা ঘুরে যাওয়ার জোগাড় হল। আর কোথাও ফ্ল্যাট পেল না সবিতা। মনে অস্বস্তি শুরু হয়ে গেল। কেন যেন মনে হতে লাগল, সবিতার কলকাতায় আসাটা অশনিসংকেত। মনে খচখচানি নিয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমাদের চ্যানেলটা কবে ওপেন হচ্ছে সবিতা ?

—মাস তিনেকের মধ্যে। তুমি কখন আসছ, অয়ন ? তোমার খবর বলো।

কী বললাম, নিজেই জানি না। সান্ধ্য দৈনিকের দায়িত্ব পেয়েছি, এই কথাটাও গুছিয়ে বলতে পারলাম না। মন বলল, ভাল হল না।

ভাল হল না। পরমার সঙ্গে আমার বিয়ে আর ঠিক এক মাস পর। এর মাঝে কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না। সবিতার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এতদূর এগিয়েছিল, চট করে ওকে কাটিয়েও দেওয়া যাবে না। খুব বেশিদিন বোধহয় আমার প্লে বয় ইমেজ আড়ালে রাখতে পারব না।

—বিকেলের দিকে একবার আসতে পারবে, অয়ন ?

—কোথায় ? তুমিই এদিকে চলে এসো না। তাজ বেঙ্গলে, সন্ধে সাড়ে ছ'টায় লাউঞ্জে। তারপর সব ঠিক করা যাবে।

—ফাইন। চলে আসছি।

ফোনটা ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। মাথাটা হঠাৎ শূন্য হয়ে গেল। মনে হল, একটা জালে আমি জড়িয়ে যাচ্ছি। সেখান থেকে চট করে বেরিয়ে আসা মুসকিল। সবিতা খুব আপরাইট ধরনের মেয়ে। ও আমার ক্ষতি করে দিতে পারে। একবার বলল, "আরও এলাম তোমার জন্য।" এখানে কাজ শুরু করলে অনেক সাংবাদিকের সঙ্গেই ওর পরিচয় হবে ধীরে ধীরে। পরমার কথা ও জেনে যাবে খুব অল্পদিনে। সাবধান অয়ন, সাবধান।

চোখ বুজে ভবিষ্যতের কথা ভাবছি। হঠাৎ সৌমিত্রর গলা, "অয়নদা, বিরাট খবর। প্রথম দু'টো পরীক্ষার কোশ্চেন পেপারের সঙ্গে গাইডের সাজেশন হুবহু মিলে গেছে। আমাদের আন্দাজ ঠিক।"

সঙ্গে সঙ্গে সবিতার কথা ভুলে গেলাম। ওকে বললাম, "কপি দু'টো সঙ্গে এনেছিস ?"

—হ্যাঁ। সেই সঙ্গে অঙ্কের সাজেশনও নিয়ে এসেছি।

—গুড। কপিটা লিখতে শুরু কর। সুপর্ণ আসুক। দেখি, পুলিশ কী বলে।

—আরেকটা কথা। এই সাজেশানের জন্য ওরা আলাদা করে টাকা নিয়েছে। পুরো সেট হাজার টাকা।

—কপিতে সেটাও লিখবি।

মাথাটা ফের কাজ করতে শুরু করেছে। এই খবর বেরোলে অন্য সব কাগজ সন্ধ্যা বেলায় ঝাঁপিয়ে পড়বে। তার আগেই দাঁও মারা দরকার। টিউটোরিয়াল হোমের একটা ছবি থাকলে ভাল হত। ছাপানো যেত। এই সব ক্ষেত্রে, সুজয় থাকলে খুব কাজ দিত। ফোন করলে একঘণ্টার মধ্যে ছবি এনে দিত। কিন্তু সম্পর্কটা ও নিজেই খারাপ করে রেখেছে। এখন অফিস থেকে ফটোগ্রাফার পাঠিয়ে, সেই ছবি ছাপানো, অসম্ভব।

কাঁচের ফাঁক দিয়ে দেখলাম, সুপর্ণ দৌড়তে দৌড়তে আসছে করিডোর দিয়ে।

চোখমুখে যুদ্ধ জয়ের ছাপ। ওকে দেখেই বুঝলাম, ভাল কোনও খবর আছে। সুপর্ণ ঘরে ঢুকতেই বললাম, "কপিটা তাড়াতাড়ি লিখে ফেল। গদাধর লোকটাকে পুলিশ নিশ্চয়ই ..."

সুপর্ণ অবাক চোখে বলল, "মাই গড, কী করে জানলেন ?"

—আমি জানি। শুধু ছোট্ট করে বল, কী হল।"

—পুলিশের কাছে পরশু একটা কমপ্লেন গিয়েছিল। তারই ভিত্তিতে ট্র্যাক করেছে আজ গদাধরকে। লাকিলি তখন আমি সেখানে।

—ফাইন। তিরিশ সি এম লিখে ফেল। পনেরো মিনিট সময় দিলাম।

—অয়নদা, একটা ছবিও তুলেছি গদাধরের। অবশ্য আমার ক্যামেরায়। জানি না, উঠেছে কি না। শ্যামলদাকে দেব ?

—নিশ্চয়ই। ক্যামেরাটা দে। আমি নিজে নিয়ে যাচ্ছি ফটোগ্রাফিতে।

মনটা হঠাৎ খুশিতে ভরে উঠল। ছেলেগুলো সত্যিই কাজের। আজ সান্ধ্য দৈনিক বাজারে হট কেকের মতো বিকোবে। লাখ চারেক ছেলে-মেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে। এর মধ্যে থার্টি পার্সেন্ট যদি কলকাতায় হয়, তা হল সোয়া লাখ অভিভাবক। একবার রটে গেলে, খবরটা সবাই পড়তে চাইবে। ছবিটা ফটোগ্রাফিতে দিয়ে এসেই পর্ষদে একবার ফোন করতে হবে, অঙ্ক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে কি না, তা জানার জন্য। এই খবরটা জানা খুবই জরুরি। যা কিছু করতে হবে, সবই গোপনে। আর ঘণ্টা তিনেক যাতে কেউ খবরটা না জানতে পারে।

... বেলা ঠিক আড়াইটায় পাতা মেকাপ করে পাঠিয়ে দিলাম প্রসেস ডিপার্টমেন্টে। সৌমিত্র সঙ্গে সঙ্গে গেল। শিখিয়ে দিয়েছি। যতক্ষণ না পাতা নেগেটিভ হয়ে বেরোবে, ততক্ষণ ও ওখানে বসে থাকবে। ওয়ার্কস ম্যানেজার অরবিন্দবাবু আমার খুব কাছের লোক। আমার গল্পের খুব ভক্ত। ওনাকে ফোন করে বললাম, "আজ প্রিন্ট অর্ডার স্বচ্ছন্দে এক লাখ করতে পারেন। দারুণ একটা এক্সক্লুসিভ আছে।" সার্কুলেশনে বসে ছিল নির্মল। ওকে বললাম, "ফিফটি পার্সেন্ট কপি তুই হাওড়া আর শেয়ালদা সেন্টারে পৌঁছে দিবি। যাতে বেশি কপি মফস্বলে যায়, তা দেখবি।"

আর একটা কাজ এখনও বাকি আমার। ফোন করলাম। ও প্রান্তে চেনা গলা শুনতেই নিচু স্বরে বললাম, "আজ একটু হেল্প করতে হবে রে।"

—বলো। তোমার জন্য জান দিতে রাজি।

—তোদের কাগজটা ঘণ্টাখানেক লেট করাতে হবে।

—ভাল কিছু আছে বুঝি ?

—হ্যাঁ। পারবি ?

—কোনও সমস্যাই নয়। রোটারি গড়বড় করে দিচ্ছি।

—গুড। তোর পাওনাটা কাল সকালে এসে নিয়ে যাস। অথবা ছেলেকে পাঠিয়ে দিস আমার বাড়িতে।

—ছেলেকেই পাঠাব।

—ঠিক আছে।

নিশ্চিন্ত হয়ে লাইনটা কেটে দিলাম। ঘরে আরও পাঁচ জন বসে। ওদের দিকে তাকিয়ে বললাম, "আজ যদি লাখে পৌঁছয়, তোদের সবাইকে আমি গ্র্যান্ড হোটেলে

BOIRBOI.NET

ডিনার খাওয়ার।"

চারজন হই হই করে উঠল। প্রজ্ঞা মাথা নিচু করে বসে। ও এই আনন্দে সামিল হতে পারছে না। দেখে বুঝলাম, কেন ও চুপ করে আছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে আজ সবার খবর যাচ্ছে। ও কিছু আনতে পারেনি। সে জন্যই বোধহয় লজ্জা পাচ্ছে। মনে মনে হাসলাম। এই লজ্জাটাই ওকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। ওকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যই বললাম, "প্রজ্ঞা শোন, খবরের কাগজ হল তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের। রোজ রোজ ক্লিক করা সম্ভব না। আজ পারিসনি তো কী হয়েছে। চেষ্টা কর, যাতে কাল পারিস।"

কথাগুলো বলেই আমার সোমনাথদার কথা মনে হল। প্রথম প্রথম, একটা সময় উনিও এই কথাগুলো আমাদের বলতেন। ঘরে সবাই হালকা মেজাজে বসে। ঝকঝকে সব মুখ। দেখেই মনে হয়, উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলে। শেষ পর্যন্ত ক'জন এই প্রফেশনে থাকবে, সন্দেহ আছে। সুপর্ণ কথায় কথায় একদিন বলে ফেলেছিল, আই এ এস পরীক্ষার জন্য ও তৈরি হচ্ছে। প্রজ্ঞা মাঝে একদিন আমেরিকান কনসুলেটে গেছিল, জানি। বোস্টনে চলে যেতে চায় স্কলারশিপ নিয়ে। ভাল ভাল ছেলেরা এখন এই প্রফেশনে আসছে। তবে টিকছে কম।

প্রজ্ঞা একটু লজ্জা পেয়ে বলল, "আমারই ভুল অয়নদা। ঠিক সময়ে আমার বেরিয়ে আসা উচিত ছিল বাড়ি থেকে।"

কাগজ ছাপা হয়ে উপরে আসতে মিনিট কুড়ি দেরি আছে। গল্পের মুডে পেয়ে বসল আমার। বললাম, "শোন, তোদের একটা ঘটনা বলি। খবর পাওয়া কী রকম লাক-এর ব্যাপার। তখন আমি সদ্য প্রফেশনে ঢুকেছি। তোদের মতোই রোজ হন্যে হয়ে ঘুরি। খবরের জন্য। টানা তিনদিন কোনও খবর করতে পারিনি। মনটন খুব খারাপ। একদিন দুপুরে বড়বৌদি বললেন, এয়ারপোর্ট যেতে হবে। পিসি আসবেন লণ্ডন থেকে। নিয়ে আসতে হবে। গেলাম এয়ারপোর্ট। বসেই আছি। প্লেন দু'ঘণ্টা লেট। হঠাৎ দেখা কাস্টমসের এক অফিসারের সঙ্গে। আমাকে দেখেই বললেন, "কী কাণ্ড দেখুন অয়নবাবু। ইন্ডিয়ান বাস্কেটবল টিম খেলতে যাচ্ছে ব্যাঙ্কক। ম্যানেজার লোকটা কিছু অ্যান্টিক ছবি পাচার করছে টিমের সঙ্গে।" সঙ্গে সঙ্গে খবরটার পিছু নিলাম। বিরাট খবর। ফ্রন্ট পেজের। জয়পুরের মহারানির মহল থেকে ছ'টা দুষ্প্রাপ্য ছবি ম্যানেজার সঙ্গে নিয়ে ব্যাঙ্কক যাচ্ছিলেন বিক্রি করার জন্য। ম্যানেজার ভদ্রলোক, নামটা এখন আর মনে নেই, ছিলেন জয়পুরের লোক। সেই খবরটা করে বাড়ি ফিরলাম, রাত দশটায়। মনেও নেই, আসলে পিসিকে আনতে গেছিলাম এয়ারপোর্ট থেকে।"

সৌমিত্র বলল, "বাড়ির লোকেরা রেগে যাননি?"

—রেগেছিল। পিসি নিজে দু-চারদিন কথা বলেনি আমার সঙ্গে। কী জানিস, সেটাও তুচ্ছ মনে হয়েছিল, পরদিন খবরটা ফার্স্ট পেজ অ্যাঙ্কর হতে দেখে। ওটাই একজন রিপোর্টারের কাছে সব থেকে বড় আনন্দ।

কিংশুক বলল, "অয়নদা, লাক বললেন কেন? সোর্স-টাও তো বড় ব্যাপার। কাস্টমসের ওই অফিসারকে যদি আপনি না চিনতেন, খবরটা কি তা হলে পেতেন?

—অ্যাবসুলিটলি রাইট। বড় কথা হচ্ছে, সোর্স। যে রিপোর্টার যত বেশি সোর্স

BOIRBOI.NET

তৈরি করতে পারে, সে অন্যদের থেকে তত এগিয়ে রাখবে নিজেকে। আর হচ্ছে গোপনীয়তা। আজকের কথাটাই ধর। এই যে কোশ্চেন পেপার ফাঁস, খবরটা। জানলাম কী করে। নিশ্চয়ই কেউ আমাকে বলেছে। তার নামটা জীবনেও কেউ আমার মুখ দিয়ে বলাতে পারবে না।

গল্প করতে করতেই সান্ধ্য দৈনিক এসে গেল। ফ্রন্ট পেজটা দারুণ লাগছে। বাঁ দিকে লিড খবর, 'উচ্চ মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র ফাঁস।' তার তলায়, 'সন্দেহ দক্ষিণ কলিকাতার এক কোচিং সেন্টারের দিকে।' ওপরে ডানদিকে গদাধরের ছবি। পাশে সিঙ্গল কলম হেডিং 'চক্রের নায়ক গদাধর ?'-তিনটে খবর বক্সের মধ্যে। আর্টিস্টকে দিয়ে ভাল লে আউট করিয়েছে সৌমিত্র। ছেলেটার সেন্স আছে।

কাগজ খুঁটিয়ে দেখার পর রিপোর্টারদের বললাম, "কাল রোববার। কাগজ নেই। আজকের মতো কাল-পরশুও তোদের একই বিট। তবে সোমবার সকালে আমাকে জানাবে কে কী পেলে।"

দল বেঁধে ওরা বেরিয়ে গেল। ঘরে একা বসেই রইলাম। মনের মধ্যে টেনশন। আজ বড় একটা ঝড় গেল। রোজ রোজ চটকাদরি খবর করা যে কী কঠিন, সেটা এখন টের পাচ্ছি। আগেই বোধহয় ভাল ছিলাম। রোজ একটা-দু'টো কপি আনতাম। লিখতাম। ফেলে দিতাম চিফ রিপোর্টারের টেবলে। দায়িত্ব বলে আর কিছু ছিল না। এখন সান্ধ্য দৈনিকের সব দায়িত্ব আমার। কদ্দিন টানতে পারব, সন্দেহ আছে।

ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। রিসিভার তুলতেই, ও প্রান্তে শর্মিলার গলা, "অয়নদা, একটা সাহায্য চাইব, করবেন ?"

জার্মানি থেকে ফিরে আসার পর এই প্রথম শর্মিলা আমাকে ফোন করল। মেট্রো রেলে এখন আর অফিসে আসি না। তাই ওর সঙ্গেও দেখা হয় না। বললাম, "কী দরকার, বলো।"

—আপনার কাগজে দুর্দান্ত একটা খবর দেখলাম। গদাধরের ঠিকানাটা একটু দেবেন ?

দিতে পারতাম। কিন্তু হঠাৎই দীপেনের কথা মনে পড়ল। বললাম, "খবরটা করেছে সুপর্ণ। ও জানে। এই মাত্র বেরিয়ে গেল।"

হতাশ গলায় শর্মিলা বলল, "ইস। ওর বাড়িতে কি ফোন আছে ?"

—নেই। থাকলেও ওকে পেতে না। রাত দশটার আগে এই সব ছেলে-ছোকরা আজকাল বাড়ি ঢোকে না। তা, তুমি ফিরলে কবে ?

—দিন পনেরো আগে। আপনার খুব উন্নতি হয়েছে শুনলাম। ইউ ডিজার্ভ ইট অয়নদা। আমি খুব খুশি। জার্মানি থেকে সামান্য একটা জিনিস এনেছি আপনার জন্য। রোজই সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি। আপনার দেখাই পাচ্ছি না ফেরার পর থেকে।"

—ফোন করলে পারতে।

—করেছি। অফিসে, বাড়িতে বেশ কয়েকবার। আপনি কি এখন একবার বেরোতে পারবেন ? আমি তা হলে আসছি মেট্রোর নীচে।

কী মনে হল, বললাম, "আসছি। ঠিক মিনিট পাঁচেক পর।"

লাইনটা ছেড়ে দিয়ে টেবলটা গুছিয়ে নিলাম। আজকের মতো অফিসে আর ফিরব

না। অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়া দরকার। তিনতলা থেকে ডাক আসতে পারে। এডিটর ডেকে বলতে পারেন, মর্নিং এডিশনের জন্যও কিছু তথ্য দিয়ে দাও। হরগিজ দেব না। তিন তলায় এত রিপোর্টার। খেটে খাক। কাগজের মর্নিং এডিশনের জন্য আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। ওদের সার্কুলেশন যেদিন টপকে যাব, সেদিন তিনতলায় উঠে কুণালের পাছায় একটা লাথি মেরে আসব। সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে।

মারুতি নিয়ে বেরিয়ে এলাম মেট্রোর সামনে। একটু দূরে সাবওয়ে তৈরি হচ্ছে। রাস্তা ভাঙাচোরা। গাড়িটা দাঁড় করাতেই পিছন থেকে হর্ন। বিরক্ত হয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালাম। ব্যালকনির নীচে প্রচুর লোক। সারাদিনই ভিড়। আমার সামনেই অল্পবয়সী এক হকার চেঁচাচ্ছে, "জোর খবর। প্রশ্নপত্র ফাঁস।" শুনে হাসলাম। হাঁটতে হাঁটতে মেট্রোর নীচে যেতেই দেখতে পেলাম শর্মিলাকে। ওর আগুন ঝরা রূপ দেখে সারাটা শরীর কেমন করে উঠল। সামনে গিয়ে হাসিমুখে বললাম, "চলো।"

শর্মিলা বলল, "কোথায় ?"

—তোমাদের বাড়িতে। একদিন নিয়ে যাবে বলেছিলে।

বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মাঝে দাঁড়িয়ে শর্মিলা। কী যেন একটু ভেবে বলল, "সত্যি যাবেন ? চলুন তা হলে। বাড়িতে ফিরে অফিসে একবার ফোন করে দেব।"

দু'জনে এসে বসলাম মারুতিতে। কী করছি, কেন করছি জানি না। বিকেল সাড়ে চারটে বাজে। আর কিছুক্ষণ পরেই সবিতা এসে আমার জন্য বসে থাকবে তাজ বেঙ্গলের লাউঞ্জে। পরমার ফোন আজ আসেনি। যে মেয়ে রোজ রোজ ফোন করে, সে কেন আজ ফোন করেনি, তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই। আর পাঁচ মিনিট পর, আমি কী করব, তাও জানি না। এক্সিলেটরে চাপ দিয়ে আমি ছুটলাম রাসবিহারীর দিকে। আমার পাশে বসে আছে পুতুল পুতুল এক যুবতী। অন্য কিছু ভাবার সময় আমার নেই। মিনিট পঁচিশ পর মুক্তাঙ্গনের কাছে গিয়ে শর্মিলা বলল, "অয়নদা, বাঁ দিকে।"

গাড়িটা বাঁ দিকে রাস্তায় ঘুরিয়ে দিলাম। দু'-তিনটে বাড়ি পেরোতেই শর্মিলা ফের বলল, "দাঁড়ান। ডান দিকেরটাই আমাদের বাড়ি।"

বাইরে লোহার সিং দরজা। সামনে অনেকটা লন। একটু পুরনো আমলের, কিন্তু ঢুকেই মনে হল বেশ বনেদি। কয়েক পুরুষের বাস। লনে ইতালিয়ান স্ট্যাচু। ফোয়ারা। ভেতরে ঢুকেই মনে হল, এই বাড়িতে ব্যস্ততা বলে কিছু নেই। সব কিছু রুচিসম্পন্ন। বর্মা টিকের ফার্নিচার, তাতে বেলজিয়াম কাচের ছড়াছড়ি। বসার ঘরে একটা ঝাড়লণ্ঠনও চোখে পড়ল। মেঝেতে পার্সিয়ান কার্পেট। পুরনো আমলের সোফা। দেওয়ালে বড় বড় অয়েল পেন্টিং। চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে ঠাট্টা করে বললাম, "শর্মিলা, তোমার মতো মেয়ের চাকরি করার কোনও দরকার আছে ?"

শর্মিলা হেসে বলল, 'মাও তাই বলে। কিন্তু বসে থেকে করবটা কী বলুন তো ?"

কথাটা ও শেষ করতে না করতেই, ঘরে ঢুকলেন বয়স্কা একজন মহিলা। এক সময় যে অসামান্য রূপসী ছিলেন, এখনও তা বোঝা যায়। গায়ের রঙ ইউরোপিয়ানদের মতো। কপালে সিঁদুরের একটা টিপ। পরনে সাদা তাঁতের শাড়ি।

শর্মিলা পরিচয় দিয়ে দিল, 'মা, অয়নদা।"

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, "দেখেই বুঝেছি। তোর কাছে এত গল্প শুনেছি, চিনতে মোটেই অসুবিধা হল না।"

আমি বললাম, "মাসিমা একটা কথা বলব ?"

—কী বাবা।

—আপনাদের সময়ে যদি মিস ইন্ডিয়া কনটেস্ট থাকত, তা হলে কেউ আপনাকে হারাতে পারত না।

শর্মিলা খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "দারুণ হত কিন্তু তা হলে।"

ভদ্রমহিলা লজ্জা পেয়ে বললেন, "বসো বাবা। হুট করে চলে যেও না। শর্মি, আমি আসছি।" পর্দা সরিয়ে উনি ভেতরে চলে গেলেন।

সোফায় বসে বললাম, "শর্মিলা, তোমাদের বাড়িতে আর কে কে আছেন ?"

—কেউ না। আমি, মা আর বাবা। এত বড় বাড়ি। অথচ লোক নেই। বাবাকে মাঝেমধ্যে বলি, বিক্রি করে দাও। অথবা প্রোমোটারকে দিয়ে দাও। অ্যাপার্টমেন্ট করুক। দু'টো ফ্ল্যাট দিক একটা ফ্লোরে। আমাদের হয়ে যাবে।"

—খারাপ না আইডিয়াটা। এখন তো অনেকেই এ রকম করছে। এ জায়গাটা খুব কস্টলি। টাকা তো পাবেই, প্লাস ফ্ল্যাট।

—বাবা রাজি হচ্ছে না। বলছে, আমরা যদ্দিন বেঁচে আছি, তদ্দিন অ্যাজ ইট ইজ থাকুক। পরে সবই তো তোর হবে। যা ইচ্ছে করিস।

—তুমি কি সিরিয়াসলি জার্নালিজম প্রফেশনে থাকবে, শর্মিলা ?

—ইচ্ছে তো ছিল। কিন্তু এত টেনশন আমি নিতে পারছি না। এ ল্যাঙ মারামারি, আর ভাল লাগছে না অয়নদা। সব থেকে খারাপ, সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট। প্রেস কনফারেন্সে গেলে ভিড়ের মাঝে যা করে অন্যরা। বলতে খারাপই লাগছে।

—যাঃ ওসব নিয়ে ভেবো না। সব প্রফেশনেই ল্যাঙ মারামারি আর এসব আছে।

—এতটা নেই। জানেন, জার্মানি থেকে ফেরার পর রিপোর্টিংয়ে অনেকেই আমার সঙ্গে কথা বলছে না।

—স্বাভাবিক। তার মানে, তুমি এগোচ্ছ।

—কী জানি। আচ্ছা অয়নদা, দীপেনদার সঙ্গে কি আপনার কিছু হয়েছে ?

—সে রকম কিছু না। কেন বলো তো ?

—সেদিন আমাদের অফিসে এসে আপনার নামে যা তা বলছিল।

—কী বলছিল ?

—আপনার নাকি কে একজন সুন্দরী গার্লফ্রেন্ড আছেন। তাকে সামনে রেখে অফিসে আপনি পটিয়েছেন একজন ডিরেক্টরকে।

—আটারলি ননসেন্স। জানো, দীপেনের চাকরি চলে গেছে।

—শুনলাম। আপনিই নাকি ওর চাকরি খেয়েছেন। দীপেনদা অফিস থেকে চলে যাওয়ার পর প্রসূনদা সবাইকে বলছিল, এই শয়তানগুলো অয়নের মতো একটা ভাল ছেলের পিছনে শুধু শুধু লেগেছে।

BOIRBOI.NET

—আমাদের প্রফেশনে এ সব হ্যাসেলস থাকবেই শর্মি। তোমাকে তার মধ্যে দিয়েই এগোতে হবে। যে ভাল লেখে, ভাল খবর আনতে পারে, তাকে কেউ আটকাতে পারে না। যাক, অন্য কথা বলো। কাগজের বাইরে অন্য কিছু। সে জন্যই তোমার সঙ্গে সময় কাটাতে এলাম।

শর্মি নামটা আমার মুখে শুনে শর্মিলা একটু চমকে উঠল। তারপর বলল, "এই রে, আসল জিনিসটাই আপনাকে দিতে ভুলে গেছি।" বলেই সোফায় রাখা ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে একটা রঙিন প্যাকেট বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিল। তারপর মুখ নিচু করে বলল, "এখন খুলবেন না প্লিজ। পকেটে রাখুন।"

শর্মিলার মুখই বলে দিল, কেন ও এই অনুরোধ করছে। দশ বছর আগে, লেক গার্ডেন্সেও একজন এই রকম একটা প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে আমাকে একই অনুরোধ করেছিল। না, আমি আর ঝামেলায় নিজেকে জড়াতে রাজি নই। সবিতাকে নিয়ে একটা বিপদের জালে ইতিমধ্যেই জড়িয়ে গেছি। মুখে অবশ্য কিছু প্রকাশ করলাম না।

প্যাকেট হাতে নিয়ে বললাম, "থ্যাঙ্কস।"

... ঘণ্টাখানেক পর শর্মিলাদের বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে এলাম, তখন রাস্তায় লাইট জ্বলে গেছে। সারা কলকাতার লোক, এতক্ষণে নিশ্চয়ই জেনে গেছে, শিলাজিতের কুকীর্তি। রাসবিহারীর মোড় থেকে অপূর্ব মিত্তির লেনের গাইড এমন কিছু দূরে নয়। পুলিশ কি ওখানে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে? একবার মনে হল, মারুতি চালিয়ে পাশ দিয়ে যাই। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলাম। চেতলা ব্রিজের কাছে খবরের কাগজের বড় একটা স্টল আছে। গাড়িটা সেখানে একবার দাঁড় করালাম। এ সব সেন্টার থেকেই আঁচ পাওয়া যাবে, সান্ধ্য কেমন বিক্রি হয়েছে। স্টলের সামনে গিয়ে খুঁজতে লাগলাম, আমাদের সান্ধ্য এডিশন। চোখে পড়ল না। দেখে মনটা খুশিতে ভরে উঠল। ফের মারুতির দিকে পা বাড়াতেই কে যেন বলে উঠল, "অয়নবাবু, একটু দাঁড়াবেন?"

গলাটা শুনেই মনে হল, কোথায় যেন আগেও দু'-তিনবার শুনেছি।

॥ ষোলো ॥

BOIRBOI.NET

পরনে সিল্কের নীল পাঞ্জাবি, পাজামা। ব্যাক ব্রাশ চুল। সুপুরুষ লোকটা ফের বলে উঠল, "চিনতে পারছেন না বুঝি। আমি বাদশা। ওরফে সুশান্ত চক্রবর্তী।"

নামটা শুনেই হঠাৎ বুকের রক্ত চলকে উঠল। এই সেই বাদশা! মাস দু'য়েক আগে ফোন করেছিল? জীবনে একবারই মাত্র দেখেছিলাম ছেলেটাকে। সেই বাদশা তো দেখতে এ রকম ছিল না! চার বছর আগের সেই চেহারাটা, মনে করার চেষ্টা করলাম। সেদিন লালবাজারের পুলিশ মারতে মারতে নিয়ে এসেছিল ক্ষয়াটে শরীরের একটা ছেলেকে। প্রায় আমারই সমবয়সী। ধর্ষণকারী শুনে, ঘৃণায় বেশিক্ষণ তাকাতে ইচ্ছে করেনি।

বাদশার পাশেই একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎই নজরে পড়ল। কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে সেও আমার দিকে তাকিয়ে। পরনে সালোয়ার-কামিজ। ম্যাচ করা সাদা

ওড়না। সিঁথিতে সিঁদুরটা দেখেই মনে হল, খুব বেশিদিন বিয়ে হয়নি। মেয়েটা বেশ ফর্সা। আলগা চটক আছে মুখশ্রীতে।

মিটিমিটি হাসতে হাসতে বাদশা বলল, "ভালই হল, আপনার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত দেখা হল। অনেকক্ষণ ধরে পিছু নিয়েছি। এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে আগে আপনার আলাপ করিয়ে দিই। আমার স্ত্রী। সুমনা চক্রবর্তী। কি, নামটা মনে পড়ছে? যাকে রেপ করার অভিযোগে, আমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ... একটা সময় আপনি আদা-জল খেয়ে লেগেছিলেন।"

কাগজের স্টলে আরও দু'-তিনজন দাঁড়িয়ে ম্যাগাজিনে চোখ বোলাচ্ছে। তাদের মধ্যে কেউ কথাগুলো শুনেছে কি না লক্ষ করে, বললাম, "তুমি ভুল বলছ বাদশা। অভিযোগটা আমি করিনি। অভিযোগটা কিন্তু করেছিল সুমনার বাবা।"

—কারেক্ট। কেন করেছিলেন, তা জানার চেষ্টা কি কখনও আপনি করেছিলেন?

—দরকার বোধ করিনি।

বাদশার গলায় চ্যালেঞ্জের সুর লক্ষ করে একটু দৃঢ়ভাবেই কথাটা আমি বললাম। দীর্ঘদিন লালবাজার বিটে রিপোর্ট করেছি। বহু অপরাধীকে চোখের সামনে দেখেছি। এদের সঙ্গে নরমভাবে কথা বললেই, মুসকিল। কোনও মতেই জানতে দেওয়া চলবে না, ভয় পেয়েছি। প্রশ্নটা উড়িয়ে দিতে দেখে, হাসল বাদশা। তারপর বলল, "শুনেছি, আপনি নাকি খুব ডেয়ারিং টাইপের রিপোর্টার। ভয়টয় পান না। আমার একটা কথা রাখবেন অয়নবাবু? প্লিজ, চলুন না, বসি কোথাও? সব কথা আপনাকে বলি। আপনাদের মতো রিপোর্টারদের সামান্য ভুলের জন্য, কত লোকের কত ক্ষতি হয়ে যায়, সেগুলি একটু বলি।

ওকে জ্ঞান দিতে দেখে, একটু কড়াভাবেই বলে উঠলাম, "দেখো বাদশা, আমার এখন সময় নেই।"

ধৈর্যচ্যুত হল না বাদশা। কথাটা শুনে ফের হাসিমুখে বলল, "ভয় পেয়ে গেলেন নাকি অয়নবাবু? আমার সঙ্গে কিন্তু কোনও আর্মস নেই। চেক করে দেখতে পারেন। আপনার ক্ষতি করার ইচ্ছে থাকলে, সঙ্গে স্ত্রীকে নিয়ে বেরোতাম না। চলুন না, আপনারই পছন্দমতো কোনও জায়গায়? সব কথাগুলো আপনার কিন্তু শোনা দরকার।"

বাদশা কথা বলছে খুব মার্জিত ভঙ্গিতে। আর পাঁচটা লোক যেভাবে কথা বলে আমাদের সঙ্গে। ইচ্ছে করলে, এই জনাকীর্ণ এলাকার মধ্যে থেকেও, ও আমাকে তুলে নিয়ে যেতে পারে। হাত কাটা নীলু মাঝে অবশ্য একদিন বলেছিল, বাদশার মাজায় এখন সেই জোর নেই। কিন্তু এ সব অ্যান্টিসোসাল লোকদের বিশ্বাস নেই। সত্যি বলতে কী ওকে দেখে এখনও পর্যন্ত নিরীহ লোক বলেই মনে হচ্ছে। প্রথম দিকে মনে যে অস্বস্তিটা হচ্ছিল, সেটা এখন নেই। বরং আমার একটু রাগই হচ্ছে, ও সময় নষ্ট করছে বলে।

কী বলতে চায় বাদশা? ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই একটা আইডিয়া খেলে গেল মাথায়। শোনাই যাক না। এই বাদশাকে নিয়েই তো কাল সান্ধ্য দৈনিকে একটা স্টোরি করা যেতে পারে। 'জেল-ফেরত ধর্ষণকারীর স্বীকারোক্তি' ধরনের কোনও স্টোরি। যাকে ধর্ষণ করার অভিযোগে একজন সমাজবিরোধী চার বছর জেল

খেটে এল, তাকে বিয়ে করল ফিরে এসে— এ রকম ঘটনা সমাজে সচরাচর ঘটে না। কথাটা মনে হতেই বললাম, "ঠিক আছে, চলো। লেক ক্লাবে গিয়ে বসি। আমি কিন্তু আধঘণ্টার বেশি সময় দিতে পারব না। আমার জন্য একজন অপেক্ষা করবেন, তাজ বেঙ্গলে।"

বাদশা বলল, "জানি। আপনি যেমন অন্যদের খবর রাখেন, আপনার খবরও তেমন আমরা কিছু রাখি।"

—তার মানে ?

—সেটাও না হয়, চলুন, বসেই শুনবেন। লেক ক্লাবে আমি কোনওদিন যাইনি অয়নবাবু। আমার সঙ্গেও মারুতি রয়েছে। আপনি আগে চলুন। আমরা পিছনে পিছনে যাচ্ছি।

রাসবিহারীর মোড় থেকে লেক ক্লাব, এমন কিছু দূরে নয়। মিনিট সাতেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম। সবে সন্ধে হয়েছে। এখনও মেম্বাররা আসতে শুরু করেনি। বিকেলের প্র্যাকটিস সেরে, জল থেকে বোটগুলো তুলে আনছে কয়েকটা ছেলে। একদিন আমিও এখানে প্র্যাকটিস করতাম। কত সহজ আর সুন্দর ছিল সেই সব দিন। ভাবতেই ভাল লাগল।

জলের ধারে পাতা চার-চেয়ারের একটা টেবলে গিয়ে বসলাম। একজন দাগী অপরাধীর সঙ্গে ক্লাবে বসে কথা বলছি, এ কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না আমি দু'দিন আগেও। মনে ফের অস্বস্তিটা শুরু হল। সেটা চাপা দেওয়ার জন্যই বললাম, "আমি একটু বিয়ার নেব। তুমি ?"

—খেতে পারি। তবে পেমেন্ট কিন্তু আমি করব।

—ঠিক আছে। ও সব নিয়ে ভেবো না।

হাত নেড়ে একজন ওয়েটারকে ডাকলাম। তারপর বিয়ারের অর্ডার দিয়ে বললাম, "বলো, তোমার কী শোনানোর আছে।"

—অয়নবাবু, রেপ কেসে আমাকে যেদিন পুলিশ লালবাজারে নিয়ে যায়, তার পরদিন আপনি অ্যান্টি রাউডির ঘরে বসেছিলেন, মনে আছে ? সেদিন বারবার আমি একটা কথাই বলেছিলাম, সুমনাকে ডাকা হোক। ডাকলেই ও সত্যি কথা বলবে। সেদিন কিন্তু পুলিশ আমার কথা শোনেনি। উল্টে, রসিয়ে রসিয়ে আপনাকে বলেছিল, ফোন করে ফটোগ্রাফার ডাকতে।

বললাম, "মনে আছে ?"

—পরদিন কাগজে আপনি ফলাও করে ছাপলেন, 'ধর্ষণের অভিযোগে বাদশা গ্রেফতার।' খোঁজখবর নিলেন না। ভিক্টিম যে, তার সঙ্গেও কথা বললেন না। স্পটে না গিয়ে, খবরটা ছাপিয়ে, আমার সর্বনাশ করে দিলেন।

—কিন্তু এটাও তো সত্যি যে, তোমার নামে একটা অভিযোগ হয়েছিল। তোমাকে পুলিশ গ্রেফতারও করেছিল।

কথাটা পাত্তাই দিল না বাদশা। বলল, "ধর্ষণ কথাটার মানে কী, অয়নবাবু ? আপনি তো লেখাপড়া জানা লোক। আমার চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষিত। কোর্টে দিনের পর দিন, কথাটা শুনে, আমি যে মানেটা বুঝেছি, তা হল, ইচ্ছের বিরুদ্ধে, বলপূর্বক নারী সংসর্গ। আমি কি সেটা করেছিলাম ? জিজ্ঞেস করুন তো, সামনেই

BOIRBOI.NET

সেই ভিক্টিম। না, ও লজ্জা পাবে না। সারা জীবন ও বস্তির পরিবেশে মানুষ হয়েছে। কোনও কিছুতেই আর এরা লজ্জা পায় না।

মাথা নিচু করে বাদশার কথা শুনছে সুমনা। দেখা হওয়ার পর থেকে ও একটা কথাও বলেনি। ওর সামনে এই অপ্রিয় আলোচনা বন্ধ করার জন্যই বললাম, "সামান্য এই কথা শোনানোর জন্যই কি তুমি আমাকে ডেকেছ বাদশা ?"

—সামান্য কথা নয় অয়নবাবু। আমার জীবনের চারটে বছর নষ্ট করে দিয়েছেন আপনি। অ্যান্টি সোসাল আমি হতে চাইনি। আমাকে করে দেওয়া হয়েছিল একটা সময়। একদম বচ্চনের হিন্দি ফিল্ম। বিশ্বাস করুন, ওই ঘটনার পাঁচ বছর আগে থেকে সুমনার সঙ্গে আমার লাভ অ্যাফেয়ার ছিল। স্বীকার করছি, সেই সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কও ছিল। তবে ওর অসম্মতিতে নয়। ওদের পুরো সংসারটা চলত আমার রোজগারে। বিয়ের উদ্যোগও নিয়েছিলাম। কর্পোরেশন ইলেকশনটা হয়ে গেলেই আমরা বিয়ে করে ফেলতাম। কিন্তু সুদর্শন মিত্তির তখন সেটা হতে দিল না।

—কে সুদর্শন মিত্তির ? কাউন্সিলার ?

—চেনেন তা হলে। ওয়ার্ডের লোকেরা ... সেবার চাইছিল ইলেকশনে আমি দাঁড়াই। দাঁড়ালে শালা জিততে পারত না। তিন মাস আগে ও একবার বাড়ি বয়ে এসে শাসাল। বলল, ইলেকশন-ফিলেকশনে দাঁড়ালে ও আর প্রোটেকশন দেবে না। তবু আমি গোঁ ধরে রইলাম। শালা, হাত কাটা নীলুকে আমার পিছনে লাগিয়ে দিল। তিনদিন টানা বোমাবাজি হল এলাকায়। থেমে যাওয়ার পর কী হল, জানি না, এক রাতে সুমনার বিছানা থেকে পুলিশ আমাকে তুলে নিয়ে গেল। পরে শুনলাম, হাত কাটা নীলু সুমনার বাবাকে বেদম পিটিয়েছে। ভয় দেখিয়ে আমার নামে রেপ চার্জ এনেছে। সুমনাকে পাঠিয়েছে পুলিশ হাসপাতালে। সেই সময়ে আমার এলাকায় একবার গেলেই, এই খবর আপনি পেয়ে যেতেন। কিন্তু আপনি গেলেন না। সুদর্শন মিত্তিরের কথা শুনে, আমাকে বাঁশ দিয়ে দিলেন।

—সুমনাই বা তখন কেন সত্যি কথা বলল না ?

—পুলিশের ভয়ে। সেন্ট্রালের ডি সি তখন মনোরঞ্জন মহাপাত্র। সুদর্শনের টাকা খেয়ে সুমনাকে প্রচণ্ড ভয় দেখিয়েছিল লোকটা। বিনা দোষে আমার শাস্তি হয়ে গেল। জেলে বসে দু'টো ডিসিশন নিলাম। এক বদলা নেব।

অয়ন ব্যানার্জি আর মনোরঞ্জন মহাপাত্রকে এমন শিক্ষা দেব যে, জীবনেও তা ভুলবে না। দুই, বোমাবাজি, গুণ্ডামি আর করব না। যা করব, একদম ঠাণ্ডা মাথায়, নিঃশব্দে। এবং শত্রুকে জানিয়ে।

বাদশার কথাটা শুনে হঠাৎই আমার বুকটা কেঁপে উঠল। তবু বুঝতে না দিয়ে বললাম, "তুমি ভুল ডিসিশন নিয়েছ বাদশা। আমাকে তুমি কিচ্ছু করতে পারবে না।"

বাদশা কিছু বলতে যাচ্ছিল, ওয়েটারকে বিয়ারের বোতল নিয়ে আসতে দেখে চুপ করে গেল। সুমনা দূরে রেল লাইনের লাল সিগন্যালের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। স্বল্পালোকেও দেখলাম, ওর মুখটা খুব বিষণ্ণ। এই মেয়েটার প্রতি সহানুভূতিতেই বাদশাকে একটা সময় আমি ভিলেন বানিয়ে দিয়েছিলাম। মোট তিনদিন রিপোর্ট করেছিলাম ওকে নিয়ে। সত্যি বলতে কী, প্রথমে খবরটা কিন্তু দিয়েছিল সুদর্শন

মিত্তিরই।

গ্লাসের বিয়ার এক চুমুকে শেষ করে বাদশা বলল, "ভুল আপনি বললেন অয়নবাবু। আমি কিন্তু অনেক দূর এগিয়েছি। গত দু'টি মাস ছায়ার মতো আপনার গতিবিধি লক্ষ রেখেছি। আপনার এক ফটোগ্রাফার এখন আমার খুব বন্ধু। সুজয়... যাকে আপনিই এই প্রফেশনে এনেছিলেন। বন্ধুত্বটা কীভাবে হল, সেটাও আপনাকে জানিয়ে দিই। ওই ছেলেটা এন্টালি এলাকায় একটা স্টুডিও করতে চাইছিল। আপনি তো জানেন, ওই এলাকায় আমিই বস। কিছু করতে হলে আমাকে খুশি করা দরকার। তো, কথা বলতে গিয়ে আমি জেনে গেলাম... ছেলেটা আপনার খুব শুভানুধ্যায়ী। ও-ই তখন আমাকে যোগাযোগ করিয়ে দেয় আপনার বস কুণালের সঙ্গে। পরে খোঁজ নিয়ে দেখলাম, সুজয়ের মতো শুভানুধ্যায়ী, আপনার অনেক আছে।

—তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ, বাদশা। ভুল করছ।

—ভুল আমি আর করছি না। আপনি করেছেন। একের পর এক ভুল। নম্বর এক, সংযুক্তা মল্লিকের আত্মহত্যাটা মার্ডার বলে চালিয়েছেন। দিনের পর দিন, আপনি লিখে গেছেন ভুল তথ্য। ভুলে নিশ্চয়ই যাননি সেই লোকটার কথা ; যে প্রথম আপনাকে ফোন করে খবরটা দিয়েছিল।

—সেই লোকটা তাহলে তুমি ?

—হ্যাঁ। গলাটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারেননি। পারার কথাও নয়। আমি গলা নকল করতে ওস্তাদ। আন্ডারওয়ার্ল্ডের লোক আমরা। আমাদের প্রায়ই এটা করতে হয়। আপনার সামনে, আপনারই গলা নকল করে, আপনার বাড়িতে এখনই খবর দিতে পারি, আজ আপনি বাড়ি ফিরবেন না। সে সব যাক, কথা হচ্ছে, সংযুক্তা মল্লিকের খুন নিয়ে। আপনাকে জানিয়ে রাখি, সংযুক্তা মল্লিক আদৌ খুন হননি। ওনার কিডনিতে ক্যান্সার হয়েছিল। সেটা জানার পর উনি আত্মহত্যাই করেন।

—বাদশা, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করছি না। পুলিশ তাহলে পুতান মল্লিককে গ্রেফতার করল কেন ?

—স্মাগলারদের হাত থেকে ওকে বাঁচানোর জন্য। আপনি বিশ্বাস করলেন, কী করলেন না, তাতে আমার কিচ্ছু এসে যায় না। আসল তথ্যটা জেনে রাখুন। সংযুক্তা দেবীর আত্মহত্যার তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে, পুতান মল্লিক পোর্ট এরিয়ায় স্মাগলিং র‍্যাকেটের সঙ্গে যুক্ত। তখন চাপ দিয়ে সেই র‍্যাকেট সম্পর্কে পুলিশ কিছু জেনে নেয় পুতান মল্লিকের কাছ থেকে। কয়েকজন স্মাগলার ধরাও পড়ে। স্মাগলারদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই পুলিশ ওকে ভেতরে রেখেছে। এই ব্যবস্থাটা করে দিয়েছেন ডি সি পোর্ট।

—তুমি যে সত্যি কথা বলছ, তার কী প্রমাণ আছে ?

—আছে। প্রমাণ আছে। কাল সকালেই এই সব খবর ফলাও করে বেরোচ্ছে দৈনিক প্রভাতে। আপনার খবর কন্ট্রাডিক্ট করে। কুণালবাবু দু'জন রিপোর্টারকে দিয়ে এই খবর বের করেছেন। একটা কথা, আপনার মনে হয়তো প্রশ্ন জাগছে, কেন আপনাকে ভুল খবরটা দিলাম। মনে আছে অয়নবাবু, ফোনে একদিন আপনার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, আপনারা যে কত ভুল খবর লেখেন, একদিন তা প্রমাণ করে

দেব। দিলাম তো, বলুন ? এখন ঝড় সামলাবার জন্য তৈরি হোন। মানহানির মামলা হচ্ছে আপনার বিরুদ্ধে। দশ লাখ টাকার। করছেন পুতান মল্লিক ও ডি সি পোর্ট। বোধহয় আজকালের মধ্যে পৌঁছেও যাবে ওদের উকিলের চিঠি। খোঁজ করে দেখতে পারেন আপিসে।'

বাদশা নিছক ভয় দেখানোর জন্য বলছে, না সত্যি, বুঝতে পারছি না। অবিশ্বাসও করছি না। হতেও পারে। কাগজের বিরুদ্ধে এসব মামলা, চট করে মেটে না। কুড়ি-পঁচিশ বছর লেগে যায়। কিন্তু সত্যি যদি মামলা হয়, তাহলে অফিসে আমার সুনাম নষ্ট হবে। এটাই খচখচ করতে লাগল মনের মধ্যে। শালা কুণাল, আমার খবর কন্ট্রাডিক্ট করবে ওর কাগজে। এদ্দিন আমি ওকে এক্সপোজ করেছি। এবার ও সুযোগ পেয়েছে। আমার পিছনে লাগবে। এডিটরকে বোঝাবে, রিপোর্টার হিসাবে আমি কত আনাড়ি। কেন একটা ফোন কল বিশ্বাস করে, খবরগুলো ওইভাবে করতে গেলাম, এখন সেটা মাথায় ঢুকছে না। বাদশা ছেলেটা ডেঞ্জারাস ধরনের। এটা বিশ্বাস হতে থাকল। তবে একটা কথা জানতে ইচ্ছে করল, সংযুক্তা মল্লিকের আত্মহত্যার কথা পুলিশ জানার আগে ও কোত্থেকে জানল ?

প্রশ্নটা করতেই বাদশা হো হো করে হেসে উঠল। তারপর বলল, "এই কথাটা বলিনি, না ? তা হলে শুনুন, পুতান মল্লিককে সেদিন একটা খবর দিতে গেছিলাম। আমাদেরই এক ডন-এর রিকোয়েস্টে। গিয়ে দেখি, সংযুক্তা মল্লিকের বডি ঝুলছে। সেদিন দরজা ভেজিয়ে ফিরে আসি। তখনই মনে হয়, খবরটা আপনাকে দেওয়া দরকার। আপনি কত বড় ক্রাইম রিপোর্টার, সেটা টেস্ট করা দরকার। হা হা হা, আপনি ফেল। ডাহা ফেল।"

বাদশা বিয়ারে চুমুক দিচ্ছে। আর খুব সাধারণভাবেই বলে যাচ্ছে এসব কথা। আমার শরীরে চিনচিনে একটা রাগ হচ্ছে। ইচ্ছে করছে, লাফিয়ে উঠে ওর গলাটা টিপে ধরি। কিন্তু না, আমি তা করব না। আমি আবার সাংবাদিক অয়ন হয়ে গেলাম। পাত্তা না দেওয়ার ভঙ্গিতে বললাম, "আমার এক নম্বর ভুলটা তো শুনলাম। দু' নম্বরটা কী ?"

—সেটা আরও মারাত্মক। শুনে আঁতকে উঠবেন। আপনার আর সবিতা মেমনের কয়েকটা ছবি আমার কাছে আছে। যা কিনা, আর কয়েক ঘণ্টা পরেই পৌঁছে যাবে, বিশেষ একটা ঠিকানায়। ছবিগুলো কে দিয়েছে, আশা করি সেটা নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবেন না। আপনি বুদ্ধিমান লোক। আমার বলার দরকার নেই।

ঠাণ্ডা গলায় বললাম, "সুজয় ?"

—ঠিক ধরেছেন। সুন্দরবনের নদীতে দু'জনে জলকেলি করার সময় এমন মত্ত ছিলেন, লক্ষই করেননি, টেলিলেন্স দিয়ে কেউ আপনাদের ছবি তুলছে। আপনার সময়টা এখন খারাপ যাচ্ছে। ভীষণ খারাপ। চাকরিটা বোধহয় আপনার যাবে। সেই সঙ্গে একমাস পর পরমা চ্যাটার্জিকে বিয়ে করার সুযোগও। বদলাটা আমি ভালই নিলাম, কী বলেন ? এখনও অবশ্য পুরোটা নেওয়া হয়নি। কাল সকালের মধ্যে তা হয়ে যাবে।

—ব্ল্যাকমেল করছ বাদশা ? মনে রেখো, এক মাঘে শীত যায় না। আমারও কিছু ক্ষমতা আছে।

—চটছেন কেন? এও তো এক ধরনের খেলা। প্রথম রাউন্ডটা আপনি জিতেছেন। দ্বিতীয় রাউণ্ডে আমি। খেলাটা তৃতীয় রাউন্ডে গড়াবে কি না, ভবিষ্যৎই বলবে। আমাকে চার বছর জেল খাটিয়েছেন। আপনাকে যদি মিনিমাম ছয় বছর না খাটাই, তাহলে আর বদলা নিলাম কী? একটা কথা বলি। অয়নবাবু, আপনাদের পেশাটা মহৎ। কিন্তু আপনারা খারাপ। হাতে কলম আছে। তাই বলে যা খুশি তাই লিখবেন, এটা বন্ধ করা দরকার।

—তোমার আর কিছু বলার আছে, বাদশা?

পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করে বাদশা বলল, "না, আর কিচ্ছু বলার নেই। এই প্যাকেটটা নিয়ে যান। ওই ছবিগুলোর একটা সেট আপনার কাছেও না হয় থাকুক। এতদিন আপনি অনেক খবর করেছেন, অয়নবাবু। কাল থেকে আপনি নিজেই খবর হয়ে যাবেন।"

বলেই বাদশা উঠে দাঁড়াল। এক চুমুকে গ্লাসের বাকি বিয়ার শেষ করে দিয়ে, শিস দিয়ে ডাকল ওয়েটারকে। পকেট থেকে পার্স বের করে দু'টো একশো টাকার নোট টেবলে রেখে বলল, "বিয়ারের দামটা দিয়ে গেলাম। বাকিটা তুমি নিও।" তারপর সুমনার হাত ধরে বেরিয়ে গেল লেক ক্লাব থেকে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম চেয়ারে। হাতকাটা নীলু একবার বলেছিল, বাদশা অর্ডিনারি ক্রিমিনাল নয়। ও সাপের চেয়েও খারাপ। জেল থেকে বেরিয়ে ও কিন্তু ছোবল আপনাকে মারবেই। সাবধানে থাকবেন। ঠিক তাই হল। বারবার ও বলে গেল, "কাল বুঝতে পারবেন।" কী বোঝাবে ও আমাকে? "কাল থেকে নিজেই খবর হয়ে যাবেন।" এই কথাটারই বা অর্থ কী? ছবিগুলো ও পাঠাবে একটা ঠিকানায়। নিশ্চয়ই পরমার কাছে। তার মানে, গত দু'মাস ধরে বাদশা আমার সব দুর্বল জায়গায় খোঁজ খবর নিয়েছে। এবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমাকেও পাল্টা কিছু করতে হবে।

মাথাটা সাফ করার জন্য, একা একাই আরেকটা বিয়ার শেষ করলাম। টেবলের ওপর পড়ে আছে সেই প্যাকেট। কী আছে, তা দেখার জন্য তুলে নিলাম। ছয়-সাতটা ছবি। সবিতা আর আমি কোমর জলে দাঁড়িয়ে। পাতলা একটা পাঞ্জাবি সবিতার গায়ে। আমি জল ছেটাচ্ছি। পাঞ্জাবিটা ভিজে গেছে। স্তন দু'টো দৃষ্টিকটুভাবে দৃশ্যমান। পরের ছবি, পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়েছি সবিতাকে। ও ঠোঁট বাড়িয়ে দিয়েছে চুমুর জন্য। তৃতীয় ছবিটা চুমু খাওয়ার দৃশ্য। চতুর্থটি, আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় জল থেকে লাফিয়ে উঠছি। আর দেখতে ইচ্ছে করল না। এর একটা ছবি পরমার হাতে পৌঁছলে, জীবনে ও আর আমার মুখই দেখবে না।

কোনও ছবিই সুপার ইম্পোজ করা নয়। চন্দ্র-সূর্যের মতোই সত্যি ওই মুহূর্তগুলো। অস্বীকার করব কী করে? বাস্টার্ড সুজয় এই ছবিগুলো ঠিক লোকের হাতেই তুলে দিয়েছে। ওকে পরে শায়েস্তা করা যাবে। এখন পরমাকে সামলাব কী করে? আজ সারা দিনে কিন্তু একবারও ফোন করেনি ও। ছবিগুলো কি ওর হাতে পৌঁছে গেছে? কথাটা ভাবতেই সারা শরীর হিম হয়ে গেল। যে মেয়ে ইদানীং দিনে পাঁচবার ফোন করে, সে কেন ফোন করবে না? আশঙ্কা থেকে ধীরে ধীরে ক্রোধ সারা শরীরে ছড়িয়ে গেল। পরমাকে যদি হারাতে হয়, তাহলে বাদশাকে আমি ক্ষমা করব

না। ওকেও আমি চরম শিক্ষা দেব। ওকে জানিয়ে দেব, একজন সাংবাদিক যদি খারাপ হয়, তার চেয়ে বড় ক্রিমিনাল আর হতে পারে না।

ভেতর ভেতর অস্থির হয়ে উঠলাম। একটা কিছু করা দরকার। পরমা মুখ ফিরিয়ে নেওয়া মানেই, অনিবার্য পতন। দিব্যেন্দু চ্যাটার্জিও সরে যাবেন আমার পাশ থেকে। এত কষ্ট করে সান্ধ্য দৈনিকটা দাঁড় করালাম। তার উপর আর আমার কোনও কর্তৃত্বই থাকবে না। সবার আগে মানহানির ওই মামলার ব্যাপারটা। হতেও পারে। কাগজ বিক্রি করার নেশায় তখন এমন মশগুল ছিলাম, আইনগত কোনও চিন্তাই করিনি। সামান্য সূত্র পেলেই, সংযুক্তা হত্যারহস্য হেডিং দিয়ে, যা খুশি তাই লিখে দিয়েছি।

ওয়েটার আরেক বোতল বিয়ার দিয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, "ক্লাবের ফোন ঠিক আছে ?"

—আছে অয়নদা। সেক্রেটারির ঘরে যান।

হাতঘড়িতে দেখলাম, প্রায় সাড়ে সাতটা। এতক্ষণে সুদীপ্তরা নিশ্চয়ই ঘরে তাস খেলতে বসে গেছে। ওখান থেকে ফোন করা যাবে না। এখুনি কয়েকটা ফোন করা দরকার। পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যে বোতলটা শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। টলতে টলতেই বেরিয়ে এলাম লেক ক্লাব থেকে। বাস্টার্ড সুজয় আমাকে শেষ করে দিল। মনে পড়ছে, সব মনে পড়ছে। মারুতির ভেতর বসে স্টিয়ারিংয়ে মাথা রেখে আমি সেদিনের কথা সব মনে করতে লাগলাম। জলদস্যু জগু সর্দারের ছবি তুলে, সেদিন বিকেলেই কুলতলি থেকে রওনা দিয়েছিল সুজয়। বলেছিল, ভিডিও ক্যাসেট শেষ হয়ে গেছে। কলকাতায় গিয়ে আরও কয়েকটা নিয়ে আসতে হবে। ওর ফেরার কথা ছিল পরদিন বিকেলে কৈখালির কাছে জেলেদের একটা গ্রামে। আমরা সকালেই পুলিশ লঞ্চ নিয়ে চলে যাব সেই গ্রামে। ও আসবে ভটভটি ভাড়া করে। পরদিন সকালে সবিতা আর আমাকে, লঞ্চের সারেঙ পৌঁছে দিলেন জেলেদের গ্রামে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গ্রাম ঘোরা হয়ে গেল। পুরুষরা সবাই মাছ ধরতে গেছে সমুদ্রে। সবিতা মেয়ে এবং বয়স্কদের ইন্টারভিউ নেওয়ার পর হঠাৎ আমাকে বলল, "এই, নদীতে স্নান করবে ? চলো না, খুব মজা হবে।" সঙ্গে সঙ্গে কিটব্যাগ থেকে তোয়ালে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম। নদীর পারে চিংড়ি মাছ ধরছিল কিছু মেয়ে। ওরা বলল, মিঠে জল। স্নান করতে পারেন।

মাতলার একটু দূরেই সেই নদী। বেশ গভীর। দু'জনে সাঁতার কাটতে কাটতে অনেক দূর চলে গেলাম। কিছুক্ষণ পর বোধহয় হাঁফ ধরেছিল সবিতার। বলেছিল, "আমাকে একটু ধরো অয়ন, হাত-পা ভারী হয়ে গেছে।" ওর পরনে সেদিন পাতলা একটা পাঞ্জাবি। স্নান করতে নামার জন্যই সম্ভবত অন্তর্বাস পরেনি। ওকে পিঠে নিয়ে, সাঁতার কেটে কোনওরকমে আমি পারে এসেছিলাম। আমারও হাঁফ ধরে গেছিল। আমিও গোড়ালি জলে বসে পড়েছিলাম। আমার পাশে শুয়ে সবিতা। উর্ধ্বাঙ্গ প্রায় অনাবৃত। চোখ বুজে ও রৌদ্র স্নান করছিল।

আগের দুটো রাত, আমরা পরস্পরের শরীর থেকে সুখ আদায় করেছি। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। সবিতার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার সেই সুখ নেওয়ার প্রবল একটা ইচ্ছে হচ্ছিল আমার। নির্জন প্রকৃতির মাঝে, সেই লোভ চাগাড় দিয়ে উঠতেই সবিতা বলে উঠেছিল, "না অয়ন এখন না।" নদীর পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে

আমরা ফিরে এসেছিলাম জেলেদের গ্রামে। তারপর ঘণ্টাখানেক ধরে দু'জনে স্নান করেছিলাম। দূর থেকে একটা ভটভটি যাচ্ছিল সেই সময়। আমরা তা দেখেও দেখিনি। সম্ভবত, সেই ভটভটি থেকে থ্রি হান্ড্রেড টেলি লেন্স দিয়ে আমাদের অন্তরঙ্গ ছবিগুলো তোলে সুজয়। ছেলেটা এত নোংরা, ভাবতেও পারিনি। অথচ একটা সময় ওকে দাঁড় করানোর জন্য আমি কী না করেছি! খবরের কাগজে অবশ্য এটাই নিয়ম। আমি যার জন্য যত বেশি করব, সে-ই প্রথম ছুরিটা আমাকে মারবে।

বাইরে বেরিয়ে মারুতিতে বসে এক মুহূর্ত ভাবলাম। যা হয় হোক, আজ... এখুনি পরমাদের বাড়িতে যাব। ও অপমান করলেও সহ্য করব। মনে মনে কে যেন বলল, "ফেস ইট অয়ন, ফেস ইট।" সবিতার সঙ্গে যখন আমার সম্পর্কটা তৈরি হয়, তখন পরমার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্কই ছিল না। তা হলে আমার অপরাধটা কোথায়? মনে মনে যুক্তি তৈরি করার চেষ্টায় আমি ভাবলামও এ কথা। কিন্তু বড় দুর্বল মনে হল, সেই যুক্তি। যদি উল্টোটা হত? রাহুলের সঙ্গে পরমার এইসব অন্তরঙ্গ ছবি যদি কেউ আমার কাছে পাঠাত, আমি কি এই সব যুক্তি তখন মানতাম? মোটেই না।

কথাটা ভাবতে ভাবতেই মারুতি চালিয়ে দিলাম, লেক গার্ডেন্সের দিকে। আমি নিশ্চিত, ছবিগুলো পরমার হাতে পৌঁছে গেছে। দুঃখে, অপমানে ও হয়তো আবার কিছু করে বসেছে। হতেও পারে। যদি তেমন কিছু হয়, তবে আমি বাড়ি ফিরব কী করে? জানাজানি হবেই। বড়দা— বড়বৌদি— বুবুন, একটা সময় সবাই সব জেনে যাবে। কেউ তখন আমাকে ক্ষমা করবে না।

লেক ক্লাব থেকে লেক গার্ডেন্স খুব কাছে। মিনিট চারেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম পরমাদের বাড়ি। একটা আলোও জ্বালা নেই। কেমন যেন নিঝুম হয়ে আছে। মারুতি থেকে নেমে, লোহার গেট সরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। সম্ভবত, এই আমার শেষ ঢোকা। একটু পরেই বেরিয়ে আসব মাথা নিচু করে। কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলে দিল বিভা। কাজের মেয়ে। বুকের ভেতর দমাদম কেউ হাতুড়ি পিটছে। দম বন্ধ করে বললাম, "কেউ নেই?"

—না, দাদাবাবু।

—কোথায় গেছে?

—ও বাড়িতে। এসো ভেতরে এসো।

ও বাড়ি মানে, শ্যামবাজারে পৈতৃক বাড়িতে। ভেতরে ঢুকে সোফায় বসলাম। বিভা একটু কুণ্ঠার সঙ্গে দাঁড়িয়ে। বললাম, "কখন গেছে ওরা?"

—দুপুর বেলায়। হঠাৎ খবর এল ঠাকুর্দার খুব শরীর খারাপ। তখন সবাই দৌড়ে গেল।

শ্যামবাজারের বাড়িতে পরমার ঠাকুর্দা ও ছোটকাকারা থাকেন। পালা-পার্বণে বা কারও অসুখ-টসুখ হলে এরা ও বাড়িতে যান। পরমা অবশ্য পছন্দ করে না। বলে, ও বাড়িতে খুব ধুলো-বালি। নিশ্চয়ই ঠাকুর্দা গুরুতর অসুস্থ। সেজন্যই গেছে।

—দাদাবাবু, সরবত এনে দিই?

—না রে। ও বাড়িতে ফোন আছে কি না জানিস?

—আছে। তবে এখন লাইন খারাপ। বাবু একবার ফোন করেছিল বিকেলে। ডাক্তারখানা থেকে। বলল, ঠাকুর্দার অবস্থা ভাল না। ফিরতে একটু রাত হবে।

উফ্, ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। ও বাড়িতে লাইন খারাপ। এই কারণেই পরমা আজ ফোন করার সুযোগ পায়নি। পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছলাম। ভীষণ জল তেষ্টা পাচ্ছে। একটু আগে সরবত এনে দেওয়ার কথা বলেছে বিভা। এটা এ বাড়ির দস্তুর। যখনই আসি, পরমার মা সবার আগে সরবত এনে খাওয়ান। বিভা জানে, আর কয়েকটা দিন পর এ বাড়ির আমি জামাই হচ্ছি। তাই ও আপ্যায়নের ত্রুটি রাখেনি। আমাকে ঘামতে দেখে নিজেই ফের বলল, "দাদাবাবু, এসো বসো। আমি সরবত এনে দিচ্ছি।"

সোফার সামনে সেন্টার টেবল। তাতে পা তুলে, গা এলিয়ে দিলাম। আমি কী করব, জানি না। এ বাড়িতে আর কোনওদিন আসতে পারব কি না, কে জানে? একদিকে সবিতা, অন্য দিকে পরমা। তাজ বেঙ্গলে অপেক্ষা করে করে সবিতা নিশ্চয়ই আজ ফিরে গেছে। অবশ্যই অবাক হয়েছে। ফোন করতেও পারে বাড়িতে। এই লেক গার্ডেন্সেরই কোনও বাড়ির একটা ফ্ল্যাটে উঠেছে ও। নম্বরটা মনে আছে, তিনশো তেরো। হঠাৎই মনে হল, ওর সঙ্গে একবার দেখা করা উচিত। আজ রাতেই যদি পরমার কথা সব খুলে ওকে বলি, তাহলে কেমন হয়? সব শুনে কী করতে পারে সবিতা? ও আর পাঁচটা মেয়ের মতো নয় যে, কান্নাকাটি করবে। পোড় খাওয়া মেয়ে। সব জেনে হয়তো, নিজেকে সরিয়ে নিতেও পারে। ওর পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। মন থেকে কে যেন বলল, "যা অয়ন, সময় নষ্ট করিস না।"

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। সেন্টার টেবল থেকে পা সরাবার সময় কী একটা পড়ে গেছিল। সেটা তোলার জন্য নীচে তাকাতেই দেখি একটা প্যাকেট। কার্পেটের ওপর থেকে সেটা তুলে আনতেই, লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল। এই সেই প্যাকেট, যা আমার জীবন বরবাদ করে দিতে পারত। খামের উপরে টাইপ করা পরমার নাম। ঠিকানা। হাত দিয়েই বুঝতে পারলাম, ভেতরে ছবি।

—দাদাবাবু, সরবত নাও।

চমকে তাকিয়ে দেখি বিভা। ওকে দেখেই জিজ্ঞেস করলাম, "এই প্যাকেটটা কবে এসেছে রে?"

—বিকেলের ডাকে। লেটার বক্সে পড়েছিল।

—এটা আমি নিয়ে গেলাম। দিদিমণিকে বলিস।

এক চুমুকে সরবতটা, শেষ করে ফেললাম। আহ্, কী শান্তি। ঈশ্বর নিশ্চয়ই আছেন। না হলে, এভাবে প্যাকেটটা আমার হাতে পড়ত না। ওটা পকেটে চালান করে বললাম, "দিদিমণিকে বলিস, আমি এসেছিলাম। যখনই আসুক, রাত্তিরে যেন আমাকে একবার ফোন করে। না হলে আমি ঘুমোতে পারব না।"

—বিভা মুচকি হেসে বলল, "বলে দেব।"

পরমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়েই আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। রাত প্রায় ন'টা। সবিতার ফ্ল্যাটে একবার ঢুঁ মারা যেতে পারে। আমার আশায় ও এসেছে। ভুলটা ভেঙে দেওয়া দরকার। খুঁজতে খুঁজতে তিনশো তেরো নম্বর বাড়িটায় পৌঁছে গেলাম। ছোট্ট একটা পার্ক। তার পাশেই চার তলা বাড়ি। একদম নতুন। কোন ফ্ল্যাটটা সবিতার, জানি না। বাড়ির আশপাশে কেউ নেই। গাড়ি থেকে বেরিয়ে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকতে যাওয়ার সময়ই পার্কের দিক থেকে চাপা

স্বরে কে যেন ডেকে উঠল, "অয়নদা, এদিকে আসুন।"

ঘাড় ঘোরাতে, প্রথমেই নজরে পড়ল পাঞ্জাবির ঢলঢলে একটা হাতা। চমকে উঠলাম। হাত কাটা নীলু? এখানে কী করছে? তারপর ব্যস্ততার সঙ্গে বলল, "মারুতিতে উঠে পড়ুন। না হলে বিপদে পড়ে যাবেন।"

দ্রুত মারুতিতে ফের ঢুকে পড়লাম। গাড়ি স্টার্ট দিতেই নীলুও উঠে পড়ল পাশের সিটে। পার্ক পেরিয়ে গলির মুখে পৌঁছতেই দেখি, একটা পুলিশ ভ্যান ঢুকছে। সেটা দেখে নীলু বলে উঠল, "থামবেন না অয়নদা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এখান থেকে বেরিয়ে চলুন।"

স্টিয়ারিংয়ে হাত কাঁপছে। নীলুর উদ্বেগ দেখে ঘাবড়ে গেছি। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই রেল লাইন পেরিয়ে এলাম। লেক ক্লাবের পাশ দিয়ে সাদার্ন অ্যাভেনিউর কাছে আসতেই বললাম, "কী হয়েছে নীলু, বলো তো?"

—মার্ডার।

—মার্ডার? কে মার্ডার হয়েছে?

—আপনি যার ফ্ল্যাটে যাচ্ছিলেন অয়নদা, সেই মেয়েটা।

—কী বলছ তুমি নীলু?

—ঠিকই বলছি। মেয়েটা শুধু মার্ডারই হয়নি। প্রথমে ওকে রেপ করা হয়েছে। তারপর...।

—কে ওকে রেপ করেছে নীলু? আমার শরীর থরথর করে কাঁপছে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা থামিয়ে দিলাম মেনকা সিনেমার উল্টোদিকে তারপর বললাম, "প্লিজ, আমাকে সব বলো তো খুলে।"

—অয়নদা, সেদিনও আপনাকে বলেছিলাম, বাদশা ডেঞ্জারাস লোক। ও বুদ্ধি দিয়ে লড়ে। যে চালটা ও চেলেছিল, আপনি শেষ হয়ে যেতেন। আপনাকে আগে বলেছি, আমার একটা লোক ওর দলের মধ্যে আছে। সে-ই এসে বিকেলের দিকে খবর দিল, বাদশা আজ অ্যাকশনে যাচ্ছে। শাকালু বলে একজনকে ও তাজ বেঙ্গলে পাঠাচ্ছে। একটা মেয়েকে সেখান থেকে তুলবে।

তারপর তাকে কোথাও নিয়ে গিয়ে মার্ডার করবে। বাদশা নিজে স্পটে থাকবে না। কাজ করাবে শাকরেদদের দিয়ে। খবর পেয়ে লোক লাগালাম শাকালুর পেছনে। আর নিজে গিয়ে বসে রইলাম তাজ বেঙ্গলের লাউঞ্জে। শাকালুকে আমি চিনি। মেয়েটাকে যখন ও তুলবে, তখন ওর পিছু নেওয়া যাবে। বাদশাকে ফাঁসাবার জন্যই, লোকজন ছড়িয়ে রাখলাম। তখনও জানি না, এটা আপনার ব্যাপার।"

সন্ধে ছ'টা নাগাদ শাকালু এসে বসল লাউঞ্জে। মিনিট পাঁচেক পরেই একটা মেয়ে একা এসে ঢুকল হোটেলে। মেয়েটা এদিক ওদিক তাকিয়ে, শেষে বসল একটা সোফায়। একটু পরেই, একটা ছেলে এসে কথা বলল ওই মেয়েটার সঙ্গে। মনে হল, ছেলেটা ফটোগ্রাফার। কাঁধে একটা ব্যাগ ছিল। মেয়েটাকে কয়েকটা ছবিও দেখাল। কেন জানি না, আমার মনে হল, ছেলেটা শাকালুকে চেনে। মেয়েটাকে চিনিয়ে দেওয়ার জন্যই হোটেলে এসেছে। শাকালুর সঙ্গে ওর চোখাচোখিও হল দু'একবার।"

এতটা শোনার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেমন দেখতে বলো তো ছেলেটা?"

—মাঝারি হাইট। ঝাঁটা চুল। বড় গোঁফ।

শুনেই বুঝলাম, সুজয়। বাস্টার্ড এত নীচে নেমে গেছে? নীলুকে বললাম, "তারপর কী হল?"

—ছেলেটা হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা টাটা সুমোয় চেপে বসল। আমার লোক সঙ্গে সঙ্গে ওর পিছু নিল। আমি দেখলাম, শাকালু উঠে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটার কাছে গিয়ে কী যেন বলছে। মেয়েটা ওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। আমিও পিছু নিলাম। শাকালু একটা মারুতি নিয়ে গেছিল। মারুতি নিয়ে আমিও ওকে তাড়া করলাম। ঘুরতে ঘুরতে শেষে ওদের মারুতিটা এসে দাঁড়াল লেক গার্ডেন্সের ওই বাড়িতে। আমি মারুতি ছেড়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম পার্কের মধ্যে। আধ ঘণ্টা পর শাকালু বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। ও চলে যাওয়ার পরই আমি ঢুকলাম মেয়েটার ফ্ল্যাটে। দেখি, খাটের উপর হাফ নেকেড হয়ে পড়ে রয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে রেপড হয়েছে। একবার দেখেই বুঝতে পারলাম, শাকালু মেয়েটাকে মেরে দিয়েছে। গলায় সিল্কের দড়ির ফাঁস লাগিয়ে।

মেয়েটার হাতে একটা প্যাকেট। বিছানা আর মেঝেতেও কয়েকটা ছবি ছড়িয়ে ছিটিয়ে। একটা তুলে দেখতেই আমি অবাক। মেয়েটার সঙ্গে আপনার ছবি। তাড়াতাড়ি সব ছবি কুড়িয়ে নিলাম। মেয়েটার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে দেখলাম, দু'টো নেম কার্ড। একটা আপনার। অন্যটা সুজয় বসু নামে কে এক ফটোগ্রাফারের। আপনার নেমকার্ডটা তুলে নিলাম। তারপর ভাল করে চারদিকে একবার তাকিয়েই, দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে এলাম। মেয়েটা বোধহয় আজই বাইরে থেকে এসেছিল। সুটকেসও খোলেনি।"

—পার্কের ভেতর বসে তুমি কী করছিলে নীলু?

—আমার মারুতির জন্য ওয়েট করছিলাম। আর তখনই দেখি, আপনি। ভগবান আপনাকে আজ বাঁচিয়ে দিলেন। আপনি যদি ওই ফ্ল্যাটে ঢুকতেন, পুলিশের হাতে ধরা পড়তেন। আমিও যদি ওই ফ্ল্যাটে না ঢুকতাম, আপনার ছবি পুলিশে পেয়ে যেত। আননেসেসারি হ্যারাস করত আপনাকে।

—কিন্তু পুলিশকে খবরটা দিল কে নীলু?

—কে আবার, বাদশা। শাকালু ফিরে গিয়ে ওকে খবর দিতেই, বাদশা মওকা ছাড়েনি। ওর উদ্দেশ্যটা আপনি বুঝুন। পুলিশ এসে যদি আপনার ছবি পেত, তাহলে ধরে নিত, মেয়েটার সঙ্গে আপনার ফিজিক্যাল রিলেশন ছিল। কোনও কারণে আপনি রেগে গিয়ে মেয়েটাকে রেপ করেছেন। তারপর মার্ডার। প্ল্যানটা বাদশা ভালই করেছিল। কিন্তু সাকসেসফুল হল না।

নীলুর কথা শুনে আমি শিউরে উঠলাম।

॥ সতেরো ॥

—অয়ন ওঠো, রমার ফোন।

বড়বৌদির গলা। শুনেই চোখ মেলে তাকালাম। কাল রাতে ঘুম হয়নি। সারা রাত দুশ্চিন্তা করে কাটিয়েছি। ভোর বেলায় পাখির কিচির মিচির শুনতে শুনতে

হঠাৎই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পাখির ডাক শোনার সুযোগ আমাদের হয় না। বাড়ির পাশেই একট কৃষ্ণচূড়া গাছ আছে। জানতামই না, সেখানে এত পাখি আছে।

চোখ কটকট করছিল। তবুও উঠে, হাত বাড়িয়ে কর্ডলেসটা নিলাম। বড়বৌদির হাতে চায়ের কাপ। টেবলের উপর কাপটা রেখে বেরিয়ে গেল। পরমা ফোন করলে ইদানীং বড়বৌদি আশপাশে থাকে না। ফোনে বললাম, "কোত্থেকে বলছ ?"

—বাড়ি থেকে। কাল এত রাতে ফিরেছি, তোমাকে আর ডিসটার্ব করলাম না। নিশ্চয়ই টায়ার্ড হয়ে ফিরেছ।

—তোমার ফোনের জন্য রাত সাড়ে চারটে অবধি আমি জেগে ছিলাম রমা।

—ইস্ আমার এত খারাপ লাগছে... বিভা বলল, কালকে তোমার মনটা নাকি ভাল ছিল না... দেখো, কখখনও আমার এ ভুল হবে না। বাইরে বেরিয়ে যদি একটা ফোন করতাম... আসলে দাদুকে নিয়ে তখন সবাই এমন ব্যতিব্যস্ত...

—জানো, কাল দুপুরে তুমি ফোন করোনি বলে আমার লাঞ্চও খাওয়া হয়নি। সারাটা দিন আমার বিচ্ছিরি গেল।

—আজ কী করছ ?

—আমি তো ভাবছিলাম, সকালে উঠেই লেক গার্ডেন্সে দৌড়ব। ক'টা বাজে এখন ?

—সাড়ে ন'টা। সত্যি আসবে ? মা-বাবা এখনই বেরিয়ে যাচ্ছে শ্যামবাজারে। আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।

—তোমার দাদুর কী হয়েছে রমা ?

—স্ট্রোক। তবে মাইল্ড ধরনের। জানো কাল রাতে জ্ঞান ফেরার পর ইশারায় দাদু কী বলেছে ? হাত নেড়ে জানতে চাইছিল, অয়ন কই। তোমাকে খুব দেখার ইচ্ছে, এতবার যেতে বলল, তুমি একবারও গেলে না। আজ তুমি যাবে, অয়ন ? চলো না। খুব খুশি হবে মানুষটা।

—কিন্তু অফিস ?

—আজ তোমার অফিস কই ? আজ তো রোববার। উফ্, কবে কোন বার সেটাও তুমি মনে রাখতে পারো না। তোমাকে নিয়ে আমি সারাটা জীবন চলব কী করে অয়ন ?

—কাল যা দুশ্চিন্তায় ফেলেছিলে, নিজের নামটা কেউ জিজ্ঞাসা করলে, ভুল বলতাম।

BOIRBOI.NET

পরমা আদুরে গলায় বলল, "বাবা রে বাবা। একদিন একটা ভুল হয়েছে, আর সেটাই পাঁচবার শোনাচ্ছ। আচ্ছা বাবা মাফ চাইছি। হল তো ?"

—এভাবে মাফ চাইলে হবে না।

—কীভাবে চাইতে হবে মশাই ?

—ঘণ্টা দেড়েক পরে আসছি। তখন দেখাব।

—কোনও লাভ হবে না। তোমার সব দুষ্টুমি এক মাসের জন্য বন্ধ।

—ভুল বললে। আঠাশ দিন চৌদ্দ ঘণ্টা।

—সময় কাটছে না বুঝি ?

—তোমার ?

—একদম না। আমার খালি মনে হচ্ছে, এর মধ্যে একটা খারাপ কিছু ঘটে যাবে। তোমায় আমি আর পাব না। এই দেখো না, দাদুর যদি কিছু হয়...

কথাটা শুনে হঠাৎই বুকটা ধক করে উঠল। খারাপ তো একটা কিছু ঘটেই গেছিল। ও টের পেল না। ওর দাদুর যদি অসুখ না করত, ওরা যদি শ্যামবাজারে না যেত, তা হলে আজ এভাবে ও ফোনই করত না। বাদশার পাঠানো প্যাকেটটা এখনও আমার পকেটে। ফোনটা ছেড়ে, প্রথমেই ওই ছবিগুলোর একটা ব্যবস্থা করব। বিপদ এখনও কাটেনি। ইচ্ছে করলে সুজয় এখনও, অমন একটা প্যাকেট পাঠাতে পারে পরমাদের ঠিকানায়। কথাটা ভাবতে ভাবতে কাল রাতে আমার ঘুমই এল না।

—কথার উত্তর দিচ্ছ না যে। কী ভাবছ তখন থেকে ?

—তোমার কথা।

—আসছ কখন তাহলে ?

—বারোটা-সাড়ে বারোটা।

—মাকে বলে দিচ্ছি, এখানেই খাওয়া-দাওয়া করে, আমরা দু'জন ও বাড়িতে যাব।

—দাও বলে।

—তাহলে ছাড়ছি। ভাল জামা-প্যান্ট পরে আসবে কিন্তু। ওখানে অনেকেই তোমাকে প্রথম দেখবে।

—তাহলে সুটকেস নিয়ে যাব।

—মানে ?

—মানে সুটকেসে কিছু জামা-প্যান্ট নিয়ে যাব। ওখানে যে যে পোশাকে ভাল বলবে, পরে পরে দেখাব।

—অসভ্য কোথাকার।

বলেই লাইনটা ছেড়ে দিল পরমা। টেবলে চা জুড়িয়ে গেছে। নীচে নেমে বড়বৌদিকে আরেক কাপ করতে বলব কি না, ভাবছি। হঠাৎ বিছানার উপর রাখা কাগজগুলোর দিকে চোখ গেল। গতকাল প্রশ্নপত্র ফাঁসের রিপোর্ট কোন কাগজ কেমন করেছে, তা দেখার জন্য সব কাগজ মেলে ধরলাম। আনন্দবাজার প্রথম পাতায় ডাবল কলম রিপোর্ট করেছে। দৈনিক ভোর সিঙ্গল কলম। জনকণ্ঠ কাগজের পাঁচ কলম। টেলিগ্রাফ খবরটা নিয়েছে মেট্রোর পাতায়। আমাদের কাগজে খবরটাই নেই। বার কয়েক উল্টে পাল্টে দেখেও, খবরটা কোথাও দেখতে পেলাম না। সত্যি বলতে কী, একটু অবাকই হলাম। আমাদের কাগজে পাঁচের পাতায় সংযুক্তা মল্লিককে নিয়ে একটা খবর রয়েছে দেখলাম। 'হত্যা নয়, আত্মহত্যা' হেডিংয়ে। গতকাল বাদশা আমাকে যা বলেছিল, হুবহু সেই খবরটাই বেরিয়েছে। কুণাল শালা, খবরটা প্রথম পাতায় নিতে সাহস করেনি। পাছে সোমবার আমি গিয়ে হুজ্জুত করি, এই ভেবে।

কাগজগুলো আবার সব খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলাম। না, কোথাও কোনও গণ্ডগোল নেই। প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে সান্ধ্য দৈনিকে যা বেরিয়েছে, প্রায় একই খবর আছে তিনটে কাগজে। আনন্দবাজার পর্ষদ সভাপতিকেও ইন্টারভিউ করেছে। উনি বলেছেন, ওঁনার কাছেও কিছু অভিযোগ এসেছে। সেগুলো খতিয়ে দেখছেন। আনন্দবাজারে চোখ বোলাতে বোলাতে পাঁচের পাতায় আরও একটা খবর চোখে

পড়ল, "সাংবাদিকের রহস্যজনক মৃত্যু"। সিঙ্গল কলম, প্রায় পনেরো সেন্টিমিটার রিপোর্ট। সাংবাদিক সবিতা দাশগুপ্ত লেক গার্ডেন্সের একটা ফ্ল্যাটে রহস্যজনকভাবে মারা গেছেন। আঠাশ বছর বয়সী এই মহিলা সাংবাদিক শনিবারই দিল্লি থেকে কলকাতায় আসেন। তারপর সবিতা সম্পর্কে আরও কিছু কথা। শেষের একটা লাইনে চোখ আটকে গেল। সবিতা আনন্দবাজারের প্রাক্তন সাংবাদিক সুধাময় দাশগুপ্তের কন্যা।

আনন্দবাজারে কোথাও ধর্ষণের কথা লেখেনি। সেটা সুধাময়দার মুখ চেয়েই হয়তো। সবিতার আসল পরিচয়টা জানার পর থেকে মাথাটা ঝিমঝিম করছে। ও কোনওদিন ঘুণাক্ষরেও বলেনি, ওর বাবা একটা সময় নামকরা সাংবাদিক ছিলেন। তা হলে কথায় কথায় সুধাময়দার নাম উঠে আসত। সম্পর্কটা জানার পর থেকেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি এত স্বার্থপর হয়ে গেছি, কাল রাতে সবিতার খুন নিয়ে একটুও দুঃখবোধ করিনি। উল্টে ভেবেছি, সবিতার ফ্ল্যাটে যদি পুলিশ আমার ছবিগুলো পেত, তাহলে কী হত। আমি নিশ্চিত নই, সব ছবি হাত কাটা নীলু নিয়ে আসতে পেরেছে কি না। এমনও তো হতে পারে, খাটের আশপাশে কোনও একটা ছবি পড়েছিল, যা নীলুর চোখে পড়েনি। অথচ পুলিশ পেয়ে গেছে।

আনন্দবাজারে খবরটা কে করেছে, জানার জন্য ফোন করলাম প্রসূনকে। জিজ্ঞেস করলাম, "খবরটা কখন পেলি তোরা ?"

—রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ।

—আই ও-টা কে রে ?

—দীপঙ্কর সেন। তুই চিনিস। আগে লালবাজারে ছিল। এখন লেক গার্ডেন্সে আছে। তুই কথা বল না। ফোন নম্বর দেব ?

—দে।

ফোন নম্বর দিয়ে প্রসূন বলল, "এমন বিশ্রী ঘটনা ! আমরা তো পেতামই খবরটা। দীপঙ্করবাবুই ফোন করে আমার কাছে জানতে চাইলেন, সুধাময় দাশগুপ্ত বলে আমাদের কাগজে কোনও জার্নালিস্ট ছিলেন কি না। রাতে দিল্লিতে ফোন করে খবরটা আবার আমাকে দিতে হল সুধাময়দাকে।

—আই ও কী বলছে।

—প্রিলিমিনারি ধারণা হয়েছে, পাকা হাতের কাজ। মেয়েটাকে ভুল করে হয়তো মেরেছে। উল্টোদিকের বাড়ি থেকে একজন নাকি দেখেছে, মেয়েটা সাড়ে সাতটা নাগাদ একটা লোকের সঙ্গে মারুতি থেকে নামে। পুলিশ নাকি তোদের ফটোগ্রাফার সুজয়ের একটা নেম কার্ড পেয়েছে মেয়েটার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে। এটা অবশ্য বড় ব্যাপার নয়। মেয়েটা ফ্রেঞ্চ টিভি-তে কাজ করার সময় হয়তো আলাপ হয়েছিল সুজয়ের সঙ্গে।

—তোরা কি ফলো আপ করবি এই খবরটা ?

—মনে হয় না। সুধাময়দা আজ আসছে সকালের ফ্লাইটে। যা করার করবে।

—ঠিক আছে।

ফোনটা ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। সুধাময়দা আজ আসছেন। আমার কি একবার যাওয়া উচিত ? পুলিশ নিশ্চয়ই সবিতার বডি মর্গে পাঠিয়েছে। সুধাময়দা

যত ইনফ্লুয়েন্সই খাটান না কেন, বেলা দুটো-তিনটের আগে বডি ফেরত পাবেন না। সুধাময়দার সঙ্গে দেখা হলে, নিশ্চয়ই উনি ছাড়বেন না। সারাটা দিন হয়তো থাকতে বলবেন সঙ্গে। ছ' বছর ওনার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই। উনি কোনও অনুরোধ করলে, না করতে পারব না। বিশেষ করে, এই সময়ে। মুশকিল হচ্ছে, একটু আগেই কথা দিয়েছি পরমাকে, ওদের বাড়িতে যাব।

মুখ-টুখ ধুয়ে ওপর থেকে নীচে নেমে এলাম। ড্রয়িংরুমে বাপী বসে কথা বলছে অল্পবয়সী একটি ছেলের সঙ্গে। আমাকে দেখেই বলল, "এই ছেলেটা, তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।"

কৌতূহলী হয়ে ছেলেটার দিকে তাকাতেই ও এগিয়ে এসে প্রণাম করল। তারপর বলল, "বাবা আপনার কাছে পাঠালেন।"

—কে তোমার বাবা ?

—রণতোষ সাহা।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম ছেলেটা কী জন্য এসেছে। ওকে বললাম, "তুমি একটু দাঁড়াও। আমি আসছি।"

ফের উপরে উঠে এলাম। রণতোষ লেক ক্লাবে আমাদের সঙ্গে রোয়িং করত এক সময়। এখন চাকরি করে আজকের সংবাদে। প্রেসের ইনচার্জ। ওর সঙ্গে আমার একটা ডিল হয়েছে। আমি যেদিন চাইব, ওদের সান্ধ্য সংস্করণ ছাপায় সেদিন ও একটু আধটু দেরি করিয়ে দেবে। এর জন্য ওকে পুরস্কার দিতে হবে। পরিষ্কার হিসেব। কাল ফোনে ওকে একটা অনুরোধ করেছিলাম। সেটা ও রেখেছে। আজ ছেলেকে পাঠিয়েছে, প্রাপ্যটা বুঝে নিতে। প্যান্টের পকেট থেকে পার্স বের করে, হাজার টাকা সরিয়ে রাখলাম। পার্সটা ফের পকেটে রাখতে গিয়ে টের পেলাম, দু'পকেটে দু'টো প্যাকেট রয়েছে। গতকাল একটা প্যাকেট দিয়েছিল বাদশা। অন্যটা শর্মিলা। বাদশার প্যাকেটটা নষ্ট করে ফেলতে হবে। শর্মিলার প্যাকেটটা খুলতেই বেরিয়ে এল চমৎকার একটা শেফার্স পেন। মোড়কের ভেতরে একটা ছোট্ট চিরকুট। তাতে লাভ সাইন আঁকা। নীচে লেখা, "ইফ ইউ হ্যাভ ইন মাইন্ড, হোয়াট আই হ্যাভ ইন মাইন্ড, আই ডোন্ট মাইন্ড।"

মনে মনে হাসলাম। এই চিরকুটটাও নষ্ট করে ফেলতে হবে। কাল রাতে বাড়ি ফেরার সময় হাতকাটা নীলু আরও কয়েকটা ছবি তুলে দিয়েছিল আমার হাতে। সবই সবিতার ফ্ল্যাটে কুড়িয়ে পাওয়া। বাদশার দেওয়া প্যাকেটে সেগুলো রেখে দিয়েছি। ছবিগুলো নিয়ে বাথরুমে ঢুকলাম। তারপর দেশলাই দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে, পোড়া ছাইগুলি কমোডে ফেলে, ফ্ল্যাশ টেনে দিলাম। ধোঁয়ার কটু গন্ধে আমার কাশি পাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি জানলাগুলো খুলে দিলাম। মনটা তবুও খচখচ করতে লাগল।

কাশতে কাশতেই টাকা নিয়ে নীচে নেমে এলাম। ছেলেটা আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়েছে। সম্ভবত নাইন-টেনে পড়ে। ওর হাতে টাকা দিয়ে বললাম, "বাবাকে দিয়ে দিও।"

ছেলেটা অবাক হয়ে আমাকে দেখছে। দাঁড়িয়েই আমাকে প্রশ্ন করল, "অয়ন আঙ্কল একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?"

—বলো।

—কী করলে আপনার মতো জার্নালিস্ট হতে পারব আঙ্কেল।

এইবার ছেলেটাকে ভালভাবে দেখলাম। উজ্জ্বল দুটি চোখ, নিষ্পাপ মুখ। বয়সের তুলনায় বেশ লম্বা। দেখে নিজের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল। ওর বয়সে আমিও এরকম ছিলাম। ছেলেটাকে বললাম, "ভাল করে আগে পড়াশুনোটা করো। খুব ভাল রেজাল্ট করা চাই। না হলে জার্নালিস্ট হতে পারবে না।"

—আমাকে আপনি সাহায্য করবেন ?

কথাটা শুনে চমকে উঠলাম। এখনকার ছেলেরা কত আগে থেকে অ্যাম্বিশন ঠিক করে রাখে। আমাদের সময় ভাবতেই পারতাম না। বললাম, "নিশ্চয়ই করব। তখন এসো, কেমন ?"

ছেলেটা আমাকে প্রণাম করে বেরিয়ে গেল। সদর দরজা দিয়ে অনেকটা রাস্তা দেখা যায়। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। নাম জিজ্ঞাসা করা হল না। ছেলেটাকে শর্মিলার দেওয়া পেনটা উপহার দেব ভাবলাম। দেওয়া হল না। একটু আপসোস হল। সুজয়ও একদিন বাড়িতে এসে সাহায্য চেয়েছিল। প্রেস ফটোগ্রাফার হতে চায়। সাহায্য করেছি। তার এমন প্রতিদান দিল, কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। পার্কে মাঠে ছেলেরা ক্রিকেট প্র্যাকটিস করছে। রেলিংয়ের বাইরে বাপ-মায়েদের ভিড়। রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছেলের উন্নতি দেখছে ক্রিকেটে। বাপ-মায়েদের পাশ দিয়ে দ্রুত পায়ে একজন হেঁটে আসছে। দূর থেকেই চিনতে পারলাম, স্বপ্না। সুজয়ের বউ। কী ব্যাপার, আমার কাছে ?

কাছে এসেই স্বপ্না বলল, "অয়নদা, সুজয় কোথায় জানেন ?"

ওর চোখ-মুখ দেখেই মনে হল, রাতে ঘুমোয়নি। চুলে চিরুণি দেয়নি, মুখ শুকিয়ে গেছে। অতি সাধারণ একটা শাড়ি পরে বেরিয়ে এসেছে স্বপ্না। চোখে ভয়ানক উদ্বেগ। বললাম, "জানি না তো। আমার সঙ্গে বহুদিন ওর দেখাসাক্ষাৎ নেই।"

—কাল সন্ধেবেলায় সুমো নিয়ে বেরোল। বলল, 'ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঘুরে আসবে। আমি চেতলার স্টুডিওতে বসে রইলাম। এল না। স্টুডিও বন্ধ করে বাড়ি গেলাম। সারা রাত্তির ওর কোনও পাত্তা নেই। সকালে মিহির স্টুডিও খুলতে গেছিল। দেখে ভাঙচুর হয়েছে। কিচ্ছু নেয়নি। কিন্তু সব তছনছ করে দিয়ে গেছে। পাশেই ফুটপাথে শোয় এক বুড়ি। সে মিহিরকে বলেছে, রাত একটা নাগাদ সুজয় নাকি স্টুডিওতে এসেছিল। সঙ্গে ছিল আরও দুজন লোক। ঘণ্টাখানেক পরে তালা দিয়ে আবার চলে যায়। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—লোকাল থানায় খবর দিয়েছ ?

—না। আগে আপনার কাছে এলাম।

—থানায় একটা ডাইরি করো। কুনাল অথবা দীপেনের বাড়িতেও ফোন করতে পারো। ইদানীং ওদের সঙ্গেই ওর যোগাযোগ ছিল বেশি। মনে হচ্ছে, সুজয় বিপদে পড়েছে।

কেঁদে ফেলল স্বপ্না, "কী করব আমি অয়নদা। আমার ভয় করছে। ইদানীং পয়সার খুব নেশা হয়ে গেছিল ওর। আগরওয়াল বলে একটা লোক আসত। লোকটা ভাল না। বারণ করেছিলাম মিশতে। শুনত না। লোকটা থাকে কোথায়, তাও জানি না।"

সঙ্গে সঙ্গে আমার শ্যামলের কথা মনে পড়ে গেল। নারীঘটিত কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল না তো সুজয়? হয়তো কোনও মেয়ে অভিযোগ করেছে পুলিশের কাছে। পুলিশই হয়তো রাতে ওর সঙ্গে স্টুডিওতে গিয়ে কোনও তদন্ত করেছে। অসম্ভব কিছু না। মনে মনে একটু খুশিই হলাম। আমার সর্বনাশ করতে চেয়েছিল সুজয়। এবার নিজে বুঝুক।

স্বপ্নাকে বললাম, "আর দেরি করো না। থানায় যাও। সুজয় ফিরে এলে ফোন করে একবার আমাকে জানিও।"

উত্তরের প্রত্যাশা না করে আমি ভেতরে ঢুকে এলাম। সুজয়ের ব্যাপারে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। এক বছর আগে হলে হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়তাম। কিন্তু এখন, সুজয় বাস্টার্ডকে আমি আরও বিপদের মধ্যে ঠেলে দেব। কথাটা মনে হতেই উপরে উঠে এলাম। দীপঙ্কর সেনকে ফোন করা দরকার। আমার আর সুজয়—দু'জনের জন্যই। সবিতার মার্ডারের সঙ্গে ওকে আমি জড়িয়ে দেব। এমনভাবে জড়িয়ে দেব, যাতে শাস্তি না পেলেও ও বেইজ্জত হয়। ওর স্টুডিওতে তালা পড়ে। ও ফের আগের অবস্থায় ফিরে যায়।

দীপঙ্কর সেনের বাড়িতে ফোন করতেই ও প্রান্তে গলাটা চিনতে পারলাম।

—"হ্যালো, আমি অয়ন ব্যানার্জি বলছি। মনে আছে?"

—"আরে হ্যাঁ অয়নবাবু বলুন। কেমন আছেন?

—ভাল। একটা খবরের জন্য ফোন করলাম।

—সবিতা দাশগুপ্ত?

—ঠিক ধরেছেন। ব্যাপারটা কী বলুন তো?

—ব্রুটালি মার্ডারিড। কোনও কারণই খুঁজে পাচ্ছি না মশাই। ওর হাতের তালুতে একটা বোতাম পাওয়া গেছে। মনে হয়, মার্ডারার যখন রেপ করার চেষ্টা করেছিল, তখন উনি বাধা দিয়েছিলেন। ঘরে এ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি। এখনই কিছু লিখবেন না কিন্তু। ওপরওয়ালারা খচে যাবেন।

ঘরে আর কিছু পাওয়া যায়নি শুনে, আমি বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম। উফ্, বেঁচে গেছি। হাত কাটা নীলু আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। আনন্দে আমার লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল। বললাম, "দীপঙ্করবাবু, একটু আগে আনন্দবাজারের প্রসূন ফোন করেছিল। ও বলল, "সবিতা দাশগুপ্তের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে আপনি নাকি সুজয় বসু নামে আমাদের একজন ফটোগ্রাফারের কার্ড পেয়েছেন? কথাটা কি সত্যি?

—হ্যাঁ, সত্যি। আপনাকে বলা উচিত ছিল।

—দেখবেন ও যেন কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে না পড়ে। কাগজের প্রেস্টিজ ইনভলভড। ইদানীং ও বাদশার সঙ্গে খুব মিশছিল। এন্টালির সেই বাদশা। রেপ কেসে যে জেল খেটে বেরোল। তবে সেটা তেমন কিছু না।

দীপঙ্কর সেন বাধা দিয়ে বললেন, "দাঁড়ান মশাই, দাঁড়ান। বাদশার সঙ্গে যে সুজয়বাবুর যোগাযোগ ছিল, সেটা আপনি সিওর?"

—হান্ড্রেড পার্সেন্ট। মোর দ্যান হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর। আপনি তো জানেন, ক্রাইম রিপোর্টিং করি। আন্ডারওয়ার্ল্ডের সঙ্গে যোগাযোগ আমার কম নয়। ওদেরই কাছে জানতে পারি, সুজয় ইদানীং আরও একটা কাজ করে পয়সা উপায় করত।

ফ্লেশ ট্রেডিংয়ে দালালগিরি। মডেল করে দেওয়ার নাম করে, স্টুডিওতে ও নাকি মেয়েদের ডেকে আনত। তারপর আগরওয়াল নামে একটা লোকের কাছে ভিড়িয়ে দিত। অবশ্য এগুলো শোনা কথা। কতটা গুরুত্ব দেবেন, জানি না। র‍্যাকেটে বাদশাই হয়তো জোর করে ওকে নামিয়ে ছিল। সুজয়ের তো এন্টালি এলাকায়ও একটা স্টুডিও আছে।

—সুজয় ভদ্রলোক থাকেন কোথায় ?

—চেতলার দিকে। কেন, ওকে আবার হ্যারাস করবেন না তো ? আমার মনে হয়, বাদশা লোকটাকে ধরুন। আমার সোর্স বলছে, সবিতাকে রেপ করার জন্য ও শাকালু নামে এক শাকরেদকে পাঠিয়েছিল। আমি এই লাইনেই রিপোর্ট করব সোমবারের সান্ধ্য দৈনিকে। একটা রিকোয়েস্ট করব দীপঙ্করবাবু ?

—কী বলুন ?

—কাউকে যদি অ্যারেস্ট করেন, প্লিজ একটু খবর দেবেন। সান্ধ্য কাগজে এই সব খবর খুব খায় লোকে। আর একটা কথা, রিপোর্টার হিসাবে এত কথা আমার বোধহয় বলা উচিত হল না। আমার এক্সক্লুসিভনেস নষ্ট হয়ে যাবে। প্লিজ, এই খবরগুলো অন্য কাগজের কোনও রিপোর্টারকে আপনি দেবেন না।

—আরে না, না। থ্যাঙ্কস অয়নবাবু। তবুও আপনি একটা লিড দিলেন। দেখি, কিছু পাই কি না। কিছু মনে করবেন না মশাই, এখন রিপোর্টার হিসাবে যারা আমাদের কাছে আসে, তারা ভীষণ ডাল।

—কী আর করা যাবে বলুন। সব জায়গাতেই এক অবস্থা। এখনকার অফিসাররা কি আপনাদের মতো ? একদম না। অথচ কথা বলতে যান, মনে হবে যেন এইমাত্র সবাই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে চাকরি ছেড়ে ঢুকেছে। যেন ক্যালকাটা পুলিশে দয়া করে চাকরি করছে। কয়েকদিন আগে একটা সুইসাইড কেসে আই ও-কে জিজ্ঞেস করলাম, ভদ্রমহিলার গলায় লিগেচার মার্ক ছিল ? কথাটা উনি বুঝতেই পারলেন না। কী অবস্থা, ভাবুন।

হো হো করে হাসলেন দীপঙ্করবাবু। বোধহয় খুশি হলেন প্রশংসা শুনে। তারপর বললেন, "এসব বলে লাভ আছে মশাই। ক্যালকাটা পুলিশ এখন ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। আন্ডারওয়ার্ল্ডে আমাদের চেয়ে এখন তো দেখছি, আপনাদের সোর্স বেশি। যাক গে, ছাড়ি তা হলে। পারলে কাল সকালে একবার ফোন করবেন।"

ফোনটা ছেড়ে আমি, হাত মুঠো করে শূন্যে ছুঁড়ে দিলাম। আমার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ ! বাস্টার্ড। দ্যাখ, তোদের কী অবস্থা করি। সকাল থেকে কিচ্ছু খাইনি। খিদে পাচ্ছে। হালকা পায়ে ফের ওপর থেকে নেমে এলাম। রান্নাঘরের সামনে গিয়ে বললাম, শোভামাসি, শিগ্গির কিছু খেতে দাও। নাড়িভুঁড়ি জ্বলে যাচ্ছে।"

বড়বৌদি রান্নাঘরেই ছিল। বলল, "দু'বার লুচি ভাজলাম। দু'বারই ঠাণ্ডা হয়ে গেল। দাঁড়াও। ভেজে দিচ্ছি।"

—দুর, ঠাণ্ডাই দাও। আমাকে এখুনি বেরোতে হবে।

—আউটিং আছে নাকি ? সকালে ফোন করে কী বলল রমা ?

—ইনভিটেশন ফর লাঞ্চ। তারপর এক্সিবিশন ইন গ্র্যান্ড ফাদার্স হাউস।

—হেঁয়ালি ছেড়ে, বাংলায় বলো।

—বরকে দেখাতে নিয়ে যাবে ঠাকুর্দার বাড়িতে।

—তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে, পারলে এখুনি পিঁড়িতে বসে পড়ো।

—তোমার পাগলা বোনের অবস্থা কিন্তু আরও খারাপ। সে খবরটা রাখো?

—পাগলা বললে কেন? দাঁড়াও, ফোন করে বলে দিচ্ছি।

—দোহাই বৌদি। বেশ কিছুদিন মাথাটা ঠান্ডা আছে। থাকতে দাও। খেপলে আমি শেষ।

—রমাটা কিন্তু বদলে গেছে, না অয়ন? ওইরকম দুরন্ত মেয়ে, এখন একদম চুপচাপ। সেদিন ওর বেনারসী কিনতে গেছি। দোকানে গিয়ে বলে কি না, তোমরা যা পছন্দ করে দেবে, তাই দাও। অথচ আগে দোকানে গিয়ে একশো শাড়ি বের করত।

—ইনফ্লুয়েন্স। স্রেফ ইনফ্লুয়েন্স। আখির গার্লফ্রেন্ড কিস কি?

—একদম না। বলো, বহিন কিস কি।

দু'জনেই হেসে উঠলাম। বড়বৌদি বলল, "চলো, টেবলে বসবে চলো। ধীরে সুস্থে খাবে।"

—মোটেই না। ওখানে অবনীমোহন বসে আছেন রমণীমোহন হয়ে। গেলে তুমি মুখে কুলুপ এঁটে দেবে।

—ফাজিল কোথাকার। বাপীকে নিয়ে ইয়ার্কি হচ্ছে।

রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছি। পিছন থেকে হঠাৎ বুবুন বলে উঠল, "বাহ্, চমৎকার! এখানে শরৎচন্দ্রের বৌদি আর দেওরের ড্রামা হচ্ছে। আর আমাদের পেট চো চো করছে সকাল থেকে। এই চল তো টুবলু, স্ন্যাকস্ বারে গিয়ে এখনই কিছু খেয়ে আসব।"

ঘুরে দেখি, বুবুনের পাশে টুবলু। দু'জনের হাতে থালা। এতক্ষণ বোধহয় ডিনার টেবলে বসেছিল। দেরি হচ্ছে দেখে থালা হাতেই উঠে এসেছে।

বুবুনকে বললাম, "সামান্য আধ ঘণ্টা খিদে সহ্য করতে পারিস না, শ্বশুরবাড়িতে ঘর করবি কী করে?" কথাটা অবশ্য আমার নয়। বড়বৌদির। এই কিছুদিন আগে বলেছিল।

বুবুন বলল, "বয়েই গেছে আমার শ্বশুরবাড়িতে যেতে।"

—কী করবি?

—আমি বুটিকের দোকান করব।

BOIRBOI.NET

—তা হলে তো, শোভামাসিদের গ্রাম থেকে, তোর জন্য একটা বেকার ছেলে আনতে হবে।

—ছোড়দা ভাল হবে না বলছি। নিজের চরকায় তেল দে। অবশ্য তোর কাছে তো নিজের চরকাটাও নেই। রমাদিই তেল দিয়ে দেবে। দাঁড়া, আসুক রমাদি এ বাড়িতে। আর তো কয়েকটা মাত্র দিন। তারপর থেকে ননদরাজ শুরু হয়ে যাবে এ বাড়িতে।

বড়বৌদি বলল, "এই চল তো। যা টেবলে গিয়ে বোস। এখুনি খেতে দিচ্ছি।"

মুখ বেঁকিয়ে বুবুন চলে গেল রান্নাঘর থেকে। আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। তখনই টুবলু খুব উত্তেজিত হয়ে ঘরে ঢুকে বলল, "মামন, মামন, জ্যোতিকাকা

এসেছে।"

জ্যোতি আমাদের বাড়িতে ? ওর সঙ্গে ইদানীং আমার বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ। অফিসে উঠতে-নামতে কখনও কখনও দেখা হয়। কিন্তু পারতপক্ষে আমি এড়িয়ে যাই। তিনতলার লোকেরা সবাই আমার রাইভ্যাল। ভেতর থেকে জ্যোতির গলা শুনতে পেলাম, 'বৌদি, আসব ? সঙ্গে কিন্তু আরেকজন আছে।"

—আরে এসো, এসো। ব্যাপারটা কী জ্যোতি, অনুমতি নিচ্ছ।

বলার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতি ঘরের ভেতর ঢুকে এল। তারপর আমার দিকে একবার তাকিয়ে ঠাট্টা করে বলল, "আর ক'দিন পর তো এ বাড়িতে স্লিপ দিয়ে ঢুকতে হবে। অয়ন ব্যানার্জি এত বড় সাংবাদিক হয়ে যাবে, আমাদের মতো লোকেদের সঙ্গে মিশবেও না।"

বড়বৌদি কথাটা শুনে হাসল। তারপর বলল, "তুমি যে বললে, সঙ্গে আরেকজন আছে। কোথায় সে ?"

কথাটা শুনে পর্দা সরিয়ে যে ঢুকল, তাকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। স্নিগ্ধা। ঘরে ঢুকেই ও প্রণাম করল বৌদিকে। জ্যোতি বলল, "বিয়ে করছি বৌদি। আগামী শুক্কুরবার। আগে তো কিচ্ছু বলিনি। তাই দেখাতে নিয়ে এলাম। আমারই কলিগ— স্নিগ্ধা।"

বড়বৌদি বলল, "বাহ্, খুব সুন্দর নাম তো। তোমরা কোথায় থাকো স্নিগ্ধা।"

—আলিপুরে। অয়নদা চেনেন। গোয়েঙ্কা টাওয়ার্সে।

—মাই গড। এ কথাটা তো আগে বলোনি স্নিগ্ধা। ও কি তোমার পেছনে লাইন দিয়েছিল নাকি ?

আমি রেগে উঠে বললাম, "কী ফালতু কথা বলছিস।"

বড়বৌদি বলল, "চলো স্নিগ্ধা, এখানে বড্ড গরম। আমার ঘরে গিয়ে বসি। এই দু'টোর মধ্যে যত বন্ধুত্ব, ততই ঝগড়া। মিটবে বলে মনে হয় না।

—মিটবে বৌদি, মিটবে। খবরের কাগজের চাকরিটা আমি ছেড়ে দিচ্ছি। এবার মিটবে।

শুনেই রাগ হয়ে গেল। জ্যোতি ভাবছেটা কী। এক প্রফেশনে আছে বলে হিংসে করি ? যত সব ফালতু কথা। খাওয়া হয়ে গেছিল। থালাটা নামিয়ে রেখে, মুখ-টুখ ধুয়ে বেরিয়ে এলাম। জ্যোতির সঙ্গে কথা বলতেই অস্বস্তি হচ্ছে। ফোনে ওকে যা-তা বলে দিয়েছিলাম। এখন নীচে কথা বলতে গেলেই অপ্রিয় প্রসঙ্গ উঠবে। অন্যরা তা শুনে ফেলবে। সেটা এড়াবার জন্যই বললাম, "আমি উপরে যাচ্ছি। নীচে কথা বলে, আসতে পারিস।"

আর একটা কথাও না বলে আমি দোতলায় এলাম। আমি জানি, নীচে এখন ভ্যানর ভ্যানর করবে জ্যোতি। বাপী, বুবুন, টুবলু, এমনকী শোভামাসির সঙ্গেও কিছু না কিছু কথা বলে, তারপর উঠে আসবে। এ বাড়িতে সবাই ওকে পছন্দ করে। শালা, সবার সব কিছু মনেও রাখে। শোভামাসির হাতে কার্বাঙ্কল হয়েছিল বছর খানেক আগে। হয়তো আজ জিজ্ঞাসা করে বসবে, 'সেই কার্বাঙ্কলের সময় তুমি খুব কষ্ট পেয়েছিলে, না শোভামাসি ?' বাবার পেনশনের টাকা একবার আটকে গেছিল। আজ হয়তো ওই পেনশন নিয়েই দশ মিনিট আগ্রহ দেখাবে বাবার কাছে। বুবুনের সব

বন্ধুকে ও চেনে। হয়তো বলে বসবে, 'এই তোর রীতাকে সেদিন দেখলাম, নেতাজি ইন্ডোরে। শানুর ফাংশানে। একটা কাঞ্জিভরম শাড়ি পরেছিল। ফাইল লাগছিল। তবে তোর নখের যুগ্যি নয়।' জ্যোতি একমাত্র ভয় পায় টুবলুকে। পাছে কুইজ জিজ্ঞেস করে বসে।

ভরা পেট। বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘণ্টাখানেক পরেই বেরোতে হবে। পরমা বসে থাকবে আমার জন্য। অবশ্য এখনও ঘণ্টাখানেক টাইম আছে। জ্যোতি এসেই সব গড়বড় করে দিল। না এলে চান করতে ঢুকে যেতাম। স্নিগ্ধা সঙ্গে আছে। ভুলেও ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারব না। জ্যোতিটা তলায় তলায় প্রেম করছে জানতামই না। নিশ্চয়ই অনেকদিন ধরে চালিয়ে যাচ্ছে। জ্যোতি এত সাবধানী ছেলে, চারদিক বিচার না করে ও এই বিয়ে করত না। স্নিগ্ধাদের সঙ্গে ওদের স্ট্যাটাসের একটু তফাত হয়ে তাচ্ছে। স্নিগ্ধারা বেশ উচ্চবিত্ত। জ্যোতিদের উচ্চ মধ্যবিত্ত বলা যায়। চেতলায় ওদের নিজেদের বাড়ি। ওর বাবা আগে ফিনান্সের ডেপুটি সেক্রেটারি ছিলেন।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই জ্যোতি আর স্নিগ্ধা উপরে উঠে এল। জ্যোতি হাসতে হাসতে বলল, "তোকে কেমন মেরে বেরোলাম দ্যাখ। তোর বিয়ের তিন সপ্তাহ আগে আমি বিয়ে করছি।"

জ্যোতি এসে বসল আমার বিছানায়। স্নিগ্ধা চেয়ারে। ওর কথার পিঠেই বললাম, "ওয়ান্ডারফুল। সান্ধ্য দৈনিকে খবরটা ছাপব কি না ভাবছি।"

—তুই যা করছিস অয়ন, কাগজটা না লাটে উঠে যায়।

—কেন আমি আবার কী করলাম। সান্ধ্যর সার্কুলেশন কত জানিস ?

—জানি। ওই নিয়েই তুই সুখে থাক। আমি কাটছি। বিয়ের পরই চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।

—কী করবি ?

—স্নিগ্ধা আর আমি অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাচ্ছি। সিডনি। মাস ছয়েকের মধ্যে। কাগজপত্র এতদিনে তৈরি হয়ে যাবে।

এটা আমার কাছে খবর। মনে মনে একটু দমে গেলাম। প্রশ্ন করতে হয়, তাই জিজ্ঞাসা করলাম, "হঠাৎ অস্ট্রেলিয়ায় ? যোগাযোগ হল কী করে ?"

জ্যোতি বলল, "তুই বোধহয় জানিস না, স্নিগ্ধার বাবা নামকরা সিস্টেম অ্যানালিস্ট। অস্ট্রেলিয়া গাভমেন্টের হয়ে অনেক কাজ করছেন। উনিই যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন। আপাতত মাস কমিউনিকেশনের উপর রিসার্চ করব। বছর চারেক। তারপর দেখা যাবে।

—কী রকম পাবি স্কলারশিপ ?

—আমাদের টাকায় ধর, মাসে ষাট হাজার টাকা করে।

স্নিগ্ধা হঠাৎ বলল, "এই ছাড়ো তো এসব কথা। অয়নদা, আজ আপনাকে একটা সারপ্রাইজ দিই। আপনার সঙ্গে মাঝে যখন পরমাদির বিচ্ছেদপর্ব চলছে, সেই সময় আমি গোয়েন্দাগিরি করতাম।"

অবাক হয়ে বললাম, "তার মানে ?"

স্নিগ্ধা হাসতে হাসতে বলল, "পরমাদিদের সঙ্গে আমাদের অনেক দিনের পরিচয়।

আগে আমরা একই পাড়ায় থাকতাম। ট্রাঙ্গুলার পার্কের কাছে। বছর বারো আগে ওরা লেক গার্ডেন্সে চলে যায়। আপনাকে আমি প্রথম দেখি, বছর আটেক আগে। পরমাদির জন্মদিনে। দূর থেকে আপনাকে দেখিয়ে, আমাকে বলেছিল, ক্যাবলা কার্তিকটাকে দেখে রাখ। ওটাই আমার বর।

বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল স্নিগ্ধা। আমি কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বললাম, "আমার সম্পর্কে ওই কথা বলেছিল ?"

—হ্যাঁ। তারপর যখন কোনও সময় আমাদের বাড়ি বেড়াতে আসত, তখন খুব গল্প করত আপনার।

—তুমি গোয়েন্দাগিরিটা করতে কেন ?

—আপনার সঙ্গে যখন খুব রাগারাগি চলছে, মুখ দেখাদেখি বন্ধ, সেই সময় দৈনিক প্রভাতের চাকরিটা আমি নিই। সে কথা জানতে পেরে, পরমাদি রোজ আমার কাছে খবর নিত। আপনি কখন অফিসে যেতেন, কতক্ষণ থাকতেন, কোনও মেয়ের সঙ্গে অ্যাফেয়ার আছে কি না— এইসব। একেক সময় খুব কথা বলতে ইচ্ছে করত আপনার সঙ্গে। কিন্তু যা গম্ভীর হয়ে থাকতেন, ভীষণ ভয় লাগত। তারপর জ্যোতিই একদিন বলল, ওকে বাইরে থেকে যা মনে হয়, ভেতরে সে রকম নয়। সে যাক, পরমাদি কিন্তু আপনাকে খুব ভালবাসে অয়নদা। এমন দেখা যায় না।

—পরমাদিকে বিয়ের নেমন্তন্ন করেছ ?

—এখান থেকে যাব।

—ও কি জানে তোমার আর জ্যোতির ব্যাপারটা ?

—না। শুনলে অবাক হয়ে যাবে।

জ্যোতি আমাদের দু'জনের কথা শুনছিল। হঠাৎ উঠে পড়ল, "চলি রে, এখনও অনেক নেমন্তন্ন বাকি। বিয়ের আগের দিনই আমাদের বাড়িতে চলে যাস। দেখে তোর সব শেখা হয়ে যাবে।

জ্যোতির সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে এলাম। হঠাৎ মনে পড়ল কথাটা, "হ্যাঁরে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবরটা দৈনিক প্রভাত ক্যারি করল না কেন রে ?"

দাঁড়িয়ে পড়ল জ্যোতি, "আমাদের এক ডিরেক্টর চাননি বলে। খবরটা আমরা করেছিলাম। শেষ মুহূর্তে উইথড্র করা হয়।"

—কে সেই ডিরেক্টর ?

—জানি না। নিশ্চয়ই তাঁর কোনও ইন্টারেস্ট আছে। যে টিউটোরিয়াল হোমটা নিয়ে তুই লিখেছিস, হয়তো কোনও না কোনওভাবে আমাদের সেই ডিরেক্টর ইনভলভড। শোন অয়ন, পলিটিক্যাল বিট তো তুই ইদানীং করতি না। আমি করতে গিয়ে যা হেনস্থা হয়েছি, তা বলার মতো না। এক রকম লিখছি। পরের দিন দেখছি, কাগজে অন্য রকম বেরোচ্ছে। প্রথম প্রথম রাগ হত। তারপর ভাবলাম, কাগজটা তো আর আমার বাবার নয়। যেমন ইচ্ছে, লিখব। এখানে কর্তাদের ইচ্ছেয় কর্ম। চুপ করে থাকাই ভাল। ভাল না লাগলে না হয় ছেড়ে দেব। এই কারণেই ছেড়ে দিচ্ছি।

চুপ করে কথাগুলো শুনলাম। জ্যোতি ঠিকই বলছে। আমরা যতই নিজেদের ক্ষমতাবান বলে মনে করি না কেন, আসলে আমরা কিছুই না। সোমবার যদি কুমারেশ

BOIPROT.NET

মজুমদার আমাকে ডেকে বলেন, প্রশ্নপত্র নিয়ে একটা লাইনও যাবে না, তা হলে আমার কিছু করার নেই। সুপর্ণ, কিংশুক, সৌমিত্ররা হয়তো দৌড়োদৌড়ি করে অনেক খবর আনবে। একটা লাইনও আমি ছাপতে পারব না। তখন ওরা খুব হতাশ হয়ে পড়বে। আমার ওপর ওদের আস্থা কমে যাবে।

বড়বৌদির সঙ্গে দেখা করে জ্যোতি ওর হবু বউকে নিয়ে চলে গেল। সাদা একটা মারুতি করে। মারুতিটা কার, জ্যোতির, না স্নিগ্ধার ? বুঝতে পারলাম না। এমনও হতে পারে, বিয়ের যৌতুক হিসেবে পাচ্ছে। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছি দেখে বড়বৌদি বলল, "অয়ন, লেক গার্ডেন্সে যাবে না ? রমা কিন্তু রাগ করবে।"

লেক গার্ডেন্সের কথা মনে হতেই, পা চালিয়ে উপরে উঠে গেলাম। বারোটা প্রায় বাজে। এখুনি স্নান করে নেওয়া দরকার। বেরোবার আগে একবার পরমাকে ফোন করে দিলে হবে। টাওয়েল নিয়ে বাথরুমে ঢুকব, হঠাৎ ফোন। কর্ডলেসটা তুলে জিজ্ঞেস করতেই, হাত কাটা নীলু বলে উঠল, "অয়নদা, কাজ হয়ে গেছে।"

—কোনটা ?

—কাল রাতে ফটোগ্রাফারটাকে তুলে এনেছিলাম। বেদম পেটালাম। তারপর মাঝ রাতে স্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে সব নেগেটিভ পুড়িয়ে দিয়ে এসেছি। আপনার কোনও ভয় নেই। নিশ্চিন্ত থাকুন।

—ছেলেটা এখন কোথায় ?

—ছেড়ে দিয়েছি। এতক্ষণে বোধহয় বাড়ি পৌঁছে গেছে।

—যদি পুলিশকে সব বলে দেয়।

—সাহস হবে না। এন্টালিতে ওর স্টুডিও আছে। লাখ দশেক টাকা ঢেলে ফেলেছে। সব নষ্ট হয়ে যাবে এক রাতে।

—বাদশার কী হল ?

লোক পাঠিয়েছিলাম। গা ঢাকা দিয়ে আছে।

—থ্যাঙ্ক ইউ নীলু।

—না অয়নদা, থ্যাঙ্কস দেবেন না। আপনি একদিন আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। তখন আমার খুব দুঃসময়। অ্যান্টি স্যোশাল হলেও, আমরা কিন্তু উপকার কখনও ভুলি না।

লাইনটা কেটে দিল নীলু। কে জানে, কথাগুলো ও সত্যি বলল কি না। সেটা পরখ করার জন্যই কর্ডলেসে সুজয়ের বাড়ির নম্বরগুলো টিপলাম। ও প্রান্তে সুজয়। গলাটা ভাঙা ভাঙা।

—ফিরেছিস ?

—হ্যাঁ বস।

—মাল খেয়ে কোথাও পড়েছিলি বোধহয় সারা রাত ?

—না বস। আজকের দর্পণের এক ফটোগ্রাফারের বাস অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। কাল সারা রাত ওর জন্য হাসপাতালে ছিলাম।

—কে রে ছেলেটা ?

—চিনবেন না। ফ্রিল্যান্স করে।

—বাড়িতে একটা ফোন করতে পারলি না। তোদের আর কবে বুদ্ধিশুদ্ধি হবে।

লাইনটা ছেড়ে দিয়ে মনে মনে হাসলাম। না, হাত কাটা নীলু আমাকে মিথ্যে কথা বলেনি। তাড়াতাড়িতে সুজয়কে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলাম। ওর চেতলার স্টুডিওতে ভাঙচুর হল কেন ? জিজ্ঞেস করেও অবশ্য কোনও লাভ হত না। ও কোনও একটা মিথ্যে কথা বলে দিত।

চান করে, জামা প্যান্ট পরে তৈরি হতে সাড়ে বারোটা বেজে গেল। বেরোতে যাব, এমন সময় প্রসূনের ফোন, "অয়ন, একটু আসতে পারবি ?"

—কোথায় রে ?

—হিন্দুস্থান হোটেলে।

—কোনও প্রেস কনফারেন্স আছে ?

—না, সুধাময়দা এসেছেন। তোকে আসতে বলছেন একবার। খুব ভেঙে পড়েছে রে লোকটা। আজ ছুটির দিন। মর্গ থেকে ডেডবডিটা বের করা যাচ্ছে না।

—ঠিক আছে। এখুনি আসছি।

গ্যারেজ থেকে মারুতিটা বের করে, সোজা ছুটিয়ে দিলাম লেক গার্ডেন্সের দিকে। সুধাময়দাকে আমার দরকার নেই। উনি আমার আর কোনও কাজে লাগবেন না। ওঁর জন্য ছুটির দিনটা নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। আজ থেকে এক দু'বছর আগে হলে, লেক গার্ডেন্সে না গিয়ে হিন্দুস্তান হোটেলেই ছুটতাম। কী বোকা ছিলাম তখন। ভাবতে অবাক লাগে।

লেক গার্ডেন্সে পৌঁছতেই দেখি, বাড়ির লনে পায়চারি করছে পরমা। ওর পরনে কলার উঁচু পুরোহাতা কুর্তা। কলারে, হাতের ধারে ও জরিপাড় ওড়নাতে ট্রাডিশনাল প্রিন্ট। হাতা থেকে বুকের ওপর দিয়ে একেবারে নিচ পর্যন্ত আরেকটা ছাপা। সামনে খোলা কাপড়ের বোতাম। চুলে ফ্রেঞ্চরোল। কানে হাড়ের চৌকো পাশা। পরমাকে দেখেই সারা শরীরটা চনমন করে উঠল। আমাকে দেখে ও দৌড়ে এল, "এত দেরি করলে কেন অয়ন ? আমি কখন থেকে রেডি হয়ে রয়েছি।"

দু'জনে মিলে বাড়ির ভেতর ঢুকতেই, দরজাটা বন্ধ করে আমি আচমকা পিছন থেকে জড়িয়ে ধরতেই পরমা বলে উঠল, "এই অসভ্যতামি কোরো না প্লিজ। বিভা আছে।"

—থাক বিভা। যা হওয়ার ওর সামনেই হবে।

জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল পরমা। তারপর কুর্তার ভাঁজে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, "দিলে তো নষ্ট করে। আবার চেঞ্জ করতে হবে।"

—চেঞ্জ কোরো না প্লিজ। তোমাকে আজ দারুণ লাগছে।

—চলো, আগে লাঞ্চটা করে নিই। তারপর বেরোনো যাবে।

—জ্যোতিরা এসেছিল রমা ?

—অনেকক্ষণ আগে।

—তোমার গোয়েন্দা স্নিগ্ধা ?

খিলখিল করে হেসে উঠল পরমা, "হ্যাঁ সেও। সব জেনে গেছ তা হলে।"

—আজই জানলাম। বিয়ের পরও তুমি গোয়েন্দা লাগিয়ে রাখবে নাকি রমা ?

—লাগাতেও পারি। রিপোর্টার হ্যাজবেন্ডকে কন্ট্রোলে রাখার জন্য, বউদের আরও বড় রিপোর্টার হওয়া দরকার।

—তোমার সোর্স তো অস্ট্রেলিয়া চলে যাচ্ছে।

—যাক। অন্য সোর্স জোগাড় হয়ে যাবে।

—মাই গড। তুমি তো আমাদের ডায়লগ বলে যাচ্ছ রমা।

দু'জনেই হেসে উঠলাম।

লাঞ্চ সেরে নেওয়ার পর দু'জনে মিলে দোতলায় উঠে এলাম। আমি বললাম, 'রোদ্দুরটা একটু পড়ুক। তারপর বেরোব।" পরমা আপত্তি করল না। আমি সোফায় বসে। পরমা বিছানায়। দু'জনে মিলে গল্প করতে লাগলাম। রোদ্দুর পড়ে গেল। সন্ধ্যায় আলোও জ্বলে উঠল। হঠাৎ পরমা বলল, "এই, তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। বাদশা বলে একজন ফোন করেছিল। তোমার নামে যা তা বলছিল।"

বুকটা গুড়গুড় করে উঠল। বাস্টার্ড তা হলে পরমাদের ফোন নম্বরটাও জোগাড় করেছে! পরমা একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বোধহয় জরিপ করছে আমাকে। ওই মুহূর্তে ফের আমি সাংবাদিক অয়ন হয়ে গেলাম। স্বাভাবিক ভাবেই বললাম, "কে এই লোকটা?"

—জানি না। আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, ছবির কোনও প্যাকেট পেয়েছি কি না।

—কার ছবি, রমা?

—কে জানে? কী সব আজেবাজে কথা বলছিল। তোমার নামে। খারাপ খারাপ কথা। আমি বললাম, আমার উড বি হ্যাজবেন্ডকে আমি চিনি। আমাকে এসব বলে লাভ হবে না।

বুক থেকে যেন একটা পাথর নেমে গেল। বললাম, "কি নামটা যেন তুমি বললে রমা? বাদশা? ও, এবার চিনতে পেরেছি। নামকরা ক্রিমিনাল। একটা মেয়েকে রেপ করেছিল। ওকে আমি জেল খাটাই। বোধহয় বেরিয়ে এসেছে।"

—কথাবার্তায় কিন্তু লোকটাকে বাজে মনে হচ্ছিল না।

—ছাড়ো তো। ফালতু ব্যাপার। নামী লোকদের বদনাম করার জন্য একদল এরকম ক্যারেক্টর অ্যাসাসিনেশনের চেষ্টা করেই।

—তোমার ক্যারেক্টর কি ভাল?

—বড়বৌদিকে জিজ্ঞেস করো। বলবে, হিরের টুকরো।

পরমা মুখ টিপে হেসে বলল, "আমার চেয়ে আর বেশি কে জানে, তুমি কী।"

—এই, উঠে এসো। এখখুনি আসবে। না এলে আমিই উঠে যাব তোমার কাছে। ক্যারেক্টার দেখানোর জন্য।

—না বাবা। আমিই আসছি।

পরমা উঠে এসে সোফার অন্য প্রান্তে বসল। তারপর বলল, "বলো, কী বলবে।"

এক ঝটকায় কাছে টেনে নিয়ে বললাম, "কী জানো তুমি আমার সম্পর্কে? বলো, তোমাকে বলতেই হবে।"

এবার আর নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল না পরমা। আমার কোলে মাথা রেখে বলল, "তুমি... তুমি খুব ভাল ধরনের খারাপ লোক।"

দু'হাতে ওর মুখটা তুলে ধরলাম। চোখ বুজে ফেলল পরমা। ওর অনিন্দ্যসুন্দর মুখটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই, টুবলুর একটা

কুইজের কথা মনে পড়ে গেল। বহুদিন আগে, একবার ও জিজ্ঞেস করেছিল, "একটা দেশলাই বাক্স আর একটা টর্চ নিয়ে, ছোটকা, যদি তুমি চাঁদে যাও, বলো তো, কোনটা কাজে লাগবে না ?"

—দেশলাই বাক্সটা। চাঁদে অক্সিজেন নেই। দেশলাই কাঠি জ্বলার প্রশ্নও তাই নেই।

টুবলু সেদিন হতাশ হয়ে বলে উঠেছিল, "উফ্, এই উত্তরটাও তুমি জানো !"

সেদিন মনে মনে হেসেছিলাম। আজ পরমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি আরও একবার হাসলাম। এই শহরেরই আরেক প্রান্তে, সবিতা এখন মর্গে। তাকে আর আমার দরকার নেই। চাঁদে উঠে পথ দেখার জন্য, এখন আমার চাই পরমাকে। স্রেফ পরমাকে।